নিরীক্ষা

২১৮তম সংখ্যা : এপ্রিল-জুন ২০১৮

সম্পাদক
মো. শাহ আলমগীর

সহযোগী সম্পাদক
বিধান চন্দ্র কর্মকার

সহকারী সম্পাদক
মিজানুর রহমান
শাহেলা আক্তার
ড. জ্যোৎস্না রানী বিশ্বাস

শিল্প নির্দেশনা
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

বাংলাদেশে গণমাধ্যমের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়া সাংবাদিকতারও যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছে। বিপুল সংখ্যক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে এখন কাজ করছেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্রীড়া সাংবাদিক। শুধু ক্রীড়া বিষয় নিয়েও আছে পত্রপত্রিকা। তাছাড়া পাঠক-শ্রোতাদের মাঝেও ক্রীড়া সংবাদ পাঠ কিংবা শ্রবণের হারও উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগের পাঠ্যসূচিতেও ক্রীড়া সাংবাদিকতা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এসব বিবেচনা করেই পিআইবি ক্রীড়া সাংবাদিকতা নিয়ে নিরীক্ষার এ সংখ্যাটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়। এ সংখ্যায় যেমন ক্রীড়া সাংবাদিকতা নিয়ে তাত্ত্বিক লেখা রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিভিন্ন ক্রীড়া, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, ক্রীড়া সংগঠন ও ক্রীড়া আয়োজন নিয়ে লেখা। এছাড়া কয়েকজন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও ক্রীড়া সাংবাদিকের সাক্ষাৎকারও রয়েছে। আশা করি সংখ্যাটি সাংবাদিক, ছাত্র, শিক্ষক, ক্রীড়াবিদ এমনকি সাধারণ পাঠকদেরও ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

ক্রীড়া সাংবাদিকতা রোমাঞ্চকর এক পেশা ৫
মিনহাজ উদ্দীন

ক্রীড়া সাংবাদিকতার অ্যানালগ ও ডিজিটাল বয়ান ৯
মাহামুদুল হক

প্রসঙ্গঃ ক্রীড়া প্রতিবেদন ১১
কামরুন নাহার

ক্রীড়া সাংবাদিকতার সেকাল-একাল ১৬
সৈয়দ মাজহারুল পারভেজ

ক্রীড়া সাংবাদিকতাঃ বদলাতে হবে রণকৌশল ১৮
ড. মাহাবুবুর রহমান

কেমন হবে আগামী দিনের ক্রীড়া সাংবাদিকতা ২১
দুলাল মাহমুদ

হতে পারেন আপনিও ক্রীড়া সাংবাদিক ২৪
মামুন অর রশিদ

ক্রীড়া প্রতিবেদনে সাক্ষাৎকার ২৭
শুভ কর্মকার

বাংলাদেশে ক্রীড়া সাংবাদিকতার মান বিকশিত হচ্ছে —জাকারিয়া পিন্টু ৩০
আরাফাত জোবায়ের

আগের চেয়ে ক্রিকেট এখন অনেক সহজ —শফিকুল হক হীরা ৩৩
জ্যোতির্ময় মণ্ডল

আমাদের খেলোয়াড়রা জন্মগতভাবেই মেধাবী –দিলু খন্দকার ৩৫
আমীন আল রশীদ

প্রায় ২০০ দক্ষ নারী খেলোয়াড় এখন দেশের সম্পদ –কামরুন নাহার ডানা ৩৮
বনশ্রী ডলি

সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র স্পোর্টস ফটোগ্রাফি –শামসুল হক টেংকু ৪১
মো. লুৎফর রহমান

৪৪ মেয়েরাই এখন মেয়েদের ম্যাচ পরিচালনা করছে –জলি আক্তার বাঁধন
বোরহান বিশ্বাস

৪৬ বাংলার দুই পথিকৃৎ ক্রীড়াবিদ
বিনয় দত্ত

৫০ বাংলাদেশের ক্রীড়া সংগঠন
এফ রহমান রূপক

৫৩ ক্রীড়া সাংবাদিক জীবন বোস
অধ্যাপক মো. মসিউল আযম

৫৫ বাংলাদেশের জাতীয় খেলা হাডুডু
আলী মুবিন

৫৭ ফুটবলের সাতকাহন
ইরানী বিশ্বাস

৫৯ বাংলাদেশের নারী ফুটবলারঃ সম্ভাবনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত
তৌহিদা শিরোপা

৬১ বাংলাদেশের নারী খেলোয়াড়দের সাফল্যগাথা
কমল চৌধুরী

৬৩ খেলার নাম দাবা
সজীব চন্দ্র মণ্ডল

৬৫ বাংলা ভাষায় খেলার ধারাবিবরণীর প্রবর্তক আবদুল হামিদ
মাহফুজ সিদ্দিকী

৬৯ বেতারে ক্রীড়া ধারাবর্ণনাঃ অতীত ও বর্তমান
মো. সামসুল ইসলাম

৭১ অলিম্পিক গেমসের আদ্যোপান্ত
রুহী শামসাদ আরা

৭৪ ফুটবল বিশ্বকাপ
সুমন মুস্তাফিজ

৭৬ গণমাধ্যম সংবাদ

৮২ পিআইবি সংবাদ

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com

মূল্য ২০ টাকা

নিরীক্ষা

২১৮তম সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০১৮

সূচিপত্র

ক্রীড়া সাংবাদিকতা এমনই। এখানে নিখাদ আবেগে ভেসে যাওয়ার সুযোগ থাকে। সুযোগ থাকে আনন্দ দেওয়ার, আনন্দিত হওয়ার। ক্রীড়া সাংবাদিকতার ধরন ও প্রভাব নিয়ে বিশ্বে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। গবেষণাও হয়েছে অনেক। অনেক তাত্ত্বিক ও পোড় খাওয়া ক্রীড়া সাংবাদিক অনেক নিবন্ধ লিখেছেন

দেখুন- পৃষ্ঠা ৬

একসময় গ্রামীণ জনপদে হাডুডু, দাঁড়িয়াবান্ধা, মোরগ লড়াই, গোল্লাছুটের মতো খেলাগুলো ছিল বিনোদন ও আনন্দ-উৎসবের অন্যতম বড় উপাদান। পড়াশোনা ও কাজের বাইরে এসব খেলায় মেতে থেকে শিশু-কিশোর-যুবারা সময় কাটাত পরম আনন্দে। এখন গ্রামেও বিনোদন ও সময় কাটানোর প্রধান সম্বল হয়ে উঠেছে টেলিভিশন, মোবাইল ফোন ইত্যাদি

দেখুন- পৃষ্ঠা ৫৫

আজকের ক্রীড়া সাংবাদিকতা কেবল 'থ্যাংকলেস জব'র গণ্ডিতে আটকে নেই। আজ ক্রীড়া সাংবাদিকরা শ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য পারিশ্রমিক পাচ্ছেন। অনেকে গাড়ি, বাসস্থানসহ আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। সেটা ছেড়ে কে অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াবেন! একটা সময় ক্রীড়া সাংবাদিকতা ছিল ঢাকাকেন্দ্রিক। তখন কোনো ক্রীড়া সাংবাদিক খেলা কাভার করতে সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনা বা রাজশাহী যাওয়াকে অনেক বড়ো ব্যাপার বলে মনে করতেন

দেখুন- পৃষ্ঠা ১৭

অলিম্পিয়ায় প্রাচীন গ্রিসের দেবতাদের দেবতা জিউসের সম্মানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বসত। মানুষের ঢল নামত। নদীপথে আগমন ঘটত তাদের। সেই সময় গ্রিসে ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা ও গৃহযুদ্ধ। তাই খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে এলিসের রাজা ইফিটস দৈববাণী শুনে গ্রিসের অঙ্গরাজ্য ও উপনিবেশগুলোর মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু করেন

দেখুন- পৃষ্ঠা ৭১

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ● ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

পিআইবি'র প্রকাশনা

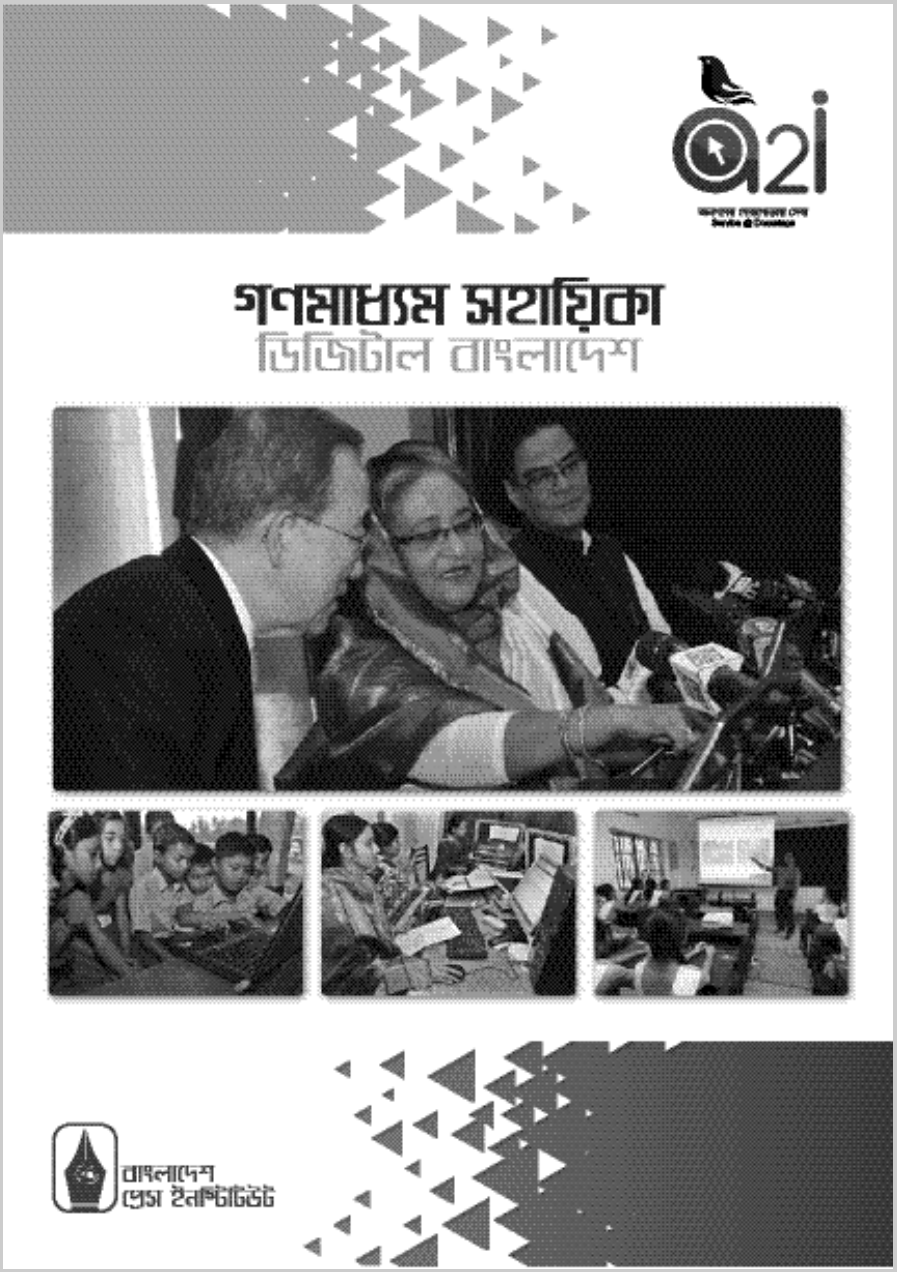

যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ

৩ সার্কিট হাউস রোড

ঢাকা-১০০০

ক্রীড়া সাংবাদিকতা রোমাঞ্চকর এক পেশা

মিনহাজ উদ্দীন

মানবসভ্যতার শুরুতেও খেলাধুলা বা ক্রীড়া ছিল। শুরুর দিকে একটি বন্যপ্রাণীকে বধ করা বা কোনো চ্যালেঞ্জ জয়ের মাধ্যমে ... এরপর থেকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলা নিরাপদ, গ্রহণযোগ্য, পরিশীলিত ও সভ্য রূপ পেয়েছে

সাংবাদিকতা নিঃসন্দেহে একটি বৈচিত্র্যময় পেশা। এ পেশায় বৈচিত্র্য আছে। আছে আবেগের সংমিশ্রণে পেশাদারিত্বের পরিচয় দেওয়ার সুযোগ। বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক, বাংলাদেশের যুদ্ধদিনের পরম বন্ধু সাংবাদিক সায়মন ড্রিং এক আলাপচারিতায় লেখককে বলেছিলেন, 'সাংবাদিকতার মূল সুবিধা (privilege) হলো, একজন সাংবাদিক ইতিহাস নির্মাণ দেখতে পারেন।' তাঁর সামনেই ইতিহাস রচিত হয়। সাংবাদিক সেই ঘটনা নিজ চোখে দেখে প্রতিবেদন তৈরি করেন, যা পরবর্তী সময়ে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নেয়। যেমন– মোহাম্মদ আশরাফুল ২০০১ সালের সেপ্টম্বরে শ্রীলংকার সিংহলিজ স্পোর্টস গ্রাউন্ডে সর্বকনিষ্ঠ টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে ১১৪ রানের একটি ইনিংস খেলেছিলেন, যা এক অনন্য বিশ্বরেকর্ড। এ রেকর্ড নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য বড়ো প্রাপ্তি। এ

ঘটনা অনেক বাংলাদেশি সাংবাদিক সিংহলিজ স্পোর্টস গ্রাউন্ডে বসে প্রত্যক্ষ করেছেন। তারা ইতিহাস রচিত হওয়া প্রত্যক্ষ করেছেন। আবার একই সঙ্গে নিজের পেশাগত দায়িত্ব পালন করেছেন। এটাই সাংবাদিকতা পেশার অন্যতম সুবিধা।

এমনই এক ইতিহাসের রোমাঞ্চকর কাহিনি জানা যায় দেশবরেণ্য ক্রীড়া সাংবাদিক উৎপল শুভ্রের বর্ণনায়। ২০১৮ সালে এসে বাংলাদেশ ক্রিকেট বিশ্বে এক সমীহ জাগানো শক্তি। কিন্তু ২০-২৫ বছর আগেও বাংলাদেশের ক্রিকেট ছিল হাতাশার অপর নাম। কয়েকবার বিশ্বকাপ খেলার কাছাকাছি এসেও বাংলাদেশের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে। বাংলাদেশ ক্রিকেটের সোনালি প্রজন্ম আকরাম-বুলবুল-নান্নুরা ব্যর্থ হচ্ছিলেন বারবার। তবে ১৯৯৭ সালে এসে যার অবসান হয়। বাংলাদেশ আইসিসি ট্রফি জয় করে। পেয়ে যায় বিশ্বকাপ ক্রিকেটের টিকিট, যা এতদিন ছিল মায়াবী এক সোনার হরিণ। গর্ডন গ্রিনিজের অধীন ওই আইসিসি ট্রফির যাত্রা বাংলাদেশের জন্য খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যের ছিল না। গ্রুপ পর্যায়ের নাটকীয় এক ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে কঠিন পরীক্ষা দিতে হয় বাংলাদেশকে। মালয়েশিয়ার সুগোই বুলোতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওই ম্যাচ। যে ম্যাচ কাভার করেছিলেন উৎপল শুভ্র। কোয়ার্টার ফাইনাল বনে যাওয়া ওই ম্যাচে চরম বিপদের সময় বীরত্বসূচক এক ইনিংস খেলেছিলেন আকরাম খান। উৎপল শুভ্র লিখেছেন, 'আকরাম খানের ৬৮ রানের ওই ইনিংসটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশের ক্রিকেট।' ওই ম্যাচে ১৭১ রানে জয়ের লক্ষ্যে খেলতে নেমে ১৪ রানেই ৪ উইকেট হরিয়েছিল বাংলাদেশ। এরপর বৃষ্টিবিঘ্নিত ওই ম্যাচে একপর্যায়ে বাংলাদেশের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৮৫ বলে ৮৫ রান, যা করতে পারলেই বিশ্বকাপের টিকিট! এদিকে উইকেটে তখন অবিচল আকরাম। অন্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে নিয়ে ঠিকই দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন আকরাম। ওই দিনের আবেগ-উচ্ছ্বাস আর দেশেপ্রেমের কথা লিখেছেন উৎপল শুভ্র। তিনি লিখেছেন, 'মাঠে তখন অবিশ্বাস্য দৃশ্য। এতক্ষণ চেপে থাকা টেনশন এভাবে সমাপ্তির দিকে মুখ দেখায় বিচিত্র এক অভিজ্ঞতা হলো দর্শকদের। ঈদের দিনের মতো ধুম পড়ে গেল আলিঙ্গনের। যে যাকে সামনে পাচ্ছে, তাকেই জড়িয়ে ধরছে। ... ড্রেসিংরুমের নিভৃতে গিয়ে বাংলাদেশের অধিনায়ক আত্মসমর্পণ করলেন আবেগের কাছে। দুই হাঁটুতে দুহাত রেখে উবু হয়ে আকরাম খান কাঁদছেন।' (সেই সব ইনিংস, ২০০১)।

ক্রীড়া সাংবাদিকতা এমনই। এখানে নিখাদ আবেগে ভেসে যাওয়ার সুযোগ থাকে। সুযোগ থাকে আনন্দ দেওয়ার, আনন্দিত হওয়ার। ক্রীড়া সাংবাদিকতার ধরন ও প্রভাব নিয়ে বিশ্বে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। গবেষণাও হয়েছে অনেক। অনেক তাত্ত্বিক ও পোড় খাওয়া ক্রীড়া সাংবাদিক অনেক নিবন্ধ লিখেছেন। ক্রীড়া সাংবাদিকতার অবয়ব নিয়ে একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় The Missouri Group-এর News Reporting and Writing (1992) বইয়ে। সাংবাদিকতার একাডেমিক এই বইটিতে ক্রীড়া অনুচ্ছেদে লেখকরা ক্রীড়া সাংবাদিকতা সম্পর্কে বলেছেন, 'Readers deserve better. Even if sports were only the toy department of life, sports writing – like toy – should be entertaining and educational. But sports in America is more than that. The heroes and the language of sports are woven into our politics and our literature. Sports itself a big business. Any institutions so pervasive and influential demands solid coverage. Sports offer a reporter all elements of which good stories are made – triumph, heart break, courage, skullduggery, comedy, artistry, even love and hate.' সংক্ষেপে বলা যায়, ক্রীড়া সাংবাদিকতা একই সঙ্গে শিক্ষামূলক ও আনন্দদায়ক হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশে ক্রীড়া সাংবাদিকতার প্রভাব আরও বেশি। ক্রীড়াঙ্গনের বীরত্ব ও বীরদের কাহিনি রাজনীতি ও সাহিত্য অঙ্গনে বিচরণ করে। এছাড়া ক্রীড়া প্রকৃতপক্ষে একধরনের বড় ব্যবসা। ক্রীড়া সাংবাদিকতায় এমন উপাদান আছে, যা মানুষের জীবনে ভীষণ প্রাসঙ্গিক। ক্রীড়াঙ্গনে আছে যুদ্ধ জয়ের আস্বাদন, হৃদয় ভাঙার বেদনা, বীরত্ব, কৌতুক এমনকি ভালোবাসা ও ঘৃণা।

ক্রীড়া সাংবাদিকতার প্রভাব-প্রতিপত্তি বা বিকাশ সাম্প্রতিক সময়ের নয়। সাংবাদিকতা শুরুর পর থেকেই ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে মানুষের আগ্রহ। আর বিশ্বের অনেক নামকরা সাহিত্যিক যারা একাধারে সাংবাদিক ছিলেন, তাদের অনেকেই ক্রীড়া সাংবাদিকতা করেছেন। বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিক আনেস্ট হেমিংওয়ে (Ernest Hemingway), ড্যামন রানওয়ান (Damon Runyon), হেউড ব্রুয়ান (Heywood Broun), পল গ্যালিকো (Paul gallico) ও রিং লারডনার (Ring Lardner) একসময় ক্রীড়া সাংবাদিকতা করতেন। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রখ্যাত কলামিস্ট জেমস রেসটন (James Roston) একসময় ক্রীড়া সাংবাদিকতা করতেন। জিম মারে (Jim Murry) ও রেড স্মিথ (Red Smith) সাংবাদিকতার সবচেয়ে মর্যাদাকর পুলিৎজার পুরস্কার পেলেও তারা ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে লিখে গেছেন দীর্ঘদিন। খেলাধুলার প্রতি তাদের ভালোবাসা কখনোই কমেনি। তারা ক্রীড়া সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন আমৃত্যু। (News Reporting and Writing)।

ক্রীড়া সাংবাদিকতা নিয়ে বিশেষ আলোচনা আছে Julian Harriss and Stanley Johnson-এর The Complete Report বইয়ে। বইটির ২৮ নম্বর অনুচ্ছেদে ক্রীড়া সাংবাদিকতা নিয়ে বলা হয়েছে, 'The sports reporters field is broad enough, however to challenge the finest talent. every sports has both it rules and records. It has a gallery of personalities and its hall of fame. Psychological factors deserve exploration, in the Grant land Rice fusion. Sports ethics and aesthetics and larger aspects of recreation and the social good are involved. Perhaps is no other field of reporting is the opportunity greater for mastery of background and for application of standard judgment.' সংক্ষেপে বলা যায়, ক্রীড়া সাংবাদিকতার ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। কিন্তু এখানে মেধাবী-পরিশ্রমী প্রতিবেদকরাই ভালো করতে পারেন। প্রত্যেকটি খেলার নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি ও রেকর্ডস আছে। যেমন আছে গ্যালারির উত্তেজনা, ঠিক তেমনি আছে কোনো ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির সুযোগ। যাতে আগ্রহ থাকে পাঠক-দর্শক-শ্রোতার। ক্রীড়াক্ষেত্রে নানন্দিক সৌন্দর্যের একটি বিষয় থাকে। যার মাধ্যমে একজন প্রতিবেদক দারুণভাবে কোনো জয় বা পরাজয়ের ঘটনা বর্ণনা করতে পারেন। এছাড়া সাংবাদিকতার এ ক্ষেত্রটিই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানেই প্রতিবেদক অতীতের ঘটনাপ্রবাহের সংমিশ্রণে ভবিষ্যৎকে নির্দেশ করে অনন্য সাধারণ সব প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন। তুলে ধরতে পারেন নিজের বিশ্লেষণ।

আধুনিক সভ্যতার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ গণমাধ্যম। আর গণমাধ্যমের নানাবিধ আধেয়ের মধ্যে অন্যতম খেলাধুলা। আমাদের সবারই জানা, খেলাধুলা শুধু চিত্তবিনোদনের মাধ্যমই নয়, খেলাধুলা এখন বড়ো পরিসরে ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবন-জীবিকার অংশ। এছাড়া বিশ্বব্যাপী খেলাধুলার ইতিবাচক সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব কোনো অবস্থাতেই উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।

মানবসভ্যতার শুরুতেও খেলাধুলা বা ক্রীড়া ছিল। শুরুর দিকে একটি বন্যপ্রাণীকে বধ করা বা কোনো চ্যালেঞ্জ জয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। এরপর নগর সভ্যতায় খেলাধুলা পায় ভিন্ন মাত্রা। প্রাচীন গ্রিসে নগরে নগরে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। যার আয়োজনস্থল বা ভেন্যু ছিল গ্রিসের অলিম্পিয়া নগরী। পরবর্তী সময়ে ১৮৯৬ সালে শুরু হয় আধুনিক গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের আসর। যার মাধ্যমে বিশ্বজুড়েই ক্রীড়া বা খেলাধুলা নিয়ে একধরনের উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। এরপর থেকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলা নিরাপদ, গ্রহণযোগ্য, পরিশীলিত ও সভ্য রূপ পেয়েছে। যার মাধ্যমে বিশ্বে প্রায় সারা বছরই নানা ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর এসব প্রতিযোগিতার নানা খবর, স্থিরচিত্র, ভিডিও ফুটেজ বিভিন্ন আঙ্গিকের বিশ্লেষণ আগ্রহী পাঠকের সামনে নিয়ে আসে গণমাধ্যম। যার মূলে কাজ করেন ক্রীড়া সাংবাদিকরা। বর্তমানে ক্রীড়া সাংবাদিকতার পরিধিও অনেক বিস্তৃত হয়েছে। ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুর্নীতি, যৌনতা, গ্লামার, ড্রাগস, প্রতারণাসহ নানা অনুষঙ্গ। যেমন: নিষিদ্ধ ড্রাগস নিয়ে টেনিসে নিষিদ্ধ হয়েছিলেন মারিয়া শারাপোভা, ঘুষ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে চাকরি খুইয়েছেন ফিফার প্রধান সেপ ব্লাটার (২০১৫)। আবার বাংলদেশ ক্রিকেটের অন্যতম উজ্জ্বলতম নক্ষত্র মোহাম্মদ আশরাফুল (২০১৩) জুয়াড়িদের সঙ্গে জড়িয়ে কলঙ্কিত করেছেন নিজের ক্যারিয়ার ও বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনকে। এসব কিছুই বাংলাদেশের গণমাধ্যমে এসেছে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে। বলা যায়, মোহাম্মদ আশরাফুলের ঘুষ কেলেঙ্কারির বিষয়টি ছিল টক অব দ্য কান্ট্রি। অন্যদিকে বাংলাদেশ যখন দেশের মাটিতে একদিনের ক্রিকেটে পাকিস্তানকে হোয়াটওয়াশ করেছে, ভারতকে সিরিজে পরাজিত করেছে, পরাক্রমশালী

দক্ষিণ আফ্রিকাকে ভূপাতিত করেছে, তখন অবধারিতভাবে গণমাধ্যমের মূল উপাদান হয়েছে খেলাধুলা।

যখন কোনো দেশের কোনো দল বিশেষ কোনো ইভেন্টে ভালো ফল করে, তখন সে সংক্রান্ত সাংবাদও বেশি বেশি প্রকাশিত হয়। এতে সাংবাদিকতার বিকাশে বিশেষ সুযোগ তৈরি হয়। যেমন: বাংলাদেশের ক্রীড়া সাংবাদিকতা ও ক্রিকেট অনেকটা একই সময় পাশাপাশি বিকশিত হয়েছে।

বাংলাদেশের ক্রীড়া সাংবাদিকতা

ব্রিটিশ ভারতে এ অঞ্চলে খেলাধুলার খুব একটা প্রচলন ছিল না। তারপরও সীমিত পরিসরে পল্টন ও ওয়ারী এলাকায় যেসব ক্লাব গড়ে উঠেছিল, সেগুলোর পৃষ্ঠপোষক ছিল ঢাকার নবাব পরিবার। সেসময় প্রকাশিত পত্রপত্রিকায় খেলাধুলা সংক্রান্ত সংবাদ খুবই কম প্রকাশিত হতো। কোনো ধরনের সংবাদ ছিল না বললেই চলে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে ঢাকা নগরীর গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পায়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঢাকা থেকে বাংলা ও ইংরেজি প্রত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। তবে তখনও পত্রিকার পাতায় নিয়মিতভাবে খেলাধুলার সংবাদ প্রকাশিত হতো না। তবে ষাটের দশকে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়। ওই সময় ইত্তেফাক খুবই জনপ্রিয় পত্রিকা। ইত্তেফাকের সঙ্গে অন্যান্য পত্রিকাও উপলব্ধি করে খেলাধুলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং এ সংক্রান্ত সংবাদের পাঠক আছে।

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ক্রীড়া সংক্রান্ত পত্রপত্রিকার সংখ্যা ও পাঠক একই সমান্তরালে বাড়তে থাকে। বের হয় ক্রীড়াবিষয়ক পাক্ষিক ম্যাগাজিন। এরপর আশির দশকে এসে ক্রীড়া সাংবাদিকতা পরিপূর্ণ রূপ পায়। সেসময় ফুটবল দেশে তুমুল জনপ্রিয়। আবাহনী-মোহামেডানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তখন ফুটবল অঙ্গনে ভরা যৌবন। এ সময়ই সংবাদপত্রে ক্রীড়া একটি আলাদা ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পায় আলাদা গুরুত্ব। নব্বইয়ের দশকেও ফুটবলের এ জনপ্রিয়তা বহাল ছিল। অন্যদিকে ধীরে ধীরে ক্রিকেটে ভালো করতে থাকে বাংলাদেশ। এদিকে ১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশের সংবাদপত্র জগতে বিশাল এক ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। সংবাদপত্র সংক্রান্ত কালা-কানুনগুলো রহিত হয়। অবাধ, মুক্ত গণমাধ্যম প্রচলনের বিশেষ ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এ ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারায় বিকশিত হয় ক্রীড়া সাংবাদিকতাও।

বাংলাদেশে ক্রীড়া সাংবাদিকতার বিশেষ এক অধ্যায় শুরু হয় ১৯৯৭ সালে। ওই বছর মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত আইসিসি ট্রফি জয়লাভ করে বাংলাদেশ। ফলে ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ডে বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলার সুযোগ পায় বাংলাদেশ। এ ছিল এক স্বপ্নযাত্রা। বাংলাদেশ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে! একটা বিশাল ঘটনা। বড়ো অর্জন। ওই প্রতিযোগিতায় নর্দাম্পটনে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শক্তিশালী পাকিস্তানকে ৬২ রানে পরাজিত করে। ওয়াসিম আকরাম, ওয়াকার ইউনুস, সাঈদ আনোয়ার, শহীদ আফ্রিদিদের পরাক্রমশালী পাকিস্তানকে হারিয়ে বিশ্বে আলোড়ন তৈরি করা হয়। অনেকদূর এগিয়ে যায় বাংলাদেশের ক্রিকেট। সঙ্গে বিকশিত হতে থাকে ক্রীড়া সাংবাদিকতা। এরপর ওই বছরই একদিন আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার স্ট্যাটাস ও ২০০০ সালে টেস্ট খেলুড়ে দেশের মর্যাদা পায় বাংলাদেশ। এরপর অনেকটা দ্রুতই এগিয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেট। আশি ও নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা ফুটবলকে পাশ কাটিয়ে জায়গা করে নিয়েছে ক্রিকেট। ২০০৭ সালে ক্যারিবীয় বিশ্বকাপে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো পরাশক্তিকে হারিয়ে আরো এগিয়ে যায় দেশের ক্রিকেট। আবার কিছু ব্যক্তিগত নৈপুণ্য বিশেষ করে মোহাম্মদ আশরাফুল, সাকিব আল হাসান ও তামিম ইকবালের মতো ক্রিকেট তারকার উত্থানে ক্রিকেট পেয়েছে ভিন্ন মাত্রা। ২০১০ সালের পর ক্রিকেট নিয়ে উন্মাদনা আরও লক্ষণীয়। বিভিন্ন দিক বিবেচনায় গণমাধ্যমের অন্যতম প্রধান আধেয়তে পরিণত হয়েছে ক্রিকেট। ফলে অনেকটাই আড়ালে চলে গেছে ফুটবল, হকি, কাবাডি, সাঁতার, শুটিংসহ অন্যান্য খেলাধুলার খবর।

২০১০ সালের পর বাংলাদেশের গণমাধ্যমেও বিশেষ পরিবর্তন এসেছে। সম্প্রচারে এসেছে বেশ কয়েকটি সংবাদভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল। যে চ্যানেলগুলোর অন্যতম অপরিহার্য উপাদান স্পোর্টস। আবার এ চ্যানেলগুলোর স্পোর্টস বুলেটিন বা ক্রীড়া অনুষ্ঠানে বেশির ভাগ দখল ক্রিকেটের। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সত্তরের দশকে বাংলাদেশের সংবাদপত্রে যেখানে গণমাধ্যমগুলোয় দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্রীড়া সাংবাদিক ছিল না, ২০১৭ সালে প্রতিটি গণমাধ্যমে আলাদা ক্রীড়া টিম রয়েছে। এক পাতা নয়, প্রথম সারির মানসম্পন্ন দৈনিক পত্রিকায় দুই পাতা করে ক্রীড়া সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া সংবাদভিত্তিক টেলিভিশনগুলোয় আলাদা বুলেটিন সম্প্রচারিত হচ্ছে। যেমন: যমুনা টেলিভিশনে প্রতিদিন তিনটি আধা ঘণ্টার বুলেটিন সম্প্রচারিত হয়। অনেকটা একই পরিসরে সংবাদ সম্প্রচার করে আসছে অন্য সংবাদভিত্তিক চ্যানেল এটিএন নিউজ, ইনডিপেনডেন্ট টিভি, ৭১ টিভি, ডিবিসি নিউজ, সময় টিভি, নিউজ ২৪ ও চ্যানেল ২৪। বলা যায়, বাংলাদেশের গণমাধ্যমে বিশেষভাবে জায়গা করে নিয়েছে খেলাধুলা সংক্রান্ত সংবাদ। বর্তমানে খেলাধুলার সংবাদকে গণমাধ্যমের মূল বিষয় বললেও খুব এক বাড়াবাড়ি হয় না।

বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের ক্রীড়া সাংবাদিক

২০১৮ সালে এসে বাংলাদেশের ক্রীড়া সাংবাদিকতা বিশেষ এক উচ্চতায় চলে এসেছে। বাংলাদেশ ক্রিকেটে বেশ ভালো করছে, ফুটবলে জাতীয় দল ভালো না করলেও বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দল খুব ভালো করছে। এছাড়া মাঝেমধ্যে অন্যান্য খেলায়ও বেশ সাফল্য দেখাচ্ছেন বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদরা। আর বিদেশের মাটিতে এ ধরনের নানা সাফল্যের কাহিনি দর্শক-পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে বিদেশবিভুঁইয়ে সাফল্যের সঙ্গে বিভিন্ন ইভেন্ট কাভার করে আসছেন বাংলাদেশের সাংবাদিকরা। এমনকি দেশের নারী সাংবাদিকরাও বিদেশে বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্ট সাফল্যের সঙ্গে কাভার করছেন। বৈশাখী টিভির তৃষা ভক্ত, চ্যানেল ২৪-এর সামিনা রশ্মি ও ডিবিসি নিউজের ফারজানা জহির পমি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে বিভিন্ন ইভেন্ট কাভার করেছেন। অন্যদিকে বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের কোনো ক্রিকেট সিরিজ বা ফুটবলের কোনো টুর্নামেন্ট এখন একটা উৎসবের মতো। দেশের টেলিভিশন চ্যানেল, পত্রপত্রিকা এমনকি অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোর সাংবাদিকরাও বিভিন্ন ইভেন্ট কাভার করতে দেশের বাইরে যাচ্ছেন।

বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের ক্রীড়া সাংবাদিকতা শুরুর পথিকৃৎ একজন কূটনৈতিক সাংবাদিক। তিনি মতিউর রমান চৌধুরী। তখন তিনি ইত্তেফাকে কাজ করতেন। বর্তমানে দৈনিক মানবজমিনের সম্পাদক। চ্যানেল আইয়ে মধ্যরাতে উপস্থাপন করেন সংবাদভিত্তিক জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'আজকের সংবাদপত্র'। মতিউর রহমান প্রথম বাংলাদেশি হিসেব বহির্বিশ্বে ইভেন্ট কাভার করেন ১৯৮৭ সালে। ইংল্যান্ডের মাটিতে রিলায়েন্স বিশ্বকাপ ক্রিকেট। যে আসরের শিরোপা জিতেছিল কপিল দেবের ভারত। এরপর ১৯৯০ সালে তিনি ইতালিতে অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল কাভার করেন। যে টুর্নামেন্টে ম্যারাডোনার আর্জেন্টিনাকে পরাজিত করে শিরোপা জেতে পশ্চিম জার্মানি। যাতে পত্রিকা হাউসের যতটা আগ্রহ ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল মতিউর রহমানের ব্যক্তিগত আগ্রহ। এরপর অন্যান্য ক্রীড়া সাংবাদিক মতিউর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

এরপর বাংলাদেশ ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে সংবাদিকরা বিদেশে গেছেন। বাংলাদেশ নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকেই ভালো ক্রিকেট খেলছিল। বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশ নেওয়ার টুর্নামেন্ট আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ ভালো করছিল; কিন্তু সাফল্য আসছিল না। ১৯৯৪ সালে আইসিসির এ টুর্নামেন্ট আয়োজিত হয় কেনিয়ায়। ওই টুর্নামেন্ট কাভার করেন দুজন সাংবাদিক। ইত্তেফাকের দিলু খন্দকার ও সাংবাদিক শহীদুল আলম। ১৯৯৪ সালের ওই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ ছিল দ্বিতীয় বাছাই। বাংলাদেশের বিশ্বকাপ খেলার বেশ সুযোগ ছিল। কিন্তু অন্যদিকে কেনিয়াও বেশ শক্তিশালী দল। যাই হোক, টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ হেরে যায়। অপেক্ষা বাড়ে বিশ্বকাপের। তবে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয়। মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত আইসিসির ওই টুর্নামেন্ট কেনিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপ খেলার টিকিট পায় বাংলাদেশ। সঙ্গে পারাজিত করে কেনিয়াকে। এরপর খুলে যায় স্বপ্নদুয়ার। ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায় বহুগুণ। ১৯৯৯ সালের যুক্তরাজ্য বিশ্বকাপে কম প্রেস কার্ড করার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবাদ জানান বাংলাদেশের সাংবাদিকরা। পরে বিসিবির মধ্যস্থতা আর বাংলাদেশেস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশনের সহযোগিতায় বাড়ানো হয় প্রেস কার্ডের সংখ্যা। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাংলাদেশি সাংবাদিক কাভার করেন ১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপ।

কেমন হবেন একজন ক্রীড়া সাংবাদিক

আগ্রহী: শুধু ক্রীড়া কেন, সাংবাদিকতার অন্য ধারাগুলোয়ও সফলতা বা ভালো করার মূল চাবিকাঠি আগ্রহ। একটি একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ শেষ

হতে প্রায় আট ঘণ্টা সময় লাগে। টেস্ট ম্যাচের দৈর্ঘ্য পুরো পাঁচ দিন। তাই দীর্ঘ সময় ধরে কোনো ম্যাচ দেখা বা খুঁটিনাটি বিষয় লক্ষ করা খুবই কঠিন কাজ। এছাড়া ক্রীড়া সাংবাদিকতার অন্য ক্ষেত্রগুলোয়ও আগ্রহ খুবই নিয়ামক একটি বিষয়। কারো যদি ক্রীড়া সাংবাদিকতায় আসার আগ্রহ না থাকে, তাহলে এদিকে না আসাই ভালো। আবার কারো যদি বেশ আগ্রহ থাকে, তিনি অবশ্যই এ অঙ্গনে ভালো করবেন। দৈনিক প্রথম আলোর ক্রীড়া সাংবাদিক উৎপল শুভ্র সাংবাদিকতায় পড়াশোনা করেননি। তিনি ছিলেন বুয়েটের শিক্ষার্থী। কিন্তু খেলার মাঠ তাঁকে টানত। তাই তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং বাদ দিয়ে খেলার মাঠকে বেছে নিয়েছেন। তিনি নিজের খ্যাতিকে নিয়ে গেছেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে।

আবেগ: কারো যদি খেলাধুলা নিয়ে কোনো আবেগ না থাকে, তাহলে তাঁর এই বিটে কাজ করতে না আসাই শ্রেয়। এটি বাধ্যতামূলক নয় যে সবাইকে খেলাধুলা ভালোবাসতে হবে, সবার সমান আবেগ থাকবে। যেহেতু খেলাধুলা খুবই রোমাঞ্চকর বিষয়, তাই এ রোমাঞ্চকে ধরতে আবেগী একজন মানুষ দরকার।

খেলাধুলার নিয়মকানুন সম্পর্কে অবগত: খেলাধুলা সংক্রান্ত প্রতিবেদন করতে গিয়ে অবশ্যই এর আইনকানুন সম্পর্কে জানা খুবই জরুরি। টেস্ট ক্রিকেটে কত রানে ফলো-অন হয়, একজন ফিল্ডার ম্যাচ চলাকালীন কত ওভার বাইরে থাকার পর আবার কত ওভার ফিল্ডিং করার পর বল করতে পারবেন– একজন ক্রীড়া প্রতিবেদক এসব বিষয় ভালো জানবেন। একই সঙ্গে টেনিসে কত গেমে সেট, ডিউস কী– ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান রাখবেন। একই সঙ্গে ফুটবলের আইনকানুন সম্পর্কেও অবগত থাকবেন একজন ক্রীড়া প্রতিবেদক। এছাড়া বর্তমানে প্রতিনিয়ত খেলাধুলার নতুন নতুন প্রযুক্তিনির্ভর আইনকানুন যুক্ত হচ্ছে, সেসব বিষয়ে অবশ্যই অবগত থাকতে হবে।

ধৈর্য: মনে রাখতে হবে, ধৈর্য সব পেশার জন্যই ভীষণভাবে জরুরি। ক্রীড়া সাংবাদিকরাও বিশেষভাবে ধৈর্যশীল হবেন। লম্বা পরিসরের ক্রিকেট ম্যাচ অথবা অধিকতর লম্বা সময় ধরে চলা টেনিস ম্যাচ কাভারে প্রতিবেদককে ধৈর্যশীল না হয়ে উপায় নেই। লন টেনিসের ইতিহাসে একটি ম্যাচ হয়েছিল তিন দিন ধরে। ২০১০ সালে ২২-২৪ জুন তিন দিন ধরে চলেছিল একটি ম্যাচ। ১১ ঘণ্টা ৫ মিনিটের ওই ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের জন ইসনার ফ্রান্সের নিকোলাস মাহুটকে পরাজিত করেছিলেন ৬-৪, ৩-৬, ৬-৭ (৭-৯), ৭-৬ (৭-৩), ৭০-৬৮ পয়েন্টে। এটি ছিল একটি বিশ্বরেকর্ড। এরকম রেকর্ডময় ম্যাচসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রতিবেদকের ধৈর্য খুবই জরুরি আকারে দেখা দিতে পারে।

সৎ: সততা সব পেশাতেই অপরিহার্য। বর্তমান সময়ে ক্রীড়া সাংবাদিকতার সঙ্গে অনেক নেতিবাচক বিষয় জড়িত। বেটিং, ফিক্সিং, স্পট-ফিক্সিং নানা বিষয়ে সাংবাদিকদের কাজ করতে হয়। এসব বিষয়ে সংবাদ তৈরির ক্ষেত্রে সাংবাদিক অবশ্যই সততার সঙ্গে সংবাদ পরিবেশন করবেন। একই সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণসহ নানা বিচার-বিশ্লেষণে সততার পরিচয় দেবেন।

বিশ্লেষণ ক্ষমতা: বর্তমান সময়ে শুধুই সাদামাটা প্রতিবেদন তৈরিই যথেষ্ট নয়। প্রতিবেদককে অনেক কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়। দিতে হয় ভবিষ্যতের নির্দেশনা। কোন খেলোয়াড় ভালো করতে পারে, কেন ওই খেলোয়াড়কে দল থেকে বাদ দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়– এসব বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকতে হবে। বর্তমান সময়ে দৈনিক কালের কণ্ঠের স্পেশাল করসপনডেন্ট নোমান মোহাম্মদ এক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন সংবাদ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দৈনিক কালের কণ্ঠে বিচার-বিশ্লেষণ আকারে তুলে ধরছেন, যা ওই পত্রিকাকে বিশেষভাবে পাঠকপ্রিয়তা দিয়েছে।

আধুনিক ক্রীড়া সাংবাদিকতা ও এন্ড্রু জেনিংস (Andrew Jennings)

এন্ড্রু জেনিংস একজন বিখ্যাত অনুসন্ধানী সাংবাদিক। ক্রীড়াঙ্গনের অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে তিনি অসাধারণ কাজ করেছেন। স্কটিশ এই সংবাদিকই ফুটবলের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার প্রধান সেপ ব্লাটার ও সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তার দুর্নীতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে অসাধারণ প্রতিবেদন তৈরি করেন। যাতে বিশ্বে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। ২০১৫ সালের অক্টোবরে প্রতাপশালী ফিফা বস সেপ ব্লাটার পদত্যাগে বাধ্য হন। সুইস নাগরিক সেপ ব্লাটার ফিফার একজন প্রতাপশালী প্রধান ছিলেন। যিনি টানা ১৭ বছর সংস্থাটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এন্ড্রু জেনিংস এই প্রতাপশালী ফিফা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে টানা ১৫ বছর নানা বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। ধারাবাহিকভাবে কার্যকর অনুসন্ধান করে গেছেন ফুটবল ও ফুটবলের নিয়ন্ত্রণক সংস্থা ফিফার বিষয়ে। তবে এই যাত্রা সহজ ছিল না। এই অনুসন্ধান করতে গিয়ে এন্ড্রু জেনিংসকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। ২০০২ সালে সেপ ব্লাটার দ্বিতীয় মেয়াদে ফিফার প্রধান নির্বাহী হিসেবে নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হওয়ার পর এক সংবাদ সম্মেলনে এন্ড্রু জেনিংস সেপ ব্লাটারকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'এই ব্লাটার তুমি কি কখনও ঘুষ নিয়েছ? (Herr Blatter, have you ever taken a bribe?) পরবর্তী সময়ে জেনিংস ওয়াশিংটন পোস্টকে জানান, ব্লাটার উত্তর দিয়েছিলেন তিনি কখনোই ঘুষ নেননি। জেনিংস ওই পত্রিকায় বলেন, আমি জানতাম ফিফার ভেতরে অনেক কিছু ঘটছে। এর কয়েক সপ্তাহ পরেই ফিফার এক কর্মকর্তার তরফ থেকে আমি অনেক তথ্য-উপাত্ত পাই। যাতে এ সংস্থাটির ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য-উপাত্ত ছিল। ওই সূত্র ধরেই জেনিংস বের করে ফিফার প্রধান বড় অঙ্কের ঘুষ নিয়েছেন। এরপর ২০০৩ সালে জেনিংসকে ফিফা কার্যালয়ের চত্বরে নিষিদ্ধ করা হয়। এরপর তাঁকে নিষিদ্ধ করা হয় ফিফার সব সংবাদ সম্মেলনে। এরপরও জেনিংস অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে যান। ২০০৬ সালে প্রকাশ করেন অনুসন্ধানমূলক বই 'The book, Foul! : The Secret World of Fifa: Bribes,Vote Rigging And Ticket Scandals.' এরপর তিনি বিবিসির অনুসন্ধানী অনুষ্ঠান বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হন। সেখানে তিনি একটি অনুসন্ধানী তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন। যার শিরোনাম ছিল The Beautiful Bung: Corruption And The World Cup. এরপর জেনিংস তাঁর অনুসন্ধান কাজে যুক্ত থাকেন। ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর আরেকটি বিখ্যাত বই Omertà: Sepp Blatters Fifa Organised Crime Family. এরপরই তাঁর অনুসন্ধানের নানা বিষয় নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুসন্ধান শুরু করা হয়। যাতে বেরিয়ে আসে থলের বিড়াল। শুরু হয় তোলপাড়। ফিফার অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আটক হন। তহবিল তছরুপসহ নানা অভিযোগে অপসারিত হন সেপ ব্লাটার।

মনে রাখতে হবে, সাংবাদিকতা অন্য আট-দশটি পেশার মতো নয়। এটি একদিকে যেমন ঝুঁকিপূর্ণ, অন্যদিকে ঠিক তেমনি রোমাঞ্চকর। সাংবাদিকতা নিয়ে কাজ করা ফরাসি পর্যবেক্ষণ সংস্থা রিপোর্টার্স উইথআউট বডার্সের (আরএসএফ) তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সালে আততায়ীর হাতে খুন হয়েছেন বিশ্বের ৬৫ জন সাংবাদিক। ২০১৬ সালে এ সংখ্যা ছিল ৭৯ জন। মাদক ও চোরাচালান সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন মেক্সিকোর সাংবাদিকরা। এরপর সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ায়। ২০১৭ সালে আততায়ীর হাতে নিহত সাংবাদিকদের মধ্যে ১০ জন নারীও ছিলেন। তবে ২০১৭ সালের এ তালিকায় কোনো ক্রীড়া সাংবাদিক ছিলেন না। ক্রীড়া সাংবাদিকরা একেবারেই নির্ঝঞ্ঝাট থাকেন তা নয়। তারাও হুমকি পান। বাজিকরদের কাছ থেকে পান অনৈতিক প্রস্তাব। অনেক সময় ক্রীড়া সাংবাদিকদের বাজিকররা স্বার্থ সিদ্ধির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করে। যাতে নিঃসন্দেহে ঝুঁকি থাকে। তবে তারপরও সার্বিকভাবে ক্রীড়া সাংবাদিকতা নিশ্চিতভাবেই অনেক উপভোগ্য একটি পেশা। যে কারণেই বাংলাদেশে অনেক প্রতিশ্রুতিশীল মেধাবী তরুণ দিন দিন এ পেশার দিকে ছুটছেন।

তথ্যসূত্র

The Complete Report. (Second Edition, 1965), Julian Harriss and Stanley Johnson. Toronto: The Macmillan Company.

News Reporting and Writing. (1992) The Missouri Group. Brain S. Brooks, George Kennedy, Darly R. Moen, Don Ranly. New York: St. Martin's Press.

শুভ্র, উৎপল (২০০৭)। বিশ্ব যখন ফুটবলময়। ঢাকা: অনন্যা।

শুভ্র, উৎপল (২০০১)। সেই সব ইনিংস। ঢাকা: অনন্যা।

http://www.straitstimes.com/sport/football/andrew-jennings-dogged-journalist-who-exposed-fifa-corruption-that-led-to-sepp

লেখক: প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রীড়া সংবাদিকতার অ্যানালগ ও ডিজিটাল বয়ান

মাহামুদুল হক

ক্রীড়া সাংবাদিকতাকে বলা হয় সফট জার্নালিজম। ... নাটকীয় ভঙ্গি, কথককথা, রূপক, বিশেষণসহ সাহিত্যিক ও কাব্যিক ভাষার প্রয়োগ করার সুযোগও থাকে ক্রীড়া সংবাদে। এসব কিছু অ্যানালগ কথন

ক্রীড়া সংবাদ গণমাধ্যমের অন্যতম উপজীব্য আধেয় হিসেবে বর্তমানে পরিগণিত। শিশুকাল থেকেই খাদ্য-খানার পাশাপাশি খেলাধুলা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও অনুষঙ্গ। বাংলাদেশ খেলাধুলায় আন্তর্জাতিকভাবে সাফল্য পেয়েছে। সুনাম অর্জন করে চলেছে। এসব কারণে গণমাধ্যমের পাঠক-দর্শক-শ্রোতার ক্রীড়া সংবাদের প্রতি আকর্ষণ থাকে। বস্তুত বাংলাদেশে খেলাধুলার সংবাদের প্রতি আকর্ষণ অন্যান্য সংবাদের চেয়ে অনেক বেশি। এজন্য খেলাধুলার সংবাদের জন্য সংবাদপত্রে কয়েকটা পৃষ্ঠা বরাদ্দ থাকে। আর যদি বিশ্বকাপ ক্রিকেট বা বিশ্বকাপ ফুটবলের মতো ইভেন্ট শুরু হয়, তবে ক্রীড়া সংবাদ ও ক্রীড়া বিশ্লেষণের প্রতি আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। গণমাধ্যম এ সময় খেলধুলার সংবাদ ও বিশ্লেষণ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ বা প্রচার করে। সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় স্থান পায় খেলার সংবাদ

ও বিশ্লেষণ আর টেলিভিশনের পর্দায় চলে লাইভ প্রচার, টকশো ও বিশেষ বুলেটিন। সংবাদপত্র, রেডিও-টিভি ও অনলাইন মিডিয়ায় আলাদা ক্রীড়া বিভাগ রয়েছে। বিশেষায়িত ক্রীড়া ম্যাগাজিন এবং ক্রীড়াবিষয়ক বিদেশি টিভি চ্যানেলের সংখ্যাও কম নয়।

অ্যানালগ ক্রীড়া সাংবাদিকতায় রয়েছে নানা পদপদবি। ক্রীড়া সম্পাদক হচ্ছেন ক্রীড়া বিভাগের প্রধান দলনেতা ও নীতিনির্ধারক। যেমন মেট্রো সম্পাদক নগর পাতাগুলো বা মফস্বল সম্পাদক মফস্বল পাতাগুলোর দায়িত্বে থাকেন, তেমনি ক্রীড়া সম্পাদক থাকেন ক্রীড়া পাতাগুলোর সম্পাদনার দায়িত্বে। তার বিভাগে থাকেন বেশ কিছু ক্রীড়া রিপোর্টার ও সহ-সম্পাদক। তিনি মূলত সিদ্ধান্ত নেন তার খেলাধুলার পাতায় কী কী ক্রীড়া সংবাদ ও ছবি যাবে, কীভাবে যাবে এবং পৃষ্ঠাসজ্জা কেমন হবে। তিনিই মূলত ক্রীড়া পাতায় আধেয়ের মূল পরিকল্পনাকারী। তবে সংবাদ ব্যবস্থাপনায় সম্পাদক, প্রধান বার্তা সম্পাদক/বার্তা সম্পাদকের সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে থাকেন। বড়ো ক্রীড়া ইভেন্ট যেমন বিশ্বকাপ ফুটবল বা ক্রিকেটের সংবাদ বা অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়া সংবাদ প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পায়। এসব সংবাদ ব্যবস্থাপনায়ও ক্রীড়া সম্পাদক কাজ করেন। রেডিও-টিভি ও অনলাইন মিডিয়ার ক্রীড়া সম্পাদকরাও একইরূপ সংবাদ ব্যবস্থাপনার কাজ করেন। ক্রীড়াবিষয়ক অগাধ জ্ঞান, লেখনী শক্তি ও সংবাদ ব্যবস্থাপনা– প্রধান এ তিন দক্ষতার প্রয়োজন হয় ক্রীড়া সম্পাদকের। ক্রীড়া রিপোর্টার ও সহ-সম্পাদকরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় একসময় ক্রীড়া সাম্পাদক হয়ে উঠেন।

ক্রীড়া বিভাগের আরেকটি পদ হচ্ছে ক্রীড়া রিপোর্টার। ক্রীড়া রিপোর্টার অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পদ। কেননা ক্রীড়া রিপোর্টারদের কদর অনেক। বর্তমানে গণমাধ্যমগুলো নিজ খরচে খেলাধুলা সংক্রান্ত সংবাদ কাভার করার জন্য ক্রীড়া রিপোর্টারদের দেশের বাইরে পাঠাচ্ছে। ক্রীড়া রিপোর্টার রেডিও-টিভিতে ভেন্যু থেকে সরাসরি লাইভ রিপোর্ট করেন। আবার অফিসে এসেও তার রিপোর্ট জমা দেন। রিপোর্ট সম্পাদনার পর প্রকাশিত বা প্রচারিত হয়। সংবাদপত্রের জন্য লেখনী শক্তি ও খেলাধুলার ওপর অগাধ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় ক্রীড়া রিপোর্টারের। আর রেডিও-টিভির জন্য প্রয়োজন হয় বচন ও বাচনভঙ্গি তথা উপস্থাপনার দক্ষতা ও ক্রীড়াবিষয়ক জ্ঞান।

আর সহ-সম্পাদক হলেন নেপথ্যের নায়ক। ক্রীড়া রিপোর্টারের রিপোর্ট সহ-সম্পাদক হাতের ক্যারিশম্যাটিক দক্ষতায় রিপোর্টকে প্রকাশযোগ্য বা প্রচারযোগ্য করে তোলেন। অথচ অডিয়েন্স তাদের চেনেন না বা রিপোর্টে তাদের নাম যায় না। ভাষাধারণা-সাংবাদিকতার লেন্স দিয়ে ক্রীড়া রিপোর্টের মানোন্নয়ন করেন সহ-সম্পাদক। রেডিও-টিভিতে সহ-সম্পাদককে নিউজরুম এডিটর বলা হয়। খেলাধুলার ছবি তোলার দায়িত্বে যিনি থাকেন, তিনি ক্রীড়াবিষয়ক চিত্র সাংবাদিক। টেলিভিশন চ্যানেলের জন্য থাকেন ভিডিওগ্রাফার। বাংলাদেশে বেশির ভাগই চিত্র সাংবাদিক হয়েছেন কাজ করতে করতে। তবে বর্তমানে অনেকে একাডেমিক ডিগ্রি বা কোর্স করে এ পেশায় আসছেন।

আর্ট অ্যানিমেটরও থাকেন ক্রীড়া বিভাগে। বিভিন্ন ধরনের ইমেজের ব্যবস্থাপনা ও উপস্থাপনা আর্ট অ্যানিমেটরের কাজ। টেকনিক্যাল এ ধরনের মানবসম্পদের চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে। চারুকলা, অঙ্কন ও কম্পিউটার সফটওয়্যারের ওপর দক্ষতা থাকলে আর্ট অ্যানিমেটর হিসেবে ভালো ক্যারিয়ার গড়ে তোলা যায়। টিভি ও অনলাইন মিডিয়ায় আর্ট অ্যানিমেটরের চাহিদা অনেক।

রেডিও-টিভিতে খেলা চলাকালীন বিভিন্ন ঘোষণা এবং খেলার ধারাবর্ণনা দেওয়া হয়। এজন্য ক্রীড়াবিষয়ক ঘোষক ও ক্রীড়া ধারাভাষ্যকার পেশা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু পেশাটি এখনো খণ্ডকালীন কাজ হিসেবেই রয়ে গেছে।

সবমিলিয়ে ক্রীড়া সাংবাদিকতার ক্ষেত্র এখন অনেক বিস্তৃত। পুরো বিশ্ব আজ হাতের অঙ্গুলের ছোঁয়ায়। বিশ্ব আজ ডিজিটাল খামের ভেতর প্যাকেটজাতকৃত। এজন্য বিশ্ব গণমাধ্যমের ক্রীড়া বিভাগগুলো আলাদা সোশ্যাল মিডিয়া স্পেশালিস্ট রাখে ক্রীড়া সংবাদকে ফেসবুক ও টুইটারের মতো ডিজিটাল প্লাটফর্মের অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। বাংলাদেশের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোয়ও আলাদা অনলাইন বিভাগ রয়েছে। ফেসবুক বা টুইটারে একজন খেলোয়াড়ের অ্যাকাউন্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়া সংবাদের উৎস বা পটভূমিগত তথ্যের ক্ষেত্রে। তাই ক্রীড়া সাংবাদিকদের জন্য এসব সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার অপরিহার্য। অনেক খেলাধুলার ইভেন্ট সাংবাদিক বা খেলোয়াড়দের সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রাগ বা স্ট্যাটাস দেওয়ায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। আর নেটিজেনরা তা নিয়ে মন্তব্য করে। বিশ্বকাপ ফুটবল আসরে বাংলাদেশে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের সমর্থকদের মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধ ফেসবুক যুদ্ধে পরিণত হয়। মাঠের বল-জার্সি ও পতাকা ছেয়ে যায় ফেসবুকের প্রান্তর। সোশ্যাল মিডিয়া ক্রীড়ামোদিদের ক্রীড়া সংবাদ গ্রহণের আভ্যাসকে বদলে দিয়েছে। প্রথাগত মিডিয়ার জন্য তা চ্যালেঞ্জও বটে। সংবাদ পরিবেশন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে প্রথগত মিডিয়াকেও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে হচ্ছে। খেলার ফল সঙ্গে সঙ্গেই টুইট হচ্ছে। নতুন পরিবেশ ও নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। নতুন ধরনের দক্ষ মানবসম্পদের প্রয়োজন হচ্ছে। কিন্তু নতুন ধরনের মানবসম্পদ তৈরির মতো প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে গড়ে উঠেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগগুলোয় ক্রীড়া সাংবাদিকতা শুধু একটা টপিক হিসেবে পঠিত হয়। পূর্ণাঙ্গ কোর্স হিসেবে এখনো ক্রীড়া সাংবাদিকতা পড়ানো হচ্ছে না। সাংবাদিকতার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় সেরকম সাজ-সরঞ্জামও নেই। ক্রীড়া সাংবাদিকতাবিষয়ক বিশেষজ্ঞ শিক্ষকও নেই। ক্রীড়া সাংবাদিকতার ক্ষেত্র যেভাবে প্রসারিত হচ্ছে তাতে শুধু কোর্স নয়, ক্রীড়া সাংবাদিকতার ওপর মাস্টার্স ডিগ্রি চালু করা যায়। আর ২৪ ঘণ্টার ক্রীড়াবিষয়ক টিভি চ্যানেল বাংলাদেশে চালুর যথেষ্ট সম্ভাবনা ও পরিবেশ বিদ্যমান।

> পুরো বিশ্ব আজ হাতের অঙ্গুলের ছোঁয়ায়। বিশ্ব আজ ডিজিটাল খামের ভেতর প্যাকেটজাতকৃত। ... আলাদা সোশ্যাল মিডিয়া স্পেশালিস্ট রাখে ক্রীড়া সংবাদকে ফেসবুক ও টুইটারের মতো ডিজিটাল প্লাটফর্মের অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছে দিতে হবে

ক্রীড়া সাংবাদিকতাকে বলা হয় সফট জার্নালিজম। কেননা ক্রীড়া সংবাদ লেখা বা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে থাকে স্বাধীনতা। অন্যান্য রিপোর্টের ভাষার মতো ক্রীড়া সংবাদের ভাষা নিয়ন্ত্রিত নয়। নাটকীয় ভঙ্গি, কথককথা, রূপক, বিশেষণসহ সাহিত্যিক ও কাব্যিক ভাষার প্রয়োগ করার সুযোগও থাকে ক্রীড়া সংবাদে। এসব কিছু অ্যানালগ কথন।

ক্রীড়া সংবাদ উপস্থাপনায় পরিবর্তন এসেছে ডিজিটাল যুগে। ডিজিটাল যুগে ট্রান্সমিডিয়া গল্পকথন (transmedia storytelling) এখন ক্রমশই জনপ্রিয় হচ্ছে। ট্রান্সমিডিয়া গল্পকথন হচ্ছে একটা ঘটনা; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের সংবাদ কাহিনি যা সব প্লাটফর্মের বা মাধ্যমের জন্য উপযুক্ত (ট্রান্সমিডিয়া– একটা ঘটনা, অনেক গল্প, অনেক আঙ্গিক, অনেক চ্যানেল বা মাধ্যম)। ক্রীড়া সংবাদ অবশ্যই যথার্থ, আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় হবে। কিন্তু ডিজিটাল অডিয়েন্সকে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্তকরণ, অংশগ্রহণমুখী এবং জটিল বিষয়কে সহজভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে ট্রান্সমিডিয়া গল্পকথন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রক্রিয়ায় ক্রীড়া সংবাদ ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, টেলিভিশন, রেডিও এবং মুদ্রণ মাধ্যমের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশন করা যায়। ট্রান্সমিডিয়া কৌশল প্রয়োগ করে একই ক্রীড়া সংবাদ ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্নভাবে এবং ভিন্ন প্লাটফর্ম বা মাধ্যমের উপযোগী করে প্রকাশ করা হয়। আরেকটি কৌশল হচ্ছে ক্রসমিডিয়া গল্পকথন (crossmedia storytelling)। ক্রসমিডিয়া গল্পকথন প্রক্রিয়ায় একই আধেয় (সংবাদ, গান, টেক্সট, চিত্র) বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। ক্রসমিডিয়া ও ট্রান্সমিডিয়া– দুটিই মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিকতার কৌশল এবং উভয় প্রক্রিয়ায়ই মিথস্ক্রিয়ামূলক। বাংলাদেশে অনলাইন সাংবাদিকতায় মূলত ক্রসমিডিয়া গল্পকথন প্রক্রিয়ার চর্চা করা হচ্ছে। ক্রীড়া সাংবাদিকতায় এসব ডিজিটাল বয়ান অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা প্রথাগত ও অ্যানালগ মিডিয়া কতদিন টিকে, সেই প্রশ্ন এখন সবার মুখে।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নলেজ ইন্ডাস্ট্রি

প্রসঙ্গঃ ক্রীড়া প্রতিবেদন

কামরুন নাহার

কোনো মিডিয়া হাউসের ক্রীড়া বিভাগকে বলা হয়ে থাকে টয় ডিপার্টমেন্ট। খুব সিরিয়াস ইস্যু নিয়ে কাজ করে না বলে এমনটা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এ টয় ডিপার্টমেন্টের জন্যই বড়ো পত্রিকাগুলোয় দুটি করে পাতা বরাদ্দ থাকে। চ্যানেলগুলোয় খেলার সংবাদ পরিবেশন করা হয় বেশ আয়োজন করে আর সেই সঙ্গে থাকে খেলাধুলার ওপর আলাদা সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান। পত্রিকাগুলোয় থাকে সপ্তাহে বিশেষ পাতা। মানুষের বিনোদনে ক্রীড়া সবচেয়ে নির্ভেজাল অনুষঙ্গ। একদল খেলে আনন্দ পায়, আরেক দল দেখে। যারা দেখে আনন্দ পায় (টিভিতে অথবা গ্যালারিতে বসে), তাদের জন্যই যারা পেশাদার হিসেবে খেলে সবাইকে আনন্দ দেয়, তাদের সংবাদ পরিবেশন করা হয়। আর এ পরিবেশনের কাজটা করেন ক্রীড়া প্রতিবেদকরা। একসময় খেলাধুলা শুধুই বিনোদন থাকলেও এখন এটা পেশা। তাই ক্রীড়া সাংবাদিকতাও আজকের দিনে অপরিহার্য এক পেশা, সেই সঙ্গে নেশাও।

> তাই ক্রীড়া সাংবাদিক হতে গেলে সাংবাদিকতার ওপর মিনিমাম গ্র্যাজুয়েশন থাকা জরুরি। একজন ক্রীড়া সাংবাদিকের শারীরিকভাবে সুস্থ-সবল থাকাটাও তার এক ধরনের যোগ্যতা

ক্রীড়া সাংবাদিকতা: খুব সাদামাটা ভাষায় ক্রীড়া সাংবাদিকতা হলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পেশাদার এবং

অপেশাদার (amateur) সব ধরনের খেলাধুলার সংবাদ সংগ্রহ, সংবাদ তৈরি এবং সেটা পাঠক, দর্শক বা শ্রোতা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। ক্রীড়া সাংবাদিকতা একটা বিশাল ব্যাপার। ক্রীড়া সাংবাদিকতা ব্যাপক কর্মযজ্ঞের একটি। বলা চলে, প্রধান শাখা হলো ক্রীড়া প্রতিবেদন। অর্থাৎ খেলাধুলার সংবাদ সংগ্রহ ও লিখন। সেই সংবাদ সম্পাদনার এবং আলোকচিত্রের জন্য আছে আলাদা বিভাগ। একজন ক্রীড়া সাংবাদিক খেলায় কোন দল হারল বা জিতল, সেটা লিখেন। এছাড়াও ত্রিদেশীয় ক্রিকেট সিরিজ খেলতে আসা অপর দুই দল কবে আসছে, দলগুলোর অবস্থা কী, কারা খেলছে, কবে থেকে খেলা শুরু হবে, স্পন্সর কারা, টিকিটের দাম কেমন, কবে-কোথায় টিকিট পাওয়া যাবে, কোন কোন ভেন্যুতে খেলা হবে, সেগুলোর অবস্থা কী, সিরিজের তিন দলের কোচ কারা, ফর্মে থাকা খেলোয়াড় কারা, দলগুলোয় নতুন কোনো খেলোয়াড় খেলছে কি না– এসব কিছুর ওপরই তারা প্রতিবেদন লেখেন। দেশীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলোর কী অবস্থা, কোন ফেডারেশন কেমন চলছে, খেলাধুলায় কত বাজেট আসছে, কোথাও ট্যালেন্ট হান্ট কর্মসূচি হচ্ছে কি না, কোনো এলাকায় সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় আছে কি না, সাবেক খেলোয়াড়দের দিনকাল কেমন যাচ্ছে, আম্পায়ার-রেফারিদের কী অবস্থা কিংবা ধারাভাষ্য কেমন চলছে– এসব বিষয় নিয়েই ক্রীড়া প্রতিবেদকরা প্রতিবেদন তৈরি করেন। এ বিষয়গুলোর ওপর প্রতিবেদকরা হার্ড এবং সফট দুই ধরনের সংবাদই লিখে থাকেন। আমার কাছে ক্রীড়া সাংবাদিকতা হলো আনন্দদায়ক সাংবাদিকতা। ক্রীড়া সাংবাদিকরা সব সময় আনন্দে থাকেন, হাসিখুশি থাকেন। কারণ খেলার পুরো বিষয়টিই আনন্দ-বিনোদনের, যদিও সাংবাদিকতাটা খুব সহজ নয়।

ক্রীড়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: খেলাধুলার ইতিহাস মানবসভ্যতার ইতিহাসের মতোই পুরোনো। নথিপত্র অনুযায়ী আমাদের ৩ হাজার বছর আগে ফিরে যেতে হবে। খেলাধুলার একেবারে শুরুর ইতিহাস মূলত শিকার বা যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতির ইতিহাস। শিকার বা যুদ্ধে যাওয়ার আগে তখন প্রস্তুতির অংশ হিসেবে চলত নানা ধরনের প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণে স্পিয়ার (এক ধরনের বল্লম), স্টেক ও পাথর ছোড়া ছাড়াও নানা ধরনের শারীরিক কসরত হতো। ৭৭৬ খ্রিষ্টপূর্বে প্রাচীন গ্রিসে অলিম্পিকের মাধ্যমে খেলাধুলার আসর শুরু।

ক্রীড়া সাংবাদিকতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ক্রীড়া সাংবাদিকতার ইতিহাস খেলাধুলার ইতিহাসের মতো পুরোনো নয়। আধুনিক ক্রীড়া সাংবাদিকতার সূচনা আমেরিকার হাত ধরে। আমেরিকার সামাজিক ধরন-ধারণ এবং মুনাফা লিপ্সা মোটাদাগে পুরো সাংবাদিকতার অবয়বই বদলে দিয়েছিল। ক্রীড়া সাংবাদিকতা যার মধ্যে একটি। আমেরিকায় ক্রীড়া সাংবাদিকতার শুরু ১৮২০-১৮৩০ এর দিকে। প্রাথমিকভাবে ঘোড়দৌড় এবং বক্সিংয়ের সংবাদ সংবলিত বিশেষায়িত কিছু ক্রীড়া ম্যাগাজিন বের হতো। যেমন, ১৮৭৭ সালে উইলিয়াম পোর্টারের স্পিরিট অব দ্য টাইম সেই রকমই একটি ম্যাগাজিন। এটি বিবিধ বিষয়ের ম্যাগাজিন হলেও ফোকাস ছিল খেলাধুলা। সেই সময় খেলাধুলার সংবাদ সংগ্রহের কাজ চলত বিক্ষিপ্তভাবে এবং বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটকেন্দ্রিক সংবাদ সংগ্রহের প্রবণতা ছিল। শুধুই খেলার সংবাদ– এমন নয়। যেমন, উত্তর বা দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যকার ঘোড়দৌড় অথবা আমেরিকান ও ব্রিটিশ বক্সারদের মধ্যকার বক্সিং প্রতিযোগিতা। উনিশ শতকের শেষদিকে এসে আমেরিকান খেলাধুলার সংবাদের প্রাথমিক মাধ্যম হিসেবে পত্রিকা দাঁড়াতে শুরু করে। উনিশ শতকে আমেরিকার মুদ্রণ সাংবাদিকতার বিবর্তনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সাধিত হয়। একটি হলো ১৮৩০ ও ১৮৪০ সালে পেনি প্রেসের উদ্ভাবন এবং আরেকটি হলো উনিশ শতকের মধ্য থেকে শেষভাগ পর্যন্ত শিল্পবিপ্লব, যার কারণে প্রচুর অভিবাসী ইউরোপ থেকে আমেরিকার বড়ো শহরগুলোয় প্রবেশ করে এবং এটি ছিল হলুদ সাংবাদিকতার কাল। এ দুটি ব্যাপারই পেশাদার ক্রীড়া সাংবাদিকতাকে প্রভাবিত করে। পেনি প্রেসের কারণে প্রকাশকরা জনপ্রিয় আধেয়র ওপর জোর দিতে থাকেন এবং ক্রীড়া ছিল এক্ষেত্রে একদম সঠিক আধেয়। জেমস গরডন বেনেটের নিউইয়র্ক হেরাল্ড ছিল শুরুর দিকের অন্যতম পত্রিকা, যেটি খেলাধুলার সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে। যদিও পরবর্তী সময়ে এর জন্য তিনি একরকম অনুতাপ করেন। উনিশ শতক ধরেই ক্রীড়া সাংবাদিকতার উন্নয়ন অব্যাহত থাকে। ১৮৫০-১৮৬০ সালের দিকে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত দ্য ক্লিপারের লেখক হেনরি শ্যাডউইককে ধরা হয় আমেরিকার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়ালেখক হিসেবে। টেকনোলজিক্যাল নতুন নতুন আবিষ্কার এবং সেই সঙ্গে নগরায়ণের ফলে সংবাদ সংগ্রহ ও মুদ্রণের খরচ কমে যায়। পত্রিকার সার্কুলেশন হয় আকাশচুম্বী। এ সময় পত্রিকাগুলোয় ক্রীড়া সংবাদ বিস্তার লাভ করে। ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত জোসেফ পুলিৎজারের দ্য নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড হলো আমেরিকার প্রথম পত্রিকা, যার সংবাদ সংগ্রহের জন্য নিজস্ব ক্রীড়া বিভাগ ছিল। ১৮৯৫ সালে উইলিয়াম রেন্ডলফ হার্টজ প্রকাশ করেন নিউইয়র্ক জার্নাল, যার প্রথম আলাদা ক্রীড়া শাখা ছিল এবং খেলাধুলার সংবাদের জন্য আলাদা পাতা ছিল। রবার্ট ডাব্লিউ ম্যাকচেসনি ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত মিডিয়া স্পোর্টস অ্যান্ড সোসাইটি গ্রন্থের ৫৩ নম্বর পেজে বলেন, 'হলুদ সাংবাদিকতা যুগে খেলাধুলার সংবাদ পাঠককে আকর্ষণ করে, এটা প্রমাণিত হওয়ার পর ক্রীড়া সাংবাদিকতার ওপর গুরুত্বারোপটা যৌক্তিকও হয়ে উঠে।'

ক্রীড়া সাংবাদিকতার গুরুত্ব: ক্রীড়া সাংবাদিকতার গুরুত্ব সম্পর্কে বলার আগে নেলসন ম্যান্ডেলার একটি উক্তি উল্লেখ করতে চাই। তিনি বলেন, 'Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite in a way that little else does. It speaks to you in a language they understand. Sports can create hope where once was there was only despair.'

খেলাধুলা আসলেই বদলে দিতে পারে বিশ্ব, বিশ্বের অর্থনীতি। বাড়িয়ে দিতে পারে মানুষে মানুষে, দেশে দেশে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি। কফিশপে বসলে শোনা যায়, কফির মগ হাতে অফিসফেরত মানুষ শচীন আর ব্রায়ান লারাকে নিয়ে তুমুল বিতর্ক, যে বিতর্ক শেষ হয় না কখনো; কিন্তু শেষ হয়ে যায় মগের পর মগ কফি। হিঙ্গিস না শারাপোভা, নাকি সানিয়া মির্জা– কে বেশি সুন্দরী, এ নিয়ে চলতি বাসে চলে বিদ্যাপীঠগামী ছেলেদের মধুর ঝগড়া। লুকাকো না মরডিচ, কে বেশি নান্দনিক– এ নিয়ে এখনও চলছে জোর তর্ক। রাস্তায় চলতে এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে বলছে, 'দোস্ত উসাইন বোল্ট কি মানুষ না দানব!' খেলাধুলা হলো বিশুদ্ধ বিনোদন, সেই বিনোদনে কেউ প্রিয় দলের জয়ের সংবাদ পড়ে খুশি হয়, কেউ প্রিয় খেলোয়াড়ের বিয়ের সংবাদে কষ্ট পায়, কেউ প্রিয় তারকার নানা চ্যারিটি সংবাদ পড়ে আনন্দ পান। খেলাধুলার একেকটা বড়ো ইভেন্টকে ঘিরে একটি দেশের অর্থনীতিতে যখন প্রভাব পড়ে, শেয়ার মার্কেটে দ্রুত উঠতে থাকে কোনো কোনো কোম্পানির শেয়ারের মূল্য। কোনো দেশের একজন খেটে খাওয়া মানুষ যখন পাশের লোকটির কাছে জানতে চান বিশ্বকাপ ফুটবলের পরের আসর কোথায় বসবে, তখন ক্রীড়া সাংবাদিকতা প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায় বৈকি।

ক্রীড়া সাংবাদিকের গুণাবলি

মোটাদাগে সব সাংবাদিকেরই কিছু সাধারণ গুণ থাকতে হয়। গুণের কথা বলার আগে শিক্ষাগত যোগ্যতার কথাটা বলে নেওয়া দরকার। শুধু যদি বাংলাদেশের কথা বলি তাহলে বলতে হয়, একসময় কম লেখাপড়া জানা, যে কোনো বিভাগ থেকে পাস করা একজন সাংবাদিকতায় আসতেন বা আসতে পারতেন। এখনও আসছেন না তা নয়, তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার চাহিদা ও হার বেড়ে যাওয়ায় এখন ননডিসিপ্লিনারি সাংবাদিকের সংখ্যা কিছুটা কমেছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাংবাদিকতার ডিগ্রি দিচ্ছে এবং সার্কুলার দিয়ে সাংবাদিকতার ডিগ্রি সংবলিত মানুষকেই সাংবাদিক হিসেবে নেওয়া হচ্ছে। তাই ক্রীড়া সাংবাদিক হতে গেলে সাংবাদিকতার ওপর মিনিমাম গ্র্যাজুয়েশন থাকা জরুরি। একজন ক্রীড়া সাংবাদিকের শারীরিকভাবে সুস্থ-সবল থাকাটাও তার এক ধরণের যোগ্যতা।

একজন ক্রীড়া সাংবাদিকের গুণাবলিকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন

- মেধা ও মননভিত্তিক গুণাবলি
- শারীরিক গুণাবলি
- মানবিক গুণাবলি

মেধা ও মননভিত্তিক গুণগুলো নিম্নরূপ

আসক্তি: একজন ভালো ক্রীড়া প্রতিবেদক তখনই হতে পারবেন, যখন তিনি খেলাধুলার প্রতি আসক্ত থাকবেন। যখন খেলা দেখাটা, খেলাধুলার খবর রাখাটা কারো কাছে নেশার মতো হয়ে যাবে। তাই আসক্তিটাই হলো প্রথম গুণ। আসক্তিকে সরাসরি কোনো গুণ না বলে একজন সাংবাদিকের বৈশিষ্ট্যও বলা চলে, যার ওপর অন্য সব গুণ নির্ভরশীল।

যোগাযোগ দক্ষতা: একজন ক্রীড়া সাংবাদিককে যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ হওয়া জরুরি। আর তাই ভাষার দখল থাকা, ভালো বলতে পারা জরুরি। কারণ তাকে লিখে, বলে দর্শক-শ্রোতা এবং পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। ভিন্ন ভাষাভাষী খেলোয়াড়, সংগঠক, ভক্তদের সঙ্গে একজন প্রতিবেদককে উঠবস করতে হয়, সংবাদের স্বার্থে একসঙ্গে চলতে হয়, কথা বলতে হয় আর তাই এদের প্রত্যেকের সঙ্গে যোগাযোগের সঠিক পদ্ধতি একজন ক্রীড়া প্রতিবেদককে জানতে হবে। বাচনিক-অবাচনিক দুই ধরনের যোগাযোগেই তাকে দক্ষ হতে হবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের যখন নানা প্রতিযোগিতা হয়, সেটাও সাংবাদিককে কাভার করতে হয়। সেক্ষেত্রে অবাচনিক বা নন-ভারবাল কমিউনিকেশনে ন্যূনতম দখল থাকলে তার নিজের জন্যই সুবিধা হয়। একজন প্রতিবেদক যোগাযোগে ভালো মানেই বুঝতে হবে তার লেখায় দখল আছে, ভাষায় দখল আছে, তিনি ভালো বলতে পারেন এবং তিনি সৃষ্টিশীল। তিনি যোগাযোগে ভালো মানে তার পাঠক কী চাচ্ছে বা তার কাছে আসা একটা তথ্যের ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেন।

বিশ্লেষণ ক্ষমতা

একজন ফুটবলপ্রেমীর কাছে সবসময় এর ব্যাখ্যা না-ও থাকতে পারে; কিন্তু একজন ক্রীড়া সাংবাদিকের কাছে এর উত্তর আছে। একটা ম্যাচে কেনো অনাকাঙ্ক্ষিত ফল হলে তার উত্তর একজন ক্রীড়া সাংবাদিককেই দিতে হয় ভক্তদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। আর এটা সম্ভব ম্যাচটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুচারুরূপে বিশ্লেষণের মাধ্যমে। আর এ বিশ্লেষণটা করতে একজন ক্রীড়া সাংবাদিককে জানতে হবে।

ভাষার দখল: একজন ক্রীড়া প্রতিবেদকের অপরিহার্য গুণ এটি। সবার আগে থাকতে হবে নিজের মাতৃভাষার ওপর দখল এবং পরে আন্তর্জাতিক ভাষা। প্রয়োজনে আরো দু-একটা প্রচলিত ও প্রয়োজনীয় ভাষার ওপর মিনিমাম দখল রাখতে হবে। বিদেশবিভুঁই খেলা কাভার করতে সেই ভাষা কাজে দেয় অনেকাংশেই। একটা দেশে অনেক ধরনের আঞ্চলিক ভাষা থাকে। সেই ভাষাগুলোও কমবেশি জানা থাকলে প্রতিবেদকের সুবিধা। তাতে কোনো অঞ্চলে খেলা কাভার করতে বা অন্য কোনো সংবাদের নিমিত্তে গেলে, তখন তাদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে পারলে তথ্য সংগ্রহের কাজ সহজ হবে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা তা হলো, ভাষার ওপর যত দখল থাকবে, প্রতিবেদন তত ভালো আর প্রাঞ্জল হবে।

সৃজনশীলতা

একটা বিশেষ কোনো বিষয়ে পাঠক আগ্রহ পেলে সে সেই বিষয়ের আরো অন্যান্য সংবাদ খুঁজতে থাকে। সেই বিষয়ের নানা এঙ্গেল তারা খুঁজতে থাকে। সেই বিষয়টি নিয়ে যে প্রতিযোগিতা ও বিতর্কের স্ফুলিঙ্গ ছুটে, তা পাঠক খুব উপভোগ করে। তাই পাঠকের জন্য সংবাদের এঙ্গেল বের করে সেটাকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, যাতে পাঠক পড়ে আনন্দ পায় এবং একই সঙ্গে সত্যিটাও অটুট থাকে।

মাল্টি টাস্কিং

টেকনোলজির বদৌলতে আমরা এখন ২৪ ঘণ্টা সংবাদ চক্রের মধ্যেই বাস করি। আর একজন ভালো ক্রীড়া সাংবাদিককে এখনকার দিনে মাল্টি টাস্কিং জানতে হয়। যেমন, খেলা কাভার করার সময় একই সঙ্গে টুইটিং বা ফেসবুকিং করার মাধ্যমে ম্যাচ সামারি খানিকটা বলে দেওয়া অথবা খেলাধুলার ব্লগে লিখতে থাকা, যেটা মূলত পরে প্রতিবেদকের নিজেরই কাজে আসে। আজকাল সবার হাতে স্মার্টফোন আছে। এটির ব্যবহার জানতে হবে। তাহলে দেখা যাবে, একই সঙ্গে খেলা কাভার বা কোনো প্রেস কনফারেন্স কাভার করা যাচ্ছে আবার প্রয়োজনে কিছু ছবিও তোলা যাচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অফিস ইমেইলে পাঠিয়ে দেওয়া যাচ্ছে অনলাইন ভার্সনের জন্য। তাই মাল্টি টাস্কার হয়ে উঠতে পারাটা খুব জরুরি।

ক্রীড়া বাণিজ্যের জ্ঞান: খেলাধুলার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সংস্থা বা ফেডারেশন অন্য যে কোনো ব্যবসার মতোই চলে। আর তাই ক্রীড়া কীভাবে ব্যবসা হিসেবে কাজ করে, এই সাধারণ জ্ঞানটুকু একজন ক্রীড়া প্রতিবেদকের থাকতে হবে। খেলাধুলায় অর্থনীতি, বাজারজাতকরণ, জনসংযোগ-যোগাযোগ, বিক্রয়, আইন, স্বত্বাধিকার এবং অন্য আরো কিছু বিষয় আছে। একজন প্রতিবেদক এর যে কোনো একটা নিয়েও লিখতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, সাময়িকভাবে যখন কোনো দলকে কোনো লিগ থেকে বাদ দেওয়া হয়, তখন সেই বাদ পড়াটা আইনগতভাবে কী রকম প্রভাব ফেলে সেই দলের ওপর এবং একই সঙ্গে ওই দলের বাদ পড়া কীভাবে বিক্রয়, জনসংযোগ এবং লিগ ব্যবসার অন্যান্য খাতে প্রভাব ফেলে, সেটাও দেখতে হবে।

শারীরিক ও মানসিক গুণাবলি

খাপ খাইয়ে নিতে পারার ক্ষমতা: ক্রীড়া সাংবাদিকদের মতো এত বেশি খাপ খাইয়ে মনে হয় আর কাউকে নিতে হয় না। যখন বিভিন্ন দেশে তারা খেলা কাভার করতে জান, তখন খাবার, সময়, আবহাওয়া, ভাষা– এমনকি মানুষের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হয় ক্রীড়া সাংবাদিকদের। একজন প্রতিবেদক যে সময় বাংলাদেশে রাতে ঘুমাতে যান, দেখা যায় একই সময়ে অন্য দেশে তাকে প্রেস বক্সে বসে খেলা কাভার করতে হচ্ছে। কারণ সেখানে তখন খটখটে দুপুর। তিনবেলা ভাত খান যে সাংবাদিক, তাকে হয়তো টানা তিন দিন শুধু বার্গার খেয়ে থাকতে হচ্ছে। আর এসব পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়েই চলতে হয়। এমনও হয়, কাজের চাপে টানা কয়েক দিন গোসল করারও সুযোগ হয় না; কিন্তু তারপরও সমন্বয় করতে হয়।

পরিশ্রমী, সাহসী, সৎ এবং আত্মবিশ্বাসী: শুধু ক্রীড়া সাংবাদিকের নয়, যে কোনো সাংবাদিকেরই এগুলো প্রাথমিক এবং অপরিহার্য গুণ। একজন প্রতিবেদক যদি পরিশ্রমী না হন, তাহলে রাত ৩টায় ঘুম থেকে উঠে তিনি বিমানবন্দরে যেতে পারবেন না টুর্নামেন্ট খেলতে আসা দলের ওপর প্রতিবেদন লিখতে। যদি তিনি আত্মবিশ্বাসী না হন, তাহলে কোনো খেলোয়াড়কে প্রশ্নে জর্জরিত করতে পারবেন না। সৎ না হলে সঠিক তথ্য তার প্রতিবেদনে তুলে ধরতে পারবেন না এবং কাজে ফাঁকি দেবেন।

সহানুভূতি: খেলোয়াড়, কোচরাও রিপোর্টারদের মতোই সাধারণ মানুষ। একটা ম্যাচ চলাকালীন যে কোনো খেলোয়াড়ের আত্মীয় বিয়োগ হতে পারে, কেউ ব্যক্তিগত নানা কারণে 'ডিস্টার্বড' থাকতে পারেন, কারো সঙ্গে অপ্রীতিকর কিছু ঘটতে পারে। এই ব্যাপারগুলো মাথায় রেখে প্রতিবেদকের উচিত হবে তাদের কোনো বিষয়ে খুব বেশি বিরক্ত না করা বা কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য না করা।

নিরপেক্ষতা: যিনি ক্রীড়া প্রতিবেদক, তিনি রক্ত-মাংস, আবেগ-অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ। তিনিও কোনো না কোনো দলের সমর্থক। কিন্তু প্রতিবেদন লেখার সময় তাকে সেটা ভুলে থাকতে হবে। নয়তো নিজের দলের পক্ষে দু-চারটা ভালো কথা লিখে ফেলা অস্বাভাবিক কিছু নয় আর এটা সাংবাদিকের নীতিবিরুদ্ধ। এমনকি নিজের দেশের পক্ষে উল্লাস করাটাও অশোভন। মনে পড়ে, আমি তখন ক্রিকেটের প্রেস বক্সে নতুন। বাংলাদেশের খেলা চলছিল। প্রতিপক্ষের কথা মনে নেই তখন। সাকিব আল হাসান ছক্কা হাঁকানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি একজন ভক্তের মতো উল্লাস করে ফেলেছিলাম। প্রেস বক্সে অন্য দেশের সাংবাদিকও ছিলেন। আমার আচরণটা অবশ্যই একজন সাংবাদিকের আচরণ ছিল না আর সেই সঙ্গে পক্ষপাতদুষ্ট তো বটেই। তাই নিরপেক্ষতা একটা বড়ো গুণ, যেটা ধরে রাখা খুব কঠিন হয়ে পড়ে; কিন্তু ধরে রাখতে হয়।

ব্যক্তিত্ব: এটি একাধারে শারীরিক, মেধাভিত্তিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিত্ব মানে গম্ভীরভাবে, পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকা, কারো সঙ্গে কথা না বলা নয়, হাসি-মুখে অনেক কথা বলেও ব্যক্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব যদি কাজের কমিটমেন্টের জায়গাটা ঠিক থাকে। কারো সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য যখন তার কাছ থেকে সময় নেওয়া হয়, সেই সময়টা মেনটেইন করা, কোনো সহকর্মীকে কোনো কাজের কথা দিলে সেই কাজটা ঠিকঠাক করে দেওয়া, অফিসে সময়ের কাজটা সময়ে জমা দেওয়া, সবার সঙ্গে সৌহার্দ বজায় রাখা, অফিস ডেকোরাম মেনে চলা, পরচর্চা, পরনিন্দা থেকে দূরে থাকা– এসবই ব্যক্তিত্বের উপাদান। ছোটো করে পোশাকের কথা বলি। সাংবাদিকরা সবসময়ই ব্যস্ত। সংবাদের খোঁজে যখন-তখন দৌড়াতে হয়। তাই পোশাকের প্রতি নজর দেয়ার খুব একটা সময় তারা পান না। কিন্তু কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে ছেঁড়া ময়লা পাঞ্জাবি পরে সংবাদ সংগ্রহের দিনও এখন আর নেই। এখন সাংবাদিকরা পোশাকের ব্যাপারে অনেক সচেতন। টিভি প্রতিবেদকদের জন্য তো ভালো পোশাক বাধ্যতামূলক। অনেক টিভি সাংবাদিক সঙ্গে ব্যাগের মধ্যে অতিরিক্ত পোশাক রাখেন। ক্রীড়া সাংবাদিকদের কিছুটা সুযোগ আছে পোশাকে একটু সচেতন থাকার, কারণ এখানে প্রায় সবই শিডিউলড। সচেতন মানে তাকে রোজ পাটভাঙা পোশাক পরতে হবে তা নয়। নোংরা পোশাক পরে প্রেস কনফারেন্স কাভার করতে চলে এসেছে, এমন অনেককেই আমি চিনি। তাকে রোজ পাটভাঙা পোশাক পরতে হবে না; কিন্তু আবার নোংরা পোশাক পরেও আসা যাবে না। মনে রাখতে হবে, পোশাক অবশ্যই ব্যক্তিত্বের অনেক বড়ো অংশ।

একটা কথা, যারা খেলাধুলার প্রতি আসক্ত থাকেন, তারা খেলাধুলা অবশ্যই বোঝেন, বুঝেই ভালোবাসেন, বুঝেই ক্রীড়া সাংবাদিকতায় আসেন।

ক্রীড়া সাংবাদিকের তথ্যের উৎস: নামিদামি ক্রীড়া সাংবাদিক যারা, তাদের নামি সাংবাদিক হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট, যা তৈরিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা সংবাদ উৎসের। সংবাদের বেশ ভালো বা শক্ত উৎস (source) থাকতে হবে। সব ক্রীড়া প্রতিবেদকেরই সবচেয়ে শক্তিশালী উৎস হলো একজন বলবয় থেকে শুরু করে ক্রীড়ামন্ত্রী পর্যন্ত সবাই। এমনকি স্টেডিয়াম মার্কেটে যে খেলাধুলার সামগ্রী বিক্রি করে, সেও একজন ভালো উৎস হতে পারে। যাদের সংবাদ কাভার করতে হবে, তাদের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। শুধু ইমেইল বা মোবাইল ফোনে মেসেজ পাঠিয়ে এই পরিচিতি শেষ করলে হবে না। প্রয়োজনে দেখা করতে হবে। দেখা করাটা হতে হবে কাজের বাইরে। দেখা করতে যাওয়ার পর কাজের কোনো কথা বলা যাবে না। কোনো ধরনের কাগজ-কলম বা ক্যামেরা নিয়ে দেখা করতে যাওয়া যাবে না। শুধুই হ্যালো বলার জন্য, কুশল জানার জন্য দেখা করতে যেতে হবে। এভাবেই ধীরে ধীরে সম্পর্কটা জোরদার করতে হবে। সেই ব্যক্তির সঙ্গে নানা সময় চাইলেই কথা বলা বা দেখা করা যায়। দুজনের এমন কিছু 'কমন গ্রাউন্ড' খুঁজে বের করতে হবে। এতে যেটা হবে, ভবিষ্যতে কোনো একটা তথ্যের জন্য ফোন দিলে সে এটা ভাববে না যে উড়ে এসে জুড়ে বসা কেউ। মূল তথ্যটা তো বটেই, প্রয়োজনে তার কাছ থেকে আরো বেশি তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

ক্রীড়া প্রতিবেদন লেখার ধরন: প্রতিবেদন লেখার পুরো প্রক্রিয়াটিকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। তিন ভাগে ভাগ করতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। আমার কাছে মনে হয়, যদি তিন ভাগে ভাগ করে নেয়া যায় তাহলে লেখা অনেক সহজ হয়।

প্রস্তুতি পর্ব: প্রস্তুতি নির্ভর করে মুদ্রণ, সম্প্রচার বা অনলাইন– কোন মাধ্যমের জন্য সংবাদ সংগ্রহ করা হবে তার ওপর। মিডিয়া বুঝে পূর্ণ সেটআপ আগে থেকে ঠিক করে রাখতে হবে। খেলার দিন ভেন্যুতে পৌঁছার আগে সবকিছু আরেকবার চেক করে নিতে হবে, সব ঠিকঠাক আছে কি না এবং পর্যাপ্ত আছে কি না, সেই কাজটা করবেন প্রতিবেদক নিজে। একই সঙ্গে ব্যক্তিগত যেসব প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন, তা থাকতে হবে। এক্ষেত্রে নিজের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমি যখন ক্রীড়া প্রতিবেদক হলাম, মা বললেন শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ পরে তো আর সাংবাদিকতার কাজ করতে পারবি না, বরং প্যান্ট-শার্ট পর, কদিন পর না হয় একটা মোটরসাইকেল কিনে নিলি। মহিলা সাংবাদিকরা আজকাল বাইক চালাচ্ছেন; মা বেঁচে নেই। থাকলে দেখে খুব খুশি হতেন। আমার স্বল্প শিক্ষিত মা এটা বুঝেছিলেন যে প্রয়োজনে যদি তার মেয়েকে দৌড় দিতে হয়, সেটা শাড়ি পরে কঠিন হবে। তার চেয়ে প্যান্ট-শার্ট অনেক স্বচ্ছন্দ। আমি পোশাকের কথাটা এ জন্যই বললাম। লিঙ্গভেদে পোশাকের প্রস্তুতিরও একটা বিষয় আছে। আর দল নিয়ে লেখাপড়া, গবেষণা সেটা একটা চলমান প্রক্রিয়া– সব অবস্থাতেই চলতে থাকবে।

একজন প্রতিবেদককে এ বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে যে, তিনি প্রতিবেদন লিখছেন সেই কোটি ভক্তের জন্য যারা গ্যালারিতে বসে খেলা দেখেননি, সেই ভক্তের জন্য টিভিতে খেলা দেখার সুযোগও যার হয়নি। টিভিতে যারা খেলা দেখেছেন বা গ্যালারিতে বসে যারা দেখেছেন, তাদের পক্ষেও একটি ম্যাচের অনেক ছোট ছোট ডিটেইল জানা সম্ভব হয় না, যদি না একজন প্রতিবেদক সেটা তার লেখায় তুলে ধরেন।

আর সেজন্যই একজন প্রতিবেদককে একটা ম্যাচ প্রেস বক্সে বসে খুব মন দিয়ে ধৈর্যের সঙ্গে দেখতে হয় যাতে কোনো একটা তথ্যও ছুটে না যায় কারণ সেই ছোট তথ্যটার জন্য একজন ভক্ত অপেক্ষা করে। আরো একটা বিষয় হলো, আপনি কী খেলা দেখছেন ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, হ্যান্ডবল, কাবাডি নাকি সাঁতার বা রিলে রেস। খেলার দৈর্ঘ্যের এর ওপর নির্ভর করবে আপনার দেখার মানসিক প্রস্তুতি ও শক্তির। ৯০ মিনিটের ফুটবল ম্যাচ দেখার জন্য একভাবে আবার ৫০ ওভারের ওয়ান ডে ক্রিকেট ম্যাচ দেখার জন্য একজন অ্যাসাইনড রিপোর্টারকে অন্যভাবে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে আর সেই প্রস্তুতিটাই একটা ম্যাচ দেখাকে আনন্দময় করে তুলবে, করে তুলবে সূক্ষ্ম ও সাবলীল। বড়ো ইভেন্টের সময় দেখা যায়, শুধু ম্যাচই নয়, অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকে। সেক্ষেত্রে ম্যাচ কাভার করে একজন আর আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় কাভার করে অন্যজন, সাধারণত বিষয়টি নির্ভর করে একটি হাউসের ওপর। তবে যে ম্যাচ রিপোর্ট লেখবে, পূর্ণ মনোনিবেশের সঙ্গে ম্যাচটা দেখা উচিত, মূল জায়গা ওটাই। একটা ম্যাচ খুব মনোযোগ দিয়ে দেখার পরও যদি কিছু তথ্য ছুটে গেছে বলে মনে হয়, তাহলে প্রেস বক্সের অন্যান্য সাংবাদিক সহকর্মীদের সাহায্য নিতে হবে।

প্রতিবেদন লেখা পর্ব: এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়ার পর মন দিয়ে খেলা দেখে এলেন প্রেস বক্সে বসে; কিন্তু ঠিকঠাক লিখতে পারলেন না কিছুই, তাহলে সবই পণ্ডশ্রম। একটি প্রতিবেদন লেখারও কিছু ধাপ আছে, যেগুলো ফলো করতে হবে। বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু করলে সময় বাঁচবে এবং লেখাও ভালো হবে। এই লেখা পর্বটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিলে লেখা সহজ হয়। ভাগগুলো নিম্নরূপ:

* গবেষণা করতে হবে
* তথ্য-উপাত্ত গুছিয়ে বসতে হবে
* লেখার পরিকল্পনা করতে হবে
* লেখতে হবে
* পড়তে হবে
* আবার লিখতে হবে

১। গবেষণা করতে হবে: গবেষণা মানে এ নয় যে গাদা গাদা বই পড়ে দিনরাত এক করে দিতে হবে। যে দুদলের খেলা দেখে এলেন, সেই দুদলের খেলোয়াড়দের সম্পর্কে জানতে হবে আর যারা ভালো করেছেন বা জয়ে অবদান রেখেছেন বা নতুন কোনো মাইলফলক স্পর্শ করেছেন, তার সম্পর্কে বিশদ অবশ্যই জানতে হবে। দল দুটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে। প্রথম দিন খেলতে নেমেই যে খেলোয়াড়টা একেবারে সবার মন জয় করে নিল, তার সম্পর্কে তো বটেই প্রয়োজনে তার ঠিকুজি গোষ্ঠীও জানতে হবে। দুই দলে পূর্ববর্তী জয়-পরাজয়ের পরিসংখ্যান জানতে হবে। সব খেলার ব্যাপারেই এই গবেষণা প্রক্রিয়া সমান গুরুত্বপূর্ণ।

২। তথ্য-উপাত্ত গুছিয়ে বসতে হবে: প্রতিবেদক যখন প্রতিবেদন লিখতে বসবেন, তখন পরিসংখ্যানগুলো নোট করে গুছিয়ে নিয়ে বসতে হবে। কারণ পরিসংখ্যান যে কোনো প্রতিবেদনকেই খুব সমৃদ্ধ করে, ক্রীড়া প্রতিবেদনের কথা বলাই বাহুল্য। প্রতিবেদক প্রেস বক্সে বসে যে নোট নিয়ে থাকেন, খেলা শেষে ফেরার পথে যদি দু-একজন সমর্থকের কথা বলে থাকেন বা কোনো একজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে কথা বলে থাকেন, সেই নোটগুলো সঙ্গে নিয়ে বসতে হবে।

৩। লেখার পরিকল্পনা করতে হবে: গবেষণা এবং পরিসংখ্যান সংগ্রহের পর এবার পরিকল্পনা করতে হবে লেখার। সেক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবেদক বা স্পোর্টসের যিনি প্রধান, তার পরামর্শ নিতে হবে। খেলার গুরুত্ব ও রেজাল্টের ওপর ভিত্তি করে সেটা কোন পাতায় যাবে, তা-ও জেনে নিতে হবে। কারণ তার ওপর ভিত্তি করবে প্রতিবেদনের আকার। প্রতিবেদককে ঠিক করতে হবে সে এটি সাদামাটা ভাষায় লিখবে, না জটিল ভাষায়। যোগাযোগ বিশারদ রিচারড ওয়াই ডিকের মতে, সাদামাটা ভাষা হলো, 'clear, concise and correct communication.' সাদামাটা ভাষা পরিভাষা এড়িয়ে চলে এবং সরল কিন্তু কার্যকরীভাবে বক্তব্য তুলে ধরে।'

৪। লিখতে হবে: লেখার সময় নিচের বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে:

- ভাষা অবশ্যই সহজসরল হতে হবে; পরিভাষা এড়িয়ে চলতে হবে।
- প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করতে হবে, লম্বা বাক্য এড়িয়ে চলতে হবে।
- উল্টো পিরামিড কাঠামোতে লিখতে হবে
- প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে হাউসের কোনো আলাদা স্টাইল থাকলে (বানানে বিশেষ করে) সেটা মেনে চলতে হবে।
- গবেষণা করে যে তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যাবে, সেগুলো প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে হবে।
- হার্ড রিপোর্টের ক্ষেত্রে 'গতকাল' দিয়ে বাক্য শুরু করা এড়িয়ে চলতে হবে।
- লেখার সময় পাঠকের চাহিদার কথা মাথায় রাখতে হবে।
- অল্প কথায় অনেক বেশি তথ্য দিতে হবে। তথ্য দিতে গিয়ে আবার প্রতিবেদনটিকে নীরস করে তোলা যাবে না। লেখায় সৃজনশীলতা বজায় রাখতে হবে।
- মনে রাখতে হবে, বিশাল একটা প্রতিবেদন মানেই খুব ভালো প্রতিবেদন তা নয়। সংক্ষেপ এবং সরল প্রতিবেদনই উত্তম প্রতিবেদন।

৫। পড়তে হবে: লেখা শেষ হয়ে গেলে মন দিয়ে নিজের লেখাটা কয়েকবার পড়তে হবে। এতে ভুলগুলো বের হয়ে আসবে।

আবার লিখতে হবে: ভুলগুলো সব ঠিক করে আবার লিখতে হবে। আবার লিখতে হবে বলতে কোথাও কিছু যোগ করার বা বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হলে সেটা করে নিতে হবে।

একটি কথা আগেই বলা হয়েছে, ক্রীড়া প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে যেটা হার্ড নিউজ, সেটাও সফ্‌ট স্টোরির স্টাইলে লেখা হয় অনেক ক্ষেত্রেই। তাই কোনো কোনো ম্যাচ রিপোর্টে দেখা যায়, অমুক দল তমুক দলকে ১০ রানে হারিয়েছে না বলে এই তথ্যটাই বেশ নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়; যদিও শিরোনামেই ফলটা দেওয়া থাকে।

একজন নবিশ ক্রীড়া প্রতিবেদকের জন্য নিচে স্কোর কার্ডসহ উল্টো পিরামিড কাঠামোয় একটা সাদামাটা ম্যাচ রিপোর্ট উদাহরণসহ দেওয়া হলো:

বাংলাদেশ-শ্রীলংকা টি-২০ আন্তর্জাতিক সিরিজ– প্রথম টি-২০ ভেন্যু জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ দিবা-রাত্রির ম্যাচ (২০ ওভার ম্যাচ)

শ্রীলংকার ইনিংস (২০ ওভার সর্বোচ্চ)		**রান**	**মিনিট**	**বল**	**৪**	**৬**
কে জে পেরেরা	ক্যাচ এনামুল বল সামি	৬৪	৬১	৪৪	৭	১
টি এম দিলশান	বল মাশরাফি	০	৪	৩	০	০
এল ডি চান্ডিমাল	ক্যাচ ফরহাদ বল সাকিব	১৮	২৪	১৫	২	১
কে সি সাঙ্গাকারা	ক্যাচ নাসির বল সাবিক	১১	৭	৬	১	০
এস প্রসন্ন	ক্যাচ নাসির বল আরাফাত	৪	৬	৪	০	০
এডি ম্যাথিউস	রান আউট (মিথুন/মাশরাফি)	১১	২৩	১১	০	০
টিসি পেরেরা	নট আউট	১৯	৩০	১৬	০	০
কে কুলাসেকারা	ক্যাচ শামসুর বল মাশরাফি	৩১	২১	২১	০	০
এস এম সেনানায়েকে	নট আউট	০	১	০	০	০
অতিরিক্ত (লেগ বাই-৭, ওয়াইড- ৩)		১০				
মোট (৭ উইকেট, ২০ ওভার)		১৬৮				

উইকেট পতন: ১-৭ (দিলশান, ০৬ ওভার), ২-৬১ (চান্ডিমাল, ৬.৫ ওভার), ৩-৭৭ (সাঙ্গাকারা, ৮.১ ওভার), ৪-৮৭ (প্রসন্ন, ৯.৫ ওভার), ৫-১১৬ (কেজে পেরেরা, ১৩.৩ ওভার), ৬-১২০ (ম্যাথিউস, ১৪.৩ ওভার), ৭-১৬৪ (কুলাসেকারা, ১৯.৪ ওভার)

বোলিং	**ওভার**	**মেডেন**	**রান**	**উইকেট**	**ইকো**	**০**	**৪**	**৬**	
মাশরাফি	৪	০	৪৩	২	১০.৭৫	৭	৪	২	
সোহাগ গাজী	৩	০	২৯	০	৯.৬৬	৫	৫	০	
রুবেল হোসেন	৪	০	২৭	০	৬.৭৫	১০	২	০	(১ ওয়াইড)
সাকিব আল হাসান	৪	০	২৭	২	৬.৭৫	৫	০	১	
আরাফাত সানি	৩	০	১৭	২	৫.৬৬	৫	০	০	(১ ওয়াইড)
ফরহাদ রেজা	২	০	১৮	০	৯.০০	২	০	১	(১ ওয়াইড)

বাংলাদেশ ইনিংস (টার্গেট ১৬৯ রান)		**রান**	**মিনিট**	**বল**	**৪**	**৬**
তামিম ইকবাল	ক্যাচ ম্যাথিউস বল টিসি পেরেরা	৩০	৩৫	২৫	৬	০
শামসুর রহমান	কট এন্ড বোল্ড মেন্ডিস	২২	২৮	১৫	৪	০
এনামুল হক	কট অ্যান্ড বোল্ড টিসি পেরেরা	৫৮	৬৯	৪৫	৭	০
সাকিব আল হাসান	বল কুলাসেকারা	২৬	২২	১৭	২	১
নাসির হোসেন	ক্যাচ টিসি পেরেরা বল মালিঙ্গা	১৬	১৫	১৩	০	১
মো. মিথুন	ক্যাচ ম্যাথিউস বল কুলাসেকারা	০	২	১	০	০
ফরহাদ রেজা	রান আউট (পেরেরা/সাঙ্গাকারা)	৭	১২	৫	১	০
সোহাগ গাজী	নট আউট	০	৬	০	০	০
অতিরিক্ত (বাই- ১, লেগবাই- ৪, ওয়াইড-১, নো-বল-১)		৭				
মোট (৭ উইকেট, ২০ ওভার)		১৬৬				

উইকেট পতন: ১-৫২ (শামসুর রহমান, ৬.১ ওভার), ২-৬৪ (তামিম ইকবাল, ৭.৬ ওভার), ৩-১০৭ (সাকিব আল হাসন, ১৩.৩ ওভার), ৪-১৩২ (নাসির হুসেন, ১৬.৫ ওভার), ৫-১৩৪ (মো. মিথুন, ১৭.২ ওভার), ৬-১৫৮ (ফরহাদ রেজা, ১৯.৩ ওভার), ৭-১৬৬ (এনামুল হক, ১৯.৬ ওভার)।

বোলিং	**ওভার**	**মেডেন**	**রান**	**উইকেট**	**ইকো**	**০**	**৪**	**৬**	
এস এল মালিঙ্গা	৪	০	৩৪	১	৮.৫	১০	৫	০	(১ নো বল)
ডি এন কুলাসেকারা	৪	০	২৯	২	৭.২৫	১২	৫	০	
এস্ মে সেনানায়েকে	৩	০	২১	০	৭.০০	৯	৩	০	(১ ওয়াইড)
এডব্লিউ মেন্ডিস	৪	০	২৯	১	৭.২৫	৯	৩	১	
টিসি পেরেরা	৪	০	৪২	২	১০.৫	৪	৪	১	
এস প্রসন্ন	১	০	৬	০	৬.০০	১	০	০	

ম্যাচ ডিটেইল

টস- বাংলাদেশ, ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত, শ্রীলংকা ২ ম্যাচ সিরিজে ১-০তে এগিয়ে। টি-২০ অভিষেক- আরাফাত সানি, মো. মিথুন (বাংলাদেশ), প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ- কুশাল পেরেরা (শ্রীলংকা)।

শ্রীলংকার রুদ্ধশ্বাস জয়

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে দিবা-রাত্রির দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি ২০ ম্যাচে গতকাল শ্রীলংকা বাংলাদেশকে দুই রানে হারিয়েছে। ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন কুশাল পেরেরা।

টসে জিতে বাংলাদেশ শ্রীলংকাকে ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায়। দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে পেরেরা ও চন্ডিমালের ৫৪ রানের পার্টনারশিপের ওপর ভর করে শ্রীলংকা ১৬৮ রান করতে সক্ষম হয়। জবাবে ১৬৬ রানে বাংলাদেশের ইনিংস গুটিয়ে যায়। টেল এন্ডার কুলাসেকারার ৩১ রানের ঝড়ো ইনিংস শ্রীলংকাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে। ৪৪ বল খেলে পেরেরা ৬৪ রান করেন, যাতে আছে ৭টি ৪ ও একটি ছক্কা। কুলাসেকারা ২১ বল খেলে একটি চার ও দুটি ছক্কা হাঁকিয়ে করেন ৩১ রান। শ্রীলংকার পক্ষে থিসারা পেরেরা, চান্দিমাল এবং সাঙ্গাকারা যথাক্রমে ১৯, ১৮ ও ১১ রান করেন। বাংলাদেশের পক্ষে চার ওভার খেলে ৪৩ রান দিয়ে মাশরাফি দুই উইকেট নেন। অভিষেক ম্যাচেই দুই উইকেট নেওয়া আরাফাত সানি তিন ওভার খেলে ১৮ রান দিয়ে দুই উইকেট নেন।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশ ৭ উইকেট হারিয়ে ২০ ওভারে ১৬৬ রান করতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশের পক্ষে এনামুল হক ৪৫ বল খেলে সাতটি চারের সাহায্যে ৫৮ এবং তামিম ইকবাল ২৫ বলে ৬টি চারের সাহায্যে ৩০ রান করেন। এছাড়াও বাংলাদেশের পক্ষে শামসুর রহমান, সাকিব আল হাসান এবং নাসির হোসেন যথাক্রমে ২২, ২৬ ও ১৬ রান করেন। শ্রীলংকার পক্ষে নুয়ান কুলাসেকারা ও থিসারা পেরেরা দুটি করে উইকেট নেন। আরাফাত সানি ছাড়াও এই ম্যাচে বাংলাদেশের মোহাম্মদ মিঠুনের টি ২০ অভিষেক হয়।

লক্ষণীয়

বাংলাদেশের বাজারে ক্রিকেটের পসার ভালো, তাই আমি ক্রিকেটের উদাহরণটাই টানলাম। উপরের যে প্রতিবেদনটি সেটি একটি হার্ড রিপোর্ট, যা উল্টো পিরামিড কাঠামোর নিয়ম মেনে লেখা হয়েছে। এটি খুবই সাদামাটা একটি রিপোর্ট। মাঠে না গিয়ে বা টিভিতে না দেখে শুধু স্কোর কার্ড দেখে তৈরি করা হয়েছে। একজন নবিশ রিপোর্টার যে নতুন কাজে যোগদান করেছেন, তার জন্য এ প্রতিবেদনটি একটি সহায়ক প্রতিবেদন। এভাবে লিখতে লিখতে একদিন তিনি এ রিপোর্টটিকেই ভেঙেচুরে আরো মজাদার করে লিখতে শিখবেন। তবে এখানে একটা কিন্তু আছে। একটি প্রতিবেদনকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে শুধু স্কোর কার্ড দেখে বা টিভিতে ম্যাচ দেখে তা সম্ভব হবে না। সেজন্য প্রেস বক্সে বসে সরাসরি ম্যাচটি দেখে প্রতিবেদনটি লিখতে হবে এবং তার সঙ্গে যোগ করতে হবে গবেষণায় পাওয়া অজানা সব তথ্য, যা হয়তো একজন পাঠক জানেন না। স্কোর কার্ড দেখে প্রতিবেদন লিখতে হলে আগে স্কোর কার্ড পড়া শিখতে হবে, যেটা আসলে অল্প কদিনেই একজন শিখে নিতে পারেন। তবে ফুটবলে স্কোর কার্ড দেখে একটা ভালো প্রতিবেদন লেখা তুলনামূলক কঠিন।

ফুটবল ও ক্রিকেটের কিছু অপ্রচলিত পরিভাষা:

ক্রিকেট

বিমার (Beamer) : দুর্ঘটনাক্রমে যে বলটি বাউন্স করে না এবং ব্যাটসম্যানের সমান উচ্চতায় তাকে পাস করে চলে যায়।

বেন্ড ইউর ব্যাক (Bend your back): একটি ফ্লাট (ভোঁতা) পিচ থেকে কিছু সুবিধা পাওয়ার জন্য একজন ফার্স্ট বোলার যে অতিরিক্ত শ্রম দেন, সেটাই বেন্ড ইউর ব্যাক।

বেল্টার (Belter): যে পিচ বোলারদের পক্ষে কম থাকে; কিন্তু ব্যাটসম্যানদের স্বর্গরাজ্য, তাকে বলে বেল্টার।

বানি (Bunny): র‍্যাবিটও বলা হয়ে থাকে, যার সোজাসাপ্টা বাংলা মানে হলো খরগোশ। একটি দলের সেই খেলোয়াড় যিনি ব্যাটিং করতে পারেন না; কিন্তু বিশেষজ্ঞ বোলার বা উইকেরক্ষক হিসেবে থাকেন এবং যিনি ১১ নম্বরেই ব্যাটিং করেন। এটার আরও একটা মানে আছে আর তা হলো, সেই ব্যাটসম্যান যিনি একজন বোলারের বোলিংয়েই আউট হয়ে থাকেন। যেমন, আথারটনকে বলা হয় ম্যাকগ্রার বানি।

জুটার (zooter): স্পিন বলের এক ধরনের বৈচিত্র্য। অস্ট্রেলিয়ান স্পিন বোলার শেন ওয়ার্ন এটি আবিষ্কার করেন।

ইইপস (Yips): এটা একধরনের মানসিক অস্থিতিশীলতা বিশেষ করে গলফার এবং স্পিন বোলারদের। এটা সেই মানসিক অচলাবস্থা, যখন একজন খেলোয়াড় তার খেলার সব মূল নিয়মকানুন ভুলে যায়।

ওয়াক (টু) Walk (to): এর মানে হলো ব্যাটসম্যান নিজেকে নিজের আউট ঘোষণা করা। অর্থাৎ আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করে ব্যাটসম্যান যখন নিজেই মাঠ ছেড়ে ড্রেসিংরুমের দিকে হাঁটতে থাকেন। এক্ষেত্রে ২০০৩ সালের বিশ্বকাপে এডাম গিলক্রিস্টের কথা প্রণিধানযোগ্য। এমন রেকর্ড তার অনেক আছে।

স্যান্ডশো ক্রাশার (sandshoe crusher): এটি ইয়র্কারের আঞ্চলিক শব্দ। একটা পূর্ণ পিচের ডেলিভেরি যেটা ব্যাটসম্যানের বুড়ো আঙুল লক্ষ্য করে ছোড়া হয় এবং ছুঁয়ে যায়।

সিটার (sitter): সবচেয়ে সহজ ক্যাচ, যেটি ফিল্ডার ধরতে পারেন না। একে ডলিও (Dolly) বলা হয়। এসব ক্যাচ মিস করা খুব লজ্জাজনক। কারণ জায়েন্ট স্ক্রিনে বারবার দেখানো হয় কীভাবে ক্যাচটা মিস হলো।

করিডোর অব আন্সারটেনিটি (Corridor of Uncertainty): ধারাভাষ্যকারদের খুব প্রিয় শব্দ এটি। ব্যাটসম্যানের অব স্ট্যাম্পের ঠিক বাইরের জায়গা, যেখানে বল পড়লে ব্যাটসম্যান দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগেন তিনি বলটি খেলবেন কি খেলবেন না।

ফুটবল জাগরণ:

মারাকানা: (Maracana)– ১৯৫০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল হোস্ট করার জন্য নির্মিত ব্রাজিলের মারাকানা স্টেডিয়াম।

ম্যাথেউস: (Matthews)– ফুটবলের একধরনের ডিরেক্ট শট, যেখানে ফুটবলার শট নেওয়ার ভান করে এক ডিরেকশনে কিন্তু হঠাৎই তা পরিবর্তন করে শটটা নেন অন্যদিকে। ব্রিটিশ ফুটবলার স্ট্যানলি ম্যাথেউস এজাতীয় শট বেশি খেলতেন, তাই তার নামানুসারে এ শটের নাম ম্যাথেউস।

মাল্টিবল সিস্টেম: (Multi-ball system)– একটি ফুটবল ম্যাচে একটি বলের জায়গায় যখন অনেক বল ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে বলে মাল্টিবল সিস্টেম। বল মাঠের বাইরে চলে গেলে সেটাকে রিপ্লেস করার জন্য স্টকে রাখা বল ব্যবহার করা হয়, এতে সময় বাঁচে।

এঙ্গলিং: (Angling)– এটা একজন গোলরক্ষকের সেই টেকনিক, যেখানে গোলরক্ষক আক্রমণকারীর খুব কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করে। এতে শট নেওয়ার যে এঙ্গেল, তা ছোট হয়ে আসে।

বানানা কিক: (Banana kick)– ফুটবলের বিশেষ কিক, যেখানে বল কিক খেয়ে কলার মতো বাঁক নেয়।

মেটোডো সিস্টেম: (Metodo system)- ২-৩-২-৩ ফুটবলের ক্লাসিক্যাল ফর্মুলা, যে ফর্মুলায় ইতালি ১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল জিতেছিল।

ওয়ার টাইম ইন্টারন্যাশনাল: (Wartime International)- প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ফুটবলারদের বোঝাতে এ টার্মটি ব্যবহৃত হয়। এ দুই বিশ্বযুদ্ধে কোনো আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়নি।

ওয়েম্বলি উইজার্ডস: (Wembley wizards)- ওয়েম্বলিতে ১৯২৮ সালে ইংল্যান্ডকে ৫-১-এ হারানোর পর স্কটল্যান্ড জাতীয় ফুটবল দলের নাম দেওয়া হয়েছিল ওয়েম্বলি উইজার্ডস।

ট্রিভেলা: (Trivela)– পায়ের পাতার বাইরের অংশ দিয়ে আঘাত করে নেওয়া একধরনের বাঁকানো শট।

পানেকা: (Paneka)- আলতোভাবে গোলরক্ষকের মাথার উপর দিয়ে নেওয়া পেনাল্টি শটের নাম পানেকা। এটিকে পেনাল্টি চিপও বলা হয়। ১৯৭৬ সালে ইউরো-পিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জয়ে দলকে নেতৃত্ব দেয়া চেক খেলোয়াড় এন্টোনিন পানেকার নামে এ শটটির নামকরণ করা হয়।

উপসংহার: আগের দিনের ক্রীড়া সাংবাদিকদের তথ্য পাওয়া যতটা কঠিন ছিল আজকের দিনে ততটা নয়। কিন্তু একটা ভালো প্রতিবেদন তৈরিতে তাদের অনেকেই পিছিয়ে ছিলেন না। আজকের দিনে তথ্য হাতের মুঠোয়। দেখা যায়, প্রতিবেদকের আগে একজন ক্রীড়ানুরাগী ফেসবুক বা টুইটারে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে দিচ্ছে। আর ঠিক এজন্যই এখন ক্রীড়া সাংবাদিকতা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। অনেকে যেমন শখের বশে ক্রীড়া সাংবাদিকতা করতেন, আজ আর তেমনটি নেই। প্রতিবেদকদের মধ্যে এখন পেশাদারিত্ব এসেছে। তবে আরো পেশাদার হওয়ার সুযোগ আছে, যেটা তাদের হাউসগুলোকেই তৈরি করে দিতে হবে।

তথ্যসূত্র

* http://www.espncricinfo.com/ci/content/story/239756.html
* https://www.football-bible.com/soccer-glossary/letterm.html
* https://www.viasport.ca/communications-toolkit/module-4-how-write-engaging-sports-article
* https://www.sportsmediaguy.com/blog/2017/5/9/the-history-of-sports-journalism-part-1-of-3

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, পিআইবি

ক্রীড়া সাংবাদিকতার সেকাল-একাল

সৈয়দ মাজহারুল পারভেজ

> আজকের ক্রীড়া সাংবাদিকতা কেবল ‘থ্যাংকলেস জব’র গণ্ডিতে আটকে নেই। আজ ক্রীড়া সাংবাদিকরা শ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য পারিশ্রমিক পাচ্ছেন। অনেকে গাড়ি, বাসস্থানসহ আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন

ছাপার অক্ষরে প্রথম দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় সতেরো শতকের শেষদিকে। তবে সেটা ভারতবর্ষে নয়, ব্রিটেনে। যদিও তখন সে পত্রিকায় কোনো স্পোর্টস রিপোর্টার ছিল না। তখন বলছি এজন্য, এর অনেক বছর পর এ পদটি সৃষ্টি হয়। ইংরেজরা ভারতবর্ষ শাসন করার সুবাদে দৈনিক পত্রিকার পরিধি ব্রিটেন ছাড়িয়ে সারা পৃথিবী তথা এ উপমহাদেশেও চলে আসে। তবে প্রথমদিকে সেটা ছিল দিল্লি, আগ্রা, মুম্বাই, কলকাতাকেন্দ্রিক। ১৯৪৭’র ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানেও অনেক নতুন দৈনিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সম্পাদনায় কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ‘দৈনিক আজাদ’ পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮ সালের ১৯ অক্টোবর ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। এ সময় আজাদের সম্পাদক ছিলেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ আবুল কালাম সামসুদ্দিন। ১৯৫১ সালে দৈনিক সংবাদ এবং রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও পত্রিকাটির প্রকাশক ইয়ার মোহাম্মদ খানের যৌথ মালিকানায় ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়

'সাপ্তাহিক ইত্তেফাক', যার সম্পাদক ছিলেন তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। ইত্তেফাক প্রথমে সাপ্তাহিক হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও পরে তা দৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

প্রথমদিকে এসব দৈনিক পত্রিকায় আলাদা কোনো খেলার পাতা বা ফুলটাইম কোনো স্পোর্টস রিপোর্টার বা স্পোর্টস এডিটর ছিল না। তবে বাংলাদেশের ক্রীড়ানুরাগী পাঠকের খেলার খবরের প্রতি অতি আগ্রহের কারণে একসময় পত্রিকা মালিকরা ফুলটাইম স্পোর্টস রিপোর্টার নিয়োগ দিতে বাধ্য হন। একসময় যেখানে পুরো এক কলামও খেলার নিউজ ছাপা হতো না, পাঠকপ্রিয়তার কারণে আজ সেখানে প্রতিদিন এক-দুই এমন কী চার পৃষ্ঠাও খেলার খবর ছাপা হচ্ছে। এর সঙ্গে সাপ্তাহিক ফিচার পেজ তো আছেই। ক্রীড়া সাংবাদিকতার সেসব সাতকাহন নিয়েই আজকের আলোচনা।

অনেকদিন আগে, বোধকরি নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে ক্রীড়াজগতে সে সময়ের প্রথিতযশা ক্রীড়া সাংবাদিক কাজী আলম বাবুর একটি লেখা পড়েছিলাম। শিরোনাম ছিল, 'ক্রীড়া সাংবাদিকতা কি শুধুই থ্যাংকলেস জব!' লেখাটি বাবুর তথা তখনকার দিনের ক্রীড়ালেখক-সাংবাদিকদের দুঃখ-কষ্ট, রাগ-ক্ষোভ, পাওয়া-না-পাওয়া, আনন্দ-বেদনার চালচিত্র অনেকখানি ফুটে উঠেছিল। এরপর সময় অনেকটাই গড়িয়ে গেছে। পার হয়ে গেছে তিন দশক। অর্থাৎ ত্রিশটি বছর। বাংলাদেশের ক্রীড়া সাংবাদিকতার অনেক উত্থানপতন হয়েছে। একসময় এনায়েতউল্লাহ খান, আতিকুজ্জামান খান, এ বি এম মূসা, ওয়াহিদুল হক, কামাল লোহানী, মতিউর রহমান চৌধুরীরা ক্রীড়া সাংবাদিকতাকে পেশা বা ফুলটাইম চাকরি হিসেবে গ্রহণ না করলেও এবং কাজী আলম বাবু, ফরহাদ মান্নান টিটো, আরিফ খন্দকার, জাকারিয়া হোসেন, মনিজা রহমান, চিং এষাসহ অনেক প্রতিভাবান ক্রীড়া সাংবাদিক প্রাচুর্যের আশায় সেই যে বিদেশে গেছেন আর ফেরেননি। প্রবাস জীবন শেষে ফজলে রশিদ, শেখ আইনুল হক, আবদুস শুকুর, মাহবুবুল হাসান নীরুরা ফিরেছেন মৃত্যুর বার্তা নিয়ে। সেদিন যে কারণে অনেক ঋদ্ধ-ক্রীড়া সাংবাদিক প্রবাসজীবন বা অন্য পেশাকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, আজ হয়তো অনেক ক্রীড়া সাংবাদিক সেটা করবেন না। কেননা ক্রীড়া সাংবাদিকতার সেদিনের চেহারা আজ অনেকটাই বদলে গেছে। কেবল ক্রীড়া সাংবাদিকতা করে আজ অনেকে বাড়ি-গাড়ি নিয়ে বিলাসবহুল জীবনযাপন করছেন। সে আয়েশি জীবন ছেড়ে অনেকেই অনিশ্চয়তার প্রবাস জীবনের কথা ভাববেন না নিশ্চয়ই!

আজকের ক্রীড়া সাংবাদিকতা কেবল 'থ্যাংকলেস জব'র গণ্ডিতে আটকে নেই। আজ ক্রীড়া সাংবাদিকরা শ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য পারিশ্রমিক পাচ্ছেন। অনেকে গাড়ি, বাসস্থানসহ আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। সেটা ছেড়ে কে অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াবেন! একটা সময় ক্রীড়া সাংবাদিকতা ছিল ঢাকাকেন্দ্রিক। তখন কোনো ক্রীড়া সাংবাদিক খেলা কাভার করতে সিলেট, চট্টগ্রাম, খুলনা বা রাজশাহী যাওয়াকে অনেক বড়ো ব্যাপার বলে মনে করতেন। গেমস কাভার করতে বিদেশ যাওয়া! সেটা তো অনেকে ভাবতেও পারতেন না। অনেক খ্যাতিমান ক্রীড়া সাংবাদিকের জীবনে একবারও বিদেশে খেলা কাভার করতে না যাওয়ার অনেক উদাহরণ আছে। আজ খেলার পরিধি কেবল দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সেটা ছড়িয়ে পড়েছে ক্রীড়াবিশ্বে। আর সে কারণে ক্রীড়া সাংবাদিকরাও আজ ভীষণ ব্যস্ত। আজ দিল্লি তো কাল অস্ট্রেলিয়া অথবা পরশু আমেরিকা।

বাংলাদেশের ক্রীড়া সাংবাদিকতার গোড়ার ইতিহাস অনেকের অজানা। পত্রিকা প্রকাশের প্রথমদিকে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতায় কলকাতাকেন্দ্রিক কিছু বাংলা দৈনিক প্রকাশিত হলেও তাতে খেলার খবর খুব একটা প্রাধান্য পেত না। আগেই বলা হয়েছে, দৈনিক আজাদ ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর, দৈনিক সংবাদ, ইত্তেফাক, ডেইলি মর্নিং নিউজ, ডেইলি অবজারভার এবং পূর্বদেশ, ১৯৬০ সালে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক আজাদীসহ আরো কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হলেও সেখানেও যে খেলার খবর খুব বেশি প্রাধান্য পেত, তা-ও নয়। খুব বড়ো কোন খেলা হলে তার একটা ছোট্ট খবর পত্রিকার এক কোণে এক বা দুই কলামে ঠাঁই পেত। সেটাও করতেন কোন পার্টটাইম স্পোর্টস রিপোর্টার। যতটা জানা যায়, পার্টটাইম স্পোর্টস রিপোর্টারের কাজটা প্রথম যিনি শুরু করেন তিনি 'দৈনিক আজাদ'র চিফ রিপোর্টার সৈয়দ জাফর আলী। তিনি খেলা ভালোবাসতেন বলে নিজ দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে নিজ আগ্রহে এ কাজটি শুরু করেন। তাঁর দেখাদেখি পরবর্তী সময়ে প্রয়াত ঋদ্ধ সাংবাদিক এ বি এম মূসা, আনিসুল মওলাসহ আরো অনেকে খেলার প্রতি ভালোবাসা থেকেই নিজ নিজ কাজের পাশাপাশি পার্টটাইম স্পোর্টস রিপোর্টিংকে বেছে নেন। তারা যে নিয়মিত স্টেডিয়ামে যেতেন তা নয়। বড়ো কোন খেলা থাকলে মাঝেমধ্যে স্টেডিয়ামে ঢুঁ মারতেন, যা খেলার খবর পেতেন. তা-ই লিখে দিতেন। আর পাঠক গোগ্রাসের মতো সেটাই গিলত।

ফলে অল্প সময়ে পত্রিকার মালিকরা বুঝতে পারেন, এ দেশের খেলাপাগল পাঠক আরও বেশি খেলার খবর পড়তে চায়। পাঠক যা চাইবে, পত্রিকা তো সেটাই দেবে। আর তাই আজাদের তৈরি করা পথে হাঁটতে শুরু করে ইত্তেফাক, অবজারভার, মর্নিং নিউজ, পূর্বদেশসহ অন্যসব পত্রিকা। পাঠকের খেলার খবরের প্রতি ভালোবাসা দেখে ডেইলি মর্নিং নিউজ প্রথম একজন ফুলটাইম স্পোর্টস রিপোর্টার নিয়োগ দেয়। সেটা ১৯৫৭ বা '৫৮ সালের দিকে। প্রথম যিনি ফুলটাইম স্পোর্টস রিপোর্টার হিসেবে নিয়োগ পান, তিনি একজন বিদেশি সাংবাদিক 'ডেভিডসন'। যদিও এ নিয়ে দু-একজনের মতপার্থক্য আছে, তবে 'ডেভিডসন'কেই প্রথম ফুলটাইম স্পোর্টস রিপোর্টার ধরা হয়। একই পত্রিকার আনিসুল মওলাকে করা হয় 'স্পোর্টস এডিটর' বা 'হেড অব স্পোর্টস'। মর্নিং নিউজ'র পথ ধরে একে একে অন্য পত্রিকাগুলোও স্পোর্টস রিপোর্টার নিয়োগ দিতে বাধ্য হয়। আর এ কাজটিতে আরও খানিকটা এগিয়ে যায় ডেইলি অবজারভার। তারাও ফুলটাইম স্পোর্টস রিপোর্টার নিয়োগ, খেলার পাতার পরিসর বৃদ্ধি ও ফিচার পাতার প্রতি মনোনিবেশ করে। এ সময়ে কৃতী ক্রীড়া সাংবাদিক ও লেখক ডেভিডসন ছাড়াও আরেক বিদেশি রোজারিও, আতিকুজ্জামান খান, এ বি এম মূসা, বদরুল হুদা চৌধুরী, আবদুল আওয়াল খান, আনিসুল মওলা, মাশির হোসেন, মিজানুর রহমান, এস এ মান্নান লড়ু ওয়াহিদুল হক, রেজাউল হক বাচ্চু (চট্টগ্রাম), বদরুল হুদা চৌধুরী, মিনু খাদেম, আবদুল হামিদ, বদি-উজ-জামান, বিডি মুখার্জি, আতাউল হক মল্লিক, ফজলে রশিদ, এম এ রশিদ, তওফিক আজিজ খান, রউফুল হাসান, মাসুদ আহমেদ রুমী, আজম মাহমুদ, মোহাম্মদ মুসা প্রমুখ ক্রীড়া সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে নিরলস কাজ করে যান। তারা ক্রীড়া সাংবাদিকতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বলা যায়, তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল আজকের ক্রীড়া সাংবাদিকতা।

বাংলা পত্রিকায় ফুলটাইম স্পোর্টস রিপোর্টার নিয়োগ দেওয়া হয় অনেকটা দেরিতেই। ইংরেজি পত্রিকার অনেক পরে। ষাটের দশকে 'দৈনিক পাকিস্তান' (যেটি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'দৈনিক বাংলা'য় রূপান্তরিত হয়) প্রথিতযশা ক্রীড়া সাংবাদিক মুহাম্মদ কামরুজ্জামানকে প্রথম 'ফুলটাইম স্পোর্টস রিপোর্টার' হিসেবে নিয়োগ দেয়। এরপর একে একে অন্য পত্রিকাগুলোও ক্রীড়া সাংবাদিকের গুরুত্ব বুঝতে শুরু করে। একটা পিচঢালা মসৃণ হাইওয়ে দেখে আমরা যেমন ভুলে যাই সেখানে একদিন ধু-ধু মাঠ, সে মাঠে কাদামাটির পথ, তারপর ইট-সুড়কির রাস্তার কথা, তেমনি আজ আমরা অনেকেই এসি রুমে দামি রিভলভিং চেয়ারে বসে আমাদের অগ্রজদের সে অবদানের কথা বলতে গেলে ভুলেই গেছি। তাঁদের সেই ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের ফসল আজকের ক্রীড়া সাংবাদিকতার এই আলোকিত দিন। অথচ আমরা অনেকে অতিসহজে আমাদের অতীতকে ভুলে যাই। ক্রীড়া সাংবাদিকদের আজকের এই অবস্থা সব সময় ছিল না। তখনকার সময়ে অনেকের আবার নিজস্ব টেবিল-চেয়ারও ছিল না। পালা করে বসতে হতো। টেবিলের এক কোণে ভাঙা চেয়ারে বসেও খেলার রিপোর্ট করতে হয়েছে অনেককে। ক্রীড়া সাংবাদিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক শ্রম দিতে হয়েছে তাঁদের। আজ তো দামি চেয়ার-টেবিল, এসি রুম সবই পাচ্ছেন ক্রীড়া সাংবাদিকরা।

এখানে একটা কথা বলা দরকার, অনেকে জানেন আবার অনেকে হয় তো জানেন না; সাংবাদিকতা তথা ক্রীড়া সাংবাদিকতার দুইটি দিক রয়েছে। একটা হচ্ছে– নিজে ক্রীড়া সাংবাদিকতা করা। অর্থাৎ নিজে ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। আরেকটি দিক হচ্ছে– নিজে ক্রীড়া সাংবাদিকতা করার পাশাপাশি ক্রীড়া সাংবাদিকদের প্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ নিজের পেশার পাশাপাশি আরো অনেক ক্রীড়ালেখক-সাংবাদিক সৃষ্টি করা। অনেকেই ক্রীড়ালেখক-সাংবাদিক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং নিজে বড়ো মাপের ক্রীড়ালেখক-সাংবাদিক হয়েছেন। আবার অনেকে নিজ পেশার পাশাপাশি নতুন ক্রীড়ালেখক-সাংবাদিক সৃষ্টিতে বড়ো ভূমিকা পালন করেছেন। এ কাজটি যারা করেছেন বা করে যাচ্ছেন, তার সংখ্যাও খুব বেশি নয়। তাঁদের মধ্যে অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলার স্পোর্টস এডিটর মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, দৈনিক ইকিলাবের পরবর্তী সময়ে দৈনিক আমাদের সময়ের স্পোর্টস এডিটর ও কিংবদন্তি ক্রীড়া ধারাভাষ্যকার প্রয়াত আবদুল হামিদ, সব্যসাচী ক্রীড়া সাংবাদিক ও অনেক পত্রিকার স্পোর্টস এডিটর প্রয়াত আতাউল হক মল্লিক, পাক্ষিক ক্রীড়া জগতের নির্বাহী সম্পাদক প্রয়াত সালমা রফিক, দৈনিক বাংলার বাণীর স্পোর্টস এডিটর ও পাক্ষিক ক্রীড়া জগতের বর্তমান সম্পাদক দুলাল মাহমুদ, পাক্ষিক ক্রীড়ালোকের নির্বাহী সম্পাদক প্রয়াত মাহবুবুল হাসান নীরু, যমুনা টিভির ক্রীড়া সম্পাদক রানা হাসানের নাম না বললেই নয়। তাঁরা ছাড়াও আরো অনেকেই কোনো বিনিময়ের কথা না ভেবেই নীরবে এই কাজটি করে যাচ্ছেন। তাঁদের এই অবদানের কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।

আগে ক্রীড়া সাংবাদিকতার ধারা এক রকম ছিল– প্রিন্ট মিডিয়া। সময় বদলেছে। সময়ের বিবর্তনে ক্রীড়া সাংবাদিকতা এখন তিন ধারায় বিভক্ত– প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং অনলাইন স্পোর্টস মিডিয়া। এ তিন ধারার ক্রীড়া সাংবাদিকতাও তিন রকম। একটাতে তথ্য পাওয়ার জন্য পরের দিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলেও অন্যটায় পরের খবরের সময় পর্যন্ত এবং শেষটাতে অপেক্ষার বালাই নেই। খেলা শেষ হওয়ামাত্র আপলোড করা সংবাদ স্ক্রিনে চলে আসে। ফলে মানুষ এখন তৃতীয় ধারায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এ কারণে পত্রিকার নিউজ বা টিভির খবর অনলাইনে পাওয়া যায়।

আরো একটা কথা বলা দরকার, আগেই বলা হয়েছে যে ডেইলি মর্নিং নিউজ খেলার খবর প্রকাশের অগ্রপথিক হিসেবে গণ্য হয়ে আছে। তারা প্রথম একজন পেশাদার স্পোর্টস রিপোর্টার ও স্পোর্টস এডিটর নিয়োগ দেয়। এছাড়া এ পত্রিকা প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা খেলার খবর ছাপে। এ পত্রিকায়ই প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা খেলার ফিচার পাতা ছাপা হয়। তখন দেশের শীর্ষ ক্রীড়ালেখকরা সে ফিচার পাতায় লিখতে থাকেন। এরপর ডেইলি অবজারভারও এ কাজটি শুরু করে। ইংরেজি পত্রিকা ছাড়াও আজাদ, সংবাদ, ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলাসহ অনেক বাংলা পত্রিকা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ফুল পেজ স্পোর্টস নিউজ ছাপতে শুরু করে। তবে ১৯৯২ সালে দৈনিক 'আজকের কাগজ' প্রকাশিত হওয়ার পর খেলার খবর ভিন্নমাত্রা পায়। প্রিয়বন্ধু এবং এ পত্রিকার স্পোর্টস এডিটর ফরহাদ মান্নান টিটোর নেতৃত্বে একঝাঁক তরুণের খেলার খবরকে সাহিত্যের সংমিশ্রণে সরস পরিবেশনায় ক্রীড়ানুরাগী পাঠক আকৃষ্ট হয়। ফুলপেজ রঙিন এ পাতায় খেলার খবর ছাড়াও দৃষ্টিনন্দন ছবিও পাঠক হৃদয় কাড়ে। টিটোও দেশ ছেড়েছেন, কানাডাপ্রবাসী। তবে টিটোর শুরু করা পথে প্রিন্ট মিডিয়ায় সদর্পে দাপিয়ে চলেছেন প্রথম আলোর ক্রীড়া সম্পাদক উৎপল শুভ্র, জনকণ্ঠের ক্রীড়া সম্পাদক মজিবর রহমান, কালের কণ্ঠের ডেপুটি এডিটর মোস্তফা মামুন, ইলেকট্রনিক স্পোর্টস মিডিয়ার দিলু খন্দকার, শহিদুল আজম ও পরাগ আরমানরা। এখন তো প্রতিদিন দুই বা চার পৃষ্ঠাও খেলার খবর ছাপা হচ্ছে। বলতে গেলে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় টিভিতে খবর দেখা যাচ্ছে। আর অনলাইন পত্রিকায় তো সঙ্গে সঙ্গে আপলোড হচ্ছে। আর ক্রীড়ামোদি পাঠক সেটা লুফেও নিচ্ছে। এভাবেই প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে ক্রীড়া সাংবাদিকতার চালচিত্র। যোগ হচ্ছে নতুন মাত্রা।

লেখক: ক্রীড়া লেখক

ক্রীড়া সাংবাদিকতা বদলাতে হবে রণকৌশল

ড. মাহাবুবুর রহমান

টেলিভিশনে মূল সংবাদের সঙ্গে ক্রীড়া সংবাদ তো থাকছেই, এর বাইরে নিয়মিত আলাদা ক্রীড়াবিষয়ক বুলেটিন প্রচারিত হচ্ছে। পত্রিকাগুলো এক পাতা, দুই পাতা থেকে শুরু করে কখনো এর চেয়েও বেশি জায়গা দিচ্ছে ক্রীড়বিষয়ক সংবাদের জন্য

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে ক্রীড়াবিষয়ক সংবাদ বাংলাদেশের গণমাধ্যমে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করলেও মূলত বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে খেলাধুলা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ফ্রেমে ব্যাপকভাবে জায়গা পেতে শুরু করে। আর হালে তো দিনের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলোর অন্যতম সংবাদ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে ক্রীড়াবিষয়ক সংবাদ। কখনো কখনো ক্রীড়াবিষয়ক সংবাদ লিড নিউজের জায়গাও দখল করে নিচ্ছে। টেলিভিশনে মূল সংবাদের সঙ্গে ক্রীড়া সংবাদ তো থাকছেই, এর বাইরে নিয়মিত আলাদা ক্রীড়াবিষয়ক বুলেটিন প্রচারিত হচ্ছে। পত্রিকাগুলো এক পাতা, দুই পাতা থেকে শুরু করে কখনো এর চেয়েও বেশি জায়গা দিচ্ছে ক্রীড়বিষয়ক সংবাদের জন্য। বিশ্বকাপ ফুটবল চলাকালীন আমাদের গণমাধ্যমগুলোর কাভারেজ পর্যালোচনা করলে এ বক্তব্যের সত্যাসত্য বেরিয়ে আসবে।

নয়া ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার অভাবনীয় বিস্তারের ফলে পাঠক আর প্রতিদিনের সংবাদ চাহিদা পূরণের জন্য কোনো একটি সুনির্দিষ্ট মাধ্যমের জন্য অপেক্ষা করে না। টেলিভিশন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যেই ঈপ্সিত সংবাদ চাহিদা পূরণ হয়ে যায় পাঠকের। সংবাদপত্রের জন্য যা প্রতিনিয়ত একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। পাঠকের জানা ঘটনাকেই পরের দিনের পত্রিকার পাতায় নতুন করে জানাতে হচ্ছে। একই ঘটনাকে আলাদা রূপ ও রসে সিক্ত করে পাঠকের সামনে দিতে হচ্ছে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে। গণমাধ্যমের নানা শাখার ক্রমবর্ধমান বিকাশ ও প্রসারের ফলে পাঠকের তথ্য চাহিদাও বেড়েছে অপরিসীম। ফলে শুধু সাদামাটা সংবাদ দিয়ে আর পাঠকের সেই সংবাদ চাহিদা পূরণ করাটা সম্ভব হয় না। ফলে গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে যেমন কার আগে কে সংবাদ পরিবেশন করবে, সেটা নিয়ে এক ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে পাঠকের এ তথ্য চাহিদা পূরণকল্পে গণমাধ্যমের বিস্তৃতি ও প্রসার উভয়ই বেড়েছে। এরকম বাস্তবতায় রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি খবরের পাশাপাশি ক্রীড়াবিষয়ক সংবাদের কদরও বেড়েছে ব্যাপকভাবে। পাঠক এখন যে কোনো খেলাধুলারই তাৎক্ষণিক আপডেট পেতে চায়, জানতে চায় সর্বশেষ পরিস্থিতি ও ফল। একটা সময় ছিল যখন আজকের খেলার খবর পরের দিনের পত্রিকায় পাওয়া যেত, পাঠক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত কখন দোরগোড়ায় হকার এসে পত্রিকা দিয়ে যাবে, নিভৃত হবে সংবাদ তৃষ্ণা। এখন ইন্টারনেট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কল্যাণে অডিয়েন্স যে কোনো খেলাধুলার তাৎক্ষণিক আপডেট না পেলে চোখ সরিয়ে নেয় অন্য কোনো মিডিয়ায়, যা যে কোনো গণমাধ্যমের কাছে কোনোভাবেই কাম্য নয়।

পরিবর্তিত সময়, পরিবর্তিত ধরন

সংবাদ পরিবেশনের ধরনে এই আমূল পরিবর্তনের ফলে প্রিন্ট মিডিয়ায় ট্র্যাডিশনাল ক্রীড়া সাংবাদিকতার ধরনে এসেছে একটি গভীর ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন। এখন আর শুধু পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে ক্রীড়া সংবাদ তৈরি করলেই হয় না বরং সময় আর দূরত্বের সীমারেখা অতিক্রম করে রিপোর্টে রং ও রূপের পশলা এমনভাবে মেশাতে হয় যেন পাঠক অনুভব করে তারা শুধু একটি প্রতিবেদনই পড়ছে না বরং মাঠে বসেই খেলা উপভোগ করছে। কারণ পরিসংখ্যানিক তথ্য-উপাত্ত আগের দিনই ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কল্যাণে পাঠকের কাছে পৌঁছে গেছে। আর তাই দৃশ্যমান গল্পের বাইরে এসে খেলোয়াড়দের মেধা, মনন, ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনের ওপর সাংবাদিকতার আতশকাচ রেখে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে হয়। পাঠকের আগ্রহের ষোলো আনা পূর্ণ করতে হয় দ্ব্যর্থহীনভাবে। পাঠকের সেই চাহিদা পূরণ করতে পারলেই একটি ক্রীড়া প্রতিবেদন হয়ে ওঠে অনন্য, পাঠকপ্রিয়।

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যাপক বিস্তারের ফলে একটি প্রশ্ন প্রায়ই গণমাধ্যম গবেষকদের মনের আকাশে উঁকি দেয়, যেহেতু আগের দিনের খেলার খবর পাঠক ইতোমধ্যে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বরাতে পেয়ে গেছে, তাহলে পরের দিনের পত্রিকায় এ ঘটনার সংবাদমূল্য কতটুকুই বা থাকে? তাহলে কি প্রিন্ট মিডিয়ায় ক্রীড়া প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফুরাচ্ছে? উত্তরে বলা যায়, মোটেই না। বরং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত খেলার খবর পাঠকের সংবাদ চাহিদাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। পাঠক প্রাপ্ত তথ্যের পেছনের আরও বিস্তারিত খবর জানতে চায়। জানতে চায় খুঁটিনাটি নানা দিক। প্রতিপক্ষের ডি-বক্সে নেইমারের পড়ে যাওয়াটা কি অভিনয় ছিল, না কি ছিল বিধিবহির্ভূত বাধা, পাঠকমনের এ জিজ্ঞাসা শুধু পরের দিনের পত্রিকার বিশ্লেষণই আমাদের সামনে তুলে ধরতে পারে। মাঠের ভেতরের খেলার খবরের পাশাপাশি মাঠের বাইরে খেলোয়াড়দের বক্তব্য, যাপিত জীবন সম্পর্কে একমাত্র প্রিন্ট মিডিয়াই পারে আনুপুঙ্খিক বক্তব্য তুলে ধরতে। আর এখানেই প্রিন্ট মিডিয়ার সম্ভাবনা এখনো অনন্য, অপরিসীম।

পুরোনো ছবি, নতুন ফ্রেম

এ কথা অস্বীকারের কোনো সুযোগ নেই যে, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে পৃথিবীজুড়েই প্রিন্ট মিডিয়া এখন একটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বদৌলতে প্রতিদিন ঘটে যাওয়া ঘটনার সাদামাটা বিবরণ পাঠক তাৎক্ষণিক পেয়ে যায়, ফলে পরের দিনের পত্রিকায় একই ঘটনার চর্বিত চর্বণ পাঠককে আর উদ্বুদ্ধ করে না বরং বিরক্তির উদ্রেক করে। আর এ চ্যালেঞ্জটিই মূলত পাঠকের সামনে খুলে দিয়েছে অবারিত সম্ভাবনার দ্বার। ক্রীড়াবিষয়ক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও এ কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। আর এ কারণেই প্রিন্ট মিডিয়ায় ক্রীড়া প্রতিবেদনের জন্য ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা না করে বরং সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করলে ক্রীড়া প্রতিবেদকের জন্য রিপোর্ট প্রস্তুত করাটা সহজতর হবে। এ কথা ঠিক যে, পাঠক আগের দিনের খেলার পরিসংখ্যান কিংবা ফল ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কল্যাণে জেনে যায়; কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়ার সামনে অবারিত সুযোগ রয়ে যায় ওই দিনের খেলাকে আনুপুঙ্খিক বিশ্লেষণ করে, প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে, একই খেলোয়াড়ের আজকের ও আগের পারফরম্যান্সের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরির। সেটা করা গেলেই আগের দিনের খেলাটি টেলিভিশনের পর্দায় স্বচক্ষে দেখার পরও পাঠক প্রিন্ট মিডিয়ায় একই খেলা নিয়ে প্রকাশিত সংবাদটি মনোযোগ দিয়ে পড়বে। খেলার আদ্যোপান্ত সম্পর্কে এক ধরনের মনোমুগ্ধকর বর্ণনা ও বিশ্লেষণই পারে প্রিন্ট মিডিয়ায় পাঠকের দৃষ্টি নিবদ্ধিত করে গভীর মনোযোগ ধরে রাখতে। একজন খ্যাতিমান ক্রীড়া সাংবাদিকের মতে, 'Sport being a very polarizing area- when it comes to perspective pieces and columns, it really matters to the discerning reader who is saying what; bylines really matter; the identity of a newspaper is defined by the people writing for it, and the writer-publication relationship is stronger with the print medium. So projecting its writers prominently as part of branding is something that could help newspapers creates a distinct identity for them. Information would always be the same on TV/internet and print media. How you treat that information is what matters. How much of additional information could be given by you in your story is what matters.'

প্রিন্ট মিডিয়ায় ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মতো সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়াতে হয় তুলনামূলক কম। এছাড়া বিজ্ঞাপনদাতাদের আগ্রহ কম থাকায় বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদ মূলত ক্রিকেট, ফুটবলের বড়ো আসর, একটু আধটু টেনিস ছাড়া অন্য খেলাগুলোর ওপর সংবাদ পরিবেশন করে না বললেই চলে। আর এ সুযোগটিকেই কাজে লাগাতে পারে প্রিন্ট মিডিয়া। প্রিন্ট মিডিয়ার ক্রীড়া সাংবাদিকতা এ খেলাগুলোর বাইরে গিয়ে কাবাডি, সাঁতার, দাবা, গলফ ইত্যাদি খেলা সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী সংবাদ প্রকাশ করে খেলাগুলোকে জনপ্রিয় করে তুলতে পারে এবং পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে।

প্রিন্ট মিডিয়ায় কর্মরত ক্রীড়া সাংবাদিকদের জন্য ইংল্যান্ডের লিডস ট্রিনিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর গেবি লগান কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। তার মতে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে প্রিন্ট মিডিয়াকে সংবাদ প্রকাশভঙ্গি থেকে শুরু করে ধারাক্রম বর্ণনা, তথ্যের ব্যবহার, সংবাদ কাঠামো ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে পাঠকের আগ্রহ অনুযায়ী লক্ষণীয় পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে। তার পরামর্শগুলো হলো:

* একজন ক্রীড়া প্রতিবেদকের সবার আগে থাকতে হবে খেলাধুলার প্রতি গভীর অনুরাগ। খেলাধুলা না ভালো বাসলে একজন ক্রীড়া সাংবাদিকের পক্ষে কখনোই পাঠকমনের চাহিদা উপযোগী প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব নয়।
* ক্রীড়া প্রতিবেদককে ক্রীড়াবিষয়ক বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, জার্নাল, ওয়েবসাইট ভালো করে পড়তে হবে। প্রচুর পাঠাভ্যাসের মধ্য দিয়েই ক্রীড়া প্রতিবেদক তার নিজস্ব লেখনী স্টাইল খুঁজে পাবেন। মনে রাখতে হবে, একজন ক্রীড়া প্রতিবেদকের অবশ্যই স্বীয় লিখনশৈলী থাকতে হবে। আর তা আয়ত্ত করতে হলে বিখ্যাত ও সমসাময়িক অন্য ক্রীড়া প্রতিবেদকদের প্রতিবেদন পড়তে হবে প্রচুর।
* প্রত্যেক সাংবাদিকই আগের কোনো একজন সাংবাদিককে আইকন হিসেবে বেছে নেয়। ক্রীড়া প্রতিবেদককেও তার আইকন সাংবাদিকের প্রতিবেদনগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে এবং প্রতিবেদনগুলো কেন অনন্য, সেই কারণগুলো খুঁজে বের করতে হবে। স্বীয় লিখনশৈলীর মধ্যে কীভাবে সেই অনন্য স্টাইলগুলোর প্রয়োগ ঘটানো যায়, সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে প্রতিনিয়ত। তবে তা যেন কোনোভাবেই অন্যের লিখনশৈলীর কপি না হয়ে যায়, সেটাও খেয়াল রাখতে হবে।
* খেলার পরিসংখ্যান বা ফলাফলের সঙ্গে সঙ্গে খেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত

অন্যান্য ঘটনাপ্রবাহের ওপর নজর রাখতে হবে সুচতুরভাবে। কারণ বিশ্বায়নের কল্যাণে খেলাধুলা এখন বিশ্ব বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মাঠের ভেতরে ও বাইরে খেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত পাঠকের জন্য আগ্রহোদ্দীপক বিষয়গুলো খুঁজে বের করতে হবে এবং গল্পের ঢঙে পাঠকের সামনে তা উপস্থাপন করতে হবে।

* ক্রীড়া সাংবাদিকতা নিয়ে বিভিন্ন সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত কর্মশালা, সেমিনারগুলোয় সম্ভব হলে অংশ নিতে হবে। কারণ একাডেমিক দীক্ষায়ন অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের দেখার দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলে দেয়, চিন্তার জগৎকে প্রসারিত করে, যা প্রতিবেদককে পরবর্তী সময়ে সংবাদ খুঁজে পেতে সাহায্য করতে পারে।
* যথাসম্ভব বেশি খেলোয়াড়দের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা এবং তাদের বক্তব্যকে প্রতিবেদনে জায়গা দেয়া। কারণ পাঠক খেলা ও খেলাসম্পর্কিত বিবরণী প্রতিবেদকের চেয়ে খেলোয়াড়দের মুখেই বেশি শুনতে চায়। খেলোয়াড়দের কাছ থেকে খেলা সম্পর্কিত এমন অনেক তথ্য পাওয়া যাবে, যা অন্য কোনোভাবেই আর কারো কাছে পাওয়া যাবে না।
* অন্য ক্রীড়া প্রতিবেদকদের সঙ্গে তাদের কাজের অভিজ্ঞতা, রিপোর্ট তৈরির কৌশল ইত্যাদি নিয়ে কথা বলা। তথ্য সংগ্রহ করা, রিপোর্ট লেখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে একেকজন একেকরকম কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে নিজের কর্মপ্রক্রিয়াকে নতুন করে সাজিয়ে তুলতে হবে।
* দিনের খেলা সম্পর্কিত বর্ণনার ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট দল বা খেলোয়াড় সম্পর্কে অতীতের কোনো রেকর্ড বা অর্জনকে তুলনামূলকভাবে ব্যবহার করতে পারলে প্রতিবেদনটি একদিকে যেমন তথ্যসমৃদ্ধ হবে, অন্যদিকে পাঠক প্রতিবেদনটি পড়ে পরিতৃপ্তি পাবে।
* অন্যকে নকল করা কিংবা আর দশজন প্রতিবেদকের লেখার স্টাইলকে সরাসরি অনুকরণ করা যাবে না। এতে পাঠকের কাছে প্রতিবেদকের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে। গতানুগতিক রিপোর্ট পাঠকের মনোযোগ আর্কষণ করতে ব্যর্থ হয়।
* সবশেষে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যেখানে শেষ, প্রিন্ট মিডিয়াকে সেখানেই শুরু করতে হবে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত ক্রীড়া প্রতিবেদনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় মসলা যুক্ত করে অনুসন্ধানী বা ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।

পরিশেষ

সামগ্রিক পর্যালোচনায় এ কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়, অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে ইন্টারনেটের উদ্ভব, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যাপক বিস্তার, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রভাব ইত্যাদির ফলে প্রিন্ট মিডিয়াকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে অতীতের চেয়ে অনেক বেশি। তার মানে এ নয় যে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার চাপে প্রিন্ট মিডিয়া হারিয়ে যাচ্ছে কিংবা পাঠক আর পত্রিকা পড়ছে না। সময়ের সঙ্গে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েই পত্রিকার জন্য প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে, আগের দিনের ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত সংবাদটির সঙ্গে ঘটনার পেছনের ঘটনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে হাজির হতে হবে পাঠকের সামনে। একথাটি অন্য যে কোনো ধরনের সংবাদের মতো ক্রীড়া প্রতিবেদনের ক্ষেত্রেও সত্য। তবে অন্য যে কোনো ধরনের প্রতিবেদনের চেয়ে ক্রীড়া প্রতিবেদনে কাজটি করা অনেক সহজ। কারণ অন্যান্য প্রতিবেদনের চেয়ে ক্রীড়া প্রতিবেদনে বিশেষণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কৃপণতা দেখাতে হয় না। রাজনীতি, অপরাধ, ব্যবসা ইত্যাদি যে কোনো ধরনের প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে প্রতিবেদককে শব্দের ব্যবহার, ভাষার বুনন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক সাবধান থাকতে হয়। কারণ এসব ক্ষেত্রে রিপোর্টের সঙ্গে সম্পৃক্ত গোষ্ঠীগুলো রিপোর্টে ব্যবহৃত যে কোনো শব্দ বা বাক্যবন্ধকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করে প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারে; কিন্তু ক্রীড়া প্রতিবেদনে সেই সম্ভাবনা কম। তার মানে এ নয় যে, এখানে তিনি যা খুশি তা লিখতে পারেন। তবে অবশ্যই এখানে অন্যান্য প্রতিবেদনের চেয়ে হাত খুলে লেখার সুযোগ অনেক বেশি থাকে। এছাড়া ছবির ব্যবহার করে প্রতিবেদনকে প্রাণবন্ত ও বর্ণিল করে উপস্থাপনের সুযোগও এখানে অনেক বেশি।

ক্রীড়া প্রতিবেদককে প্রতিবেদন তৈরির সময় সাদামাটা তথ্যের সঙ্গে সঙ্গে মাঠের পরিবেশ, আবহাওয়া, সমর্থকদের প্রত্যাশা ও উল্লাস, বৈচিত্র্যময় সাজসজ্জা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে যুক্ত করে রিপোর্টকে বর্ণিল করে তুলতে হয়। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সময়ের স্বল্পতা, অল্প সময়ের মধ্যে সংবাদ প্রেরণ ইত্যাদি নানা কারণে ঘটনার গভীরে গিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরতে না পারার যে সীমাবদ্ধতা, সেখানেই প্রিন্ট মিডিয়ার অপার সম্ভাবনা।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক,
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

কেমন হবে আগামী দিনের ক্রীড়া সাংবাদিকতা

দুলাল মাহমুদ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ক্রীড়া সাংবাদিকতার সেই ধারাটা অব্যাহত থাকে। মোটামুটি সব পত্রিকায় ক্রীড়া সাংবাদিক নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রতিটি দৈনিক পত্রিকায় সাপ্তাহিক খেলার পৃষ্ঠা বরাদ্দ করা হয়

ধাপে ধাপে বিবর্তিত হয়ে একটা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যায় এ দেশের সাংবাদিকতা। শৌখিনতার বলয় থেকে বেরিয়ে হয়ে ওঠে পেশাদার। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা, অনেক ব্যথা-বেদনা আর অনেক অশ্রু ও কান্না। শুধু ভালোবাসাকে সম্বল করে সাংবাদিকতায় নিজেকে সমর্পণ করেছেন কত শত উজ্জ্বল, মেধাবী ও ত্যাগী মানুষ। নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছেন। তবুও সাংবাদিকতার মহান আদর্শ থেকে কখনো বিচ্যুত হননি। নিঃস্বার্থ সেই মানুষের রক্ত-ঘাম-শ্রমের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজকের সাংবাদিকতা। সাংবাদিকতা শুধু একটি পেশা নয়, একটি সুমহান আদর্শও। চাওয়া-পাওয়ার পরিবর্তে সঠিকভাবে সংবাদ পরিবেশন করাই সাংবাদিকদের ভিশন ও মিশন। একই ধারায় চলে এসেছে এ দেশের ক্রীড়া সাংবাদিকতাও। এটিকে আলাদা

করে দেখার সুযোগ নেই। ক্রীড়া সাংবাদিকতাও একইভাবে বিকশিত, বিবর্তিত ও বিবর্ধিত হয়েছে।

এ অঞ্চলের ক্রীড়া সাংবাদিকতা পেরিয়ে এসেছে অনেকটা সময়। একদমই নিশ্চিত করে বলা মুশকিল, কবে নাগাদ শুরু হয়েছে ক্রীড়া সাংবাদিকতা। যতটা জানা যায়, ১৮৫৪ সালে অবিভক্ত ভারতের কলকাতার এসপ্লানেডে 'ক্যালকাটা অব সিভিলিয়ানস' এবং 'জেন্টেলম্যান অব ব্যারাকপুর'-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত ফুটবল ম্যাচের খবর প্রথম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সেই যে ক্রীড়া সাংবাদিকতা ধারার সূত্রপাত, তা ধীরে ধীরে এগিয়েছে। বিস্তৃত হয়েছে। সমৃদ্ধ হয়েছে। তখন তো ব্রিটিশ উপনিবেশ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কলকাতা। মূলত কলকাতাকে কেন্দ্র করেই দুই বাংলার রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকশিত হয়। একইভাবে বিবর্তন ঘটে খেলাধুলারও। জনপ্রিয়তার নিরিখে এগিয়ে থাকা ফুটবল, ক্রিকেট, হকিসহ বিভিন্ন খেলা উঠে এসেছে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'ইংলিশম্যান', 'দ্য স্টেটসম্যান', 'অমৃতবাজার', 'অ্যাডভান্স', 'আনন্দবাজার'-এর মতো পাঠকপ্রিয় পত্রিকায়। সেই পত্রিকাগুলোয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন পূর্ববঙ্গের সাংবাদিকরাও। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অনেক ক্রীড়া সাংবাদিকও।

ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গ খেলাধুলায় মোটেও পিছিয়ে ছিল না। মোগল আমল থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে এ ভূখণ্ডে খেলাধুলার চল শুরু হয়। তবে ব্রিটিশ আমলে আধুনিক খেলাধুলার প্রসার ঘটে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে খেলাধুলা আয়োজনের জন্য ১৮৯৫ সালে গঠিত হয় 'ঢাকা স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন' বা ডিএসএ। ১৮৯৮ সালে ওয়ারী, ১৯০৩ সালে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব গড়ে তোলা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠে বিভিন্ন ক্লাব। যদ্দূর জানা যায়, ১৯১৫ সালে শুরু হয় ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগ। এটি পৃথিবীর পুরোনো ফুটবল লিগের একটি। এর পরপরই আয়োজিত হয় 'রোনাল্ডসে শিল্ড'। ঢাকার নবাব পরিবারের উদ্যোগে প্রবর্তিত হয় হকিসহ বিভিন্ন খেলা। গুরুত্বপূর্ণ শহর হয়েও প্রচারের দিক দিয়ে ঢাকা অনেকটাই আড়ালে পড়ে থাকে। এর কারণ, সেসময় ঢাকা থেকে খুব বেশি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গের খেলাধুলার খবর অনেকটা অনাদৃত থেকে যায়। কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল ১৮৬১ সাল থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকা। এ পত্রিকায় কালেভদ্রে প্রকাশ হতো খেলাধুলার সংবাদ। সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে– পূর্ববঙ্গের ক্রীড়া সাংবাদিকতার প্রচলন শুরু হয় রয়েল আকারের এই পত্রিকার মাধ্যমে। ১৯৩৭ সালে ব্রিটিশ ফুটবল দল 'ইসলিংটন কোরিন্থিয়ান্স' দলের পূর্ববঙ্গ সফর খুব গুরুত্ব দিয়ে কাভার করে কলকাতার পত্রপত্রিকাও। এছাড়াও মাঝেমধ্যে ঢাকার খেলাধুলার খবর কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক আজাদসহ বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হতো।

দেশভাগের পর পাকিস্তানের ক্রীড়াঙ্গনের প্রধান আকর্ষণ ছিল ঢাকা। মূলত ফুটবলের তীর্থকেন্দ্র হয়ে উঠে বনেদি এই শহর। অর্থনৈতিক কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের মাকরানি ফুটবলাররা দলে দলে ছুটে আসতেন ঢাকায়। অংশ নেন ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায়। ফজল মাহমুদের অসাধারণ বোলিং নৈপুণ্যে ১৯৫২ সালে ভারতের লক্ষ্ণৌতে নিজেদের দ্বিতীয় ক্রিকেট টেস্টে ভারতকে এবং ১৯৫৪ সালে ইংল্যান্ডের ওভালে স্বাগতিক দলকে হারিয়ে দেয় পাকিস্তান। এ ঘটনা তৎকালীন ক্রীড়াঙ্গনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। তার অংশীদার হয়ে উঠে পূর্ব পাকিস্তানও। এককালের ডিএসএ মাঠকে ঢাকা স্টেডিয়াম হিসেবে গড়ে তোলা হয় এবং ১৯৫৫ সালের ১ জানুয়ারি পাকিস্তান-ভারত ক্রিকেট টেস্ট দিয়ে স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করা হয়। সে বছরই ঢাকায় বার্মা (বর্তমান মিয়ানমার), ভারত, সিলন (শ্রীলংকা) ও পাকিস্তানকে নিয়ে আয়োজন করা হয় কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল টুর্নামেন্ট। ১৯৫৬ সালের ৪ মার্চ লাহোরে পঞ্চম পাকিস্তান স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে ৮০ মিটার হার্ডলসে স্বর্ণপদক জয় করেন কিশোরী অ্যাথলেট লুৎফুন্নেছা হক বকুল। তখনকার রক্ষণশীল সমাজে এ ঘটনায় দারুণ তোলপাড় সৃষ্টি হয়। ১৯৫৮ সালে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে রীতিমতো কাঁপিয়ে দেন সাঁতারু ব্রজেন দাশ (তিনি ছয়বার এ গৌরব অর্জন করেন)। একই বছর ঢাকায় শুরু হয় এশিয়ার অন্যতম একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা 'আগা খান গোল্ডকাপ ফুটবল'। তাতে অংশ নেয় বিদেশের জাতীয় ও ক্লাব পর্যায়ের বিভিন্ন দল। এছাড়াও পাকিস্তানের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ ঢাকা স্টেডিয়ামে আয়োজিত হয়। আয়োজিত হয় পাকিস্তান ন্যাশনাল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ, পাকিস্তান ন্যাশনাল গেমসসহ অ্যাথলেটিকস, সাঁতার, হকির বিভিন্ন জাতীয় প্রতিযোগিতা। তাতে অংশ নেন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ক্রীড়াবিদ ও সংগঠকরা। ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে দর্শকের সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি ক্রমান্বয়ে সংবাদপত্র পাঠকদেরও আগ্রহ তৈরি হতে থাকে।

সংগত কারণে সংবাদপত্রের পক্ষে ক্রীড়াঙ্গনকে উপেক্ষা করার সুযোগ ছিল না। পাঠক চাহিদার কথা বিবেচনা করে সেসময় খেলাধুলা কাভার করার জন্য আলাদাভাবে নিয়োগ দেওয়া হয় ক্রীড়া সাংবাদিকদের। খেলাধুলার আয়োজন ও ক্রীড়াবিদদের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তন ঘটেছে ঢাকা তথা পূর্ব পাকিস্তানের ক্রীড়া সাংবাদিকতার। আর এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে ইংরেজি দৈনিক 'মর্নিং নিউজ', 'অবজারভার', বাংলা দৈনিক 'আজাদ', 'ইত্তেফাক', 'সংবাদ' প্রভৃতি পত্রিকা। ১৯৪৯ সালে মওলানা আকরম খাঁর পত্রিকা দৈনিক আজাদ কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। এ পত্রিকার চিফ রিপোর্টার সৈয়দ জাফর আলীর হাত ধরে শুরু হয় পূর্ব পাকিস্তানের ক্রীড়া সাংবাদিকতা। গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকেও স্পোর্টস রিপোর্টার হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। তখন তো ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকায় খুব বেশি হলে খেলার নিউজ থাকত এক কলাম। তা-ও অনিয়মিত। তবে ক্রীড়াঙ্গনকে শুরুতে গুরুত্ব দেয় ইংরেজি পত্রিকাগুলো। ১৯৪৯ সালে 'অবজারভার' প্রকাশিত হলে কানু কবীরকে (নুরুল কবীর) ৫০ টাকা বেতনে পার্টটাইম স্পোর্টস রিপোর্টার হিসেবে নিয়োজিত করা হয়। 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকা প্রথম ফুলটাইম স্পোর্টস রিপোর্টার হিসেবে কুতুবউদ্দিনকে ১৯৫৪ সালে নিয়োগ দেয়। সবার আগে খেলার সংবাদের জন্য প্রথম এক পৃষ্ঠা বরাদ্দ করে এ পত্রিকাটি। তাদের অনুসরণ করে 'অবজারভার' পত্রিকা। বাংলা পত্রিকায় খেলাধুলা বেশি কাভারেজ দেওয়া হতো না। তবে ষাট দশকে 'দৈনিক পাকিস্তান' (পরবর্তীকালে দৈনিক বাংলা), 'পূর্বদেশ', 'জনপদ' পত্রিকা খেলাধুলায় গুরুত্ব দেওয়া শুরু করে। পাকিস্তান আমলে এ দেশের ক্রীড়া সাংবাদিকতার ভিত্তি গড়ে ওঠে। তবে সেসময় খেলাধুলার জন্য আলাদা কোনো আলোকচিত্রী ছিলেন না। একজন ফটোগ্রাফারকেই পত্রিকার সবকিছুই কাভার করতে হতো।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ক্রীড়া সাংবাদিকতার সেই ধারাটা অব্যাহত থাকে। মোটামুটি সব পত্রিকায় ক্রীড়া সাংবাদিক নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রতিটি দৈনিক পত্রিকায় সাপ্তাহিক খেলার পৃষ্ঠা বরাদ্দ করা হয়। সব ধরনের পত্রিকায়ই খেলার সংবাদ গুরুত্ব পেতে থাকে। প্রকাশিত হতে থাকে ক্রীড়াবিষয়ক ম্যাগাজিনও। পর্যায়ক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যায় ক্রীড়া সাংবাদিকতা। তবে দীর্ঘদিন চলে আসা ক্রীড়া সাংবাদিকতার ধারা ও স্বাদ বদলে যায় নব্বই দশকে। কলকাতার 'দৈনিক আনন্দবাজার', 'দৈনিক আজকাল' পত্রিকার অনুসরণে 'দৈনিক আজকের কাগজ' পত্রিকা প্রবর্তন করে 'লিটারারি জার্নালিজম'। পাঠ্যবইয়ের ছকবাঁধা পদ্ধতিগত সাংবাদিকতার পরিবর্তে এই সাহিত্য সাংবাদিকতা বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রিন্ট মিডিয়ায় এ ধারাটা এখনো কমবেশি চলে আসছে। তাছাড়া বেড়েছে পত্রিকার পরিসরও। আগে যেখানে দু-একজনকে দিয়ে দেশ-বিদেশের ক্রীড়াঙ্গন দায়সারাভাবে কাভার করা হতো, এখন কোনো কোনো পত্রিকায় ১২-১৩ জনও কর্মরত আছেন। আলাদাভাবে আছেন আলোকচিত্রীও।

সংবাদপত্রের পাশাপাশি ক্রীড়া সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বেতারেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ১৯৩৯ সালে ঢাকায় সম্প্রচার শুরু হলেও পঞ্চাশ দশক থেকে বেতারে সরাসরি খেলা সম্প্রচার করা হয়। ধারাবিবরণীতে থাকতেন মূলত ক্রীড়ালেখক, ক্রীড়া সাংবাদিকরা। এই সম্প্রচার ক্রীড়া সাংবাদিকতার অংশ হয়ে আছে। আর সাম্প্রতিক সময়ে এফএম রেডিও শুরু করেছে ক্রীড়াঙ্গনকে নিয়ে নতুন ধরনের সাংবাদিকতা।

তবে প্রিন্ট মিডিয়াকে প্রথম চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় টেলিভিশন। ১৯৬৪ সালে ঢাকায় টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু করলেও স্বাধীনতার পর বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন খেলা সরাসরি সম্প্রচার করে। তবে বিটিভিতে প্রতিদিনের খেলার খুব বেশি কাভারেজ দেওয়া হতো না। কিন্তু গত শতাব্দের শেষলগ্নে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল প্রচলিত ধারা বদলে দিয়ে ক্রীড়া সাংবাদিকতায় বড়ো ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসতে থাকে। এখন তো অসংখ্য চ্যানেল। বিস্তর সাংবাদিক। কোনো কোনো চ্যানেলে ক্রীড়া শাখায় ১৭-১৮ জনও কর্মরত। যে কোনো খেলা কিংবা ক্রীড়াবিষয়ক ঘটনাকে যেভাবে তুলে ধরা হয়, তাতে প্রিন্ট মিডিয়াকে অনেকটা ম্লান করে দেয়। দেশের মাটিতে তো বটেই, বিদেশের যে কোনো খেলায় ক্রীড়া সাংবাদিকদের উপস্থিতি মোটেও দুর্লভ নয়। এমনকি বাংলাদেশের অংশগ্রহণ না থাকলেও পাঠক-শ্রোতা ও দর্শকের চাহিদা মেটানোর জন্য সাংবাদিকরা ঠিকই বিভিন্ন দেশে দলে দলে খেলা কাভার করতে যান। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও প্রিন্ট ও টিভি মিডিয়া হাত ধরাধরি করে একই সঙ্গে এগিয়ে যায়।

দীর্ঘকাল ক্রীড়া সাংবাদিকতা অনেকটা একই ধারায় বয়ে চলে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বায়নের এ দুনিয়ায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ধারাটা এত দ্রুত ঘটছে, যার কোনো খেই পাওয়া যাচ্ছে না। পর্যায়ক্রমে শক্ত ভিতের ওপর গড়ে ওঠা ক্রীড়া সাংবাদিকতার বহমান ধারাটি তছনছ হয়ে যাচ্ছে। যতই দিন যাচ্ছে, নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন ক্রীড়া সাংবাদিকরা। সময়ে সময়ে নতুন প্রযুক্তি সংযোজিত হওয়ায় বদলে যাচ্ছে সাংবাদিকদের দায়িত্ব ও ভূমিকা। অবশ্য সোশ্যাল মিডিয়ার ধাক্কায় সমাজই যেখানে ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে, সেখানে সাংবাদিকতা কীভাবে থিতু হয়ে থাকে? সাংবাদিকতা তো সমাজেরই অংশ। আমাদের এখন বসবাস ডিজিটাল প্রযুক্তির ঘরে। মূলত বলা যেতে পারে ইন্টারনেটের যুগে আর এ প্রযুক্তি দ্বারাই আমাদের জীবন-জীবিকা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে ক্রীড়া সাংবাদিকতায়। কত দ্রুত তথ্য পৌঁছে দেওয়া যায়, তার জন্য চলছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এ কারণে ক্রীড়া সাংবাদিকতা হয়ে উঠেছে প্রতি পলের, প্রতি ক্ষণের, প্রতি মুহূর্তের। একজন ক্রীড়া সাংবাদিককে সদা জাগ্রত, সতর্ক ও তটস্থ থাকতে হয়।

এখন চলছে অনলাইন সাংবাদিকতার জোয়ার। প্রতিদিনই খোলা হচ্ছে নতুন নতুন ওয়েবসাইট, ব্লগ কিংবা নেটওয়ার্ক। তরুণ প্রজন্ম অনলাইন সাংবাদিকতার প্রতি ব্যাপকভাবে ঝুঁকে পড়েছেন। খুবই সাম্প্রতিক সময়ের কথা– ক্রীড়ানুরাগীরা খেলার খবরের জন্য পরের দিন প্রকাশিত সংবাদপত্রের অপেক্ষায় থাকতেন। অথচ ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশ ঘটার পাশাপাশি খুব দ্রুতই খেলার সংবাদ পড়তে, শুনতে কিংবা দেখতে আগ্রহী পাঠক-শ্রোতা ও দর্শক। আর এখন খেলার শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই কতভাবেই না পৌঁছে যাচ্ছে খেলার যাবতীয় সংবাদ, তথ্য, গ্রাফিক্স ও পরিসংখ্যান। যে কোনো ঘটনার তাৎক্ষণিক তথ্য, ভিডিও কিংবা সরাসরি সম্প্রচার করাটাই অনলাইন সাংবাদিকতার প্রধান আকর্ষণ। এমনকি বলতে গেলে এখন কোনো কিছুই আর আড়াল বা গোপন থাকছে না। কোনো কিছু জানা কিংবা দৃষ্টিগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত গতিতে সর্বত্র প্রচার হয়ে যাচ্ছে। এখন তো চোখের পলকেই তথ্য পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন সবাই। প্রযুক্তি প্রকৃত অর্থেই ক্রীড়া সাংবাদিকদের জন্য নতুন এক চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। প্রচলিত তথ্যমাধ্যম তো বটেই, বিশেষ করে প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য এটি হয়ে উঠেছে অস্তিত্বের প্রশ্ন। বাধ্য হয়ে অধিকাংশ সংবাদপত্রই অনলাইন সংস্করণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। শুধু তথ্য নয়, একই সঙ্গে সংযুক্ত করতে হচ্ছে ছবি, অডিও ও ভিডিও। এ কারণে বহুমুখী দক্ষতা প্রদর্শন করাই এখন ক্রীড়া সাংবাদিকদের জন্য মস্ত এক চ্যালেঞ্জ।

এখন আর একটি মাধ্যমে পরিবেশিত তথ্য নিয়ে সন্তুষ্ট নন পাঠক-শ্রোতা, দর্শক বা ক্রীড়া অনুরাগীরা। তারা অনেক বেশি জানতে চান। অনেক বেশি শুনতে চান। অনেক বেশি দেখতে চান। এ কারণে তারা নানাভাবে, নানা উপায়ে ও নানা মাধ্যমে যে কোনো খেলার তথ্য, পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণ সন্ধান করেন। ওয়েবসাইট, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট, ব্লগ, প্রিন্ট মিডিয়া, টেলিভিশন-বেতারে কিংবা সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করছেন। এমনকি ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে যে কোনো খেলার খবর। সহজেই তা চোখের সামনে চলে আসে। অবশ্য এর একটা কুফলও দেখা যাচ্ছে। কোনো বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই এখন তাৎক্ষণিক ও দ্রুত তথ্য দেওয়াটা হয়ে উঠেছে কারো কারো কাছে সাংবাদিকতার অন্যতম নিয়ামক। যে কারণে অহরহই অনেক অতিরঞ্জিত, ভুল ও মিথ্যা তথ্যও পরিবেশিত হচ্ছে।

ভার্চুয়াল জগতের এই সাংবাদিকতায় অনেক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতার চরম অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা ও দর্শন। গভীরতাও থাকছে না। কোয়ানটিটি বেড়েছে। কমছে কোয়ালিটি। এখন কেউ সূত্রের ধার ধারেন না। অথচ সাংবাদিকতার মূল ভিত্তি হচ্ছে তথ্যসূত্র ও বিশ্বস্ততা। নির্ভরযোগ্য সূত্র ছাড়া কোনো তথ্য পরিবেশন করা মোটেও দায়িত্বশীলতার পরিচায়ক নয়। কিন্তু এখন এসবের যেন বালাই নেই। আপটুডেট থাকা, নিখুঁত তথ্য পরিবেশন এবং সাংবাদিকতার উচ্চমান ও কাজের দক্ষতা একজন ক্রীড়া সাংবাদিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও সব কেন যেন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। এখন তো অসংখ্য সাংবাদিক। অসংখ্য মিডিয়া। এককভাবেও অনলাইন সাংবাদিকতা করা যায়। একটি স্মার্টফোন, একটি ল্যাপটপ বা একটি কম্পিউটার হলেই তথ্য পরিবেশন কিংবা মিডিয়া পরিচালনা করা যায়। কারো মুখাপেক্ষী থাকতে হয় না। সব মিলিয়ে প্রিন্ট মিডিয়ার অবস্থা খুবই শোচনীয়। অনেক পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক পত্রিকা বন্ধ হওয়ার পথে। আগামী দিনে প্রিন্ট মিডিয়া টিকবে কি না, তা নিয়েও ব্যাপক সংশয় দেখা দিয়েছে। এর যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণও আছে। শুধু প্রিন্ট মিডিয়া কেন, টেলিভিশনও আজ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। বিস্ময়কর হলেও সত্য, টিভির অস্তিত্ব থাকবে কি না, সেটাও এখন বড়ো প্রশ্ন। নতুন প্রজন্মের সংবাদপত্র ও টেলিভিশন হয়ে উঠেছে ট্যাবলেট, স্মার্টফোন জাতীয় ছোট আকারের ডিজিটাল প্রযুক্তি।

কতভাবেই না সাংবাদিকতার সূত্রপাত ঘটছে। ফেসবুক বা টুইটার সাংবাদিকতা। ইউটিউব সাংবাদিকতা। মোবাইল সাংবাদিকতা। আরো নতুন নতুন মাধ্যম। এ ধরনের মাধ্যম দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সবকিছুই চলে এসেছে হাতের মুঠোয়। এসব মাধ্যমের চাপে টিভি সাংবাদিকতাও দিন দিন অনুজ্জ্বল হয়ে পড়ছে। দীর্ঘদিনের অভ্যাসের কারণে সিনিয়র নাগরিকদের কাছে সংবাদপত্র, বেতার বা টেলিভিশনের কদর থাকলেও নতুন প্রজন্ম ফেসবুক, টুইটার, টুলস, অ্যাপস বা মোবাইল ফোনকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। সময় যত এগিয়ে যাবে, ততই এ প্রজন্মের আধিপত্য বাড়বে। সে আলোকেই নির্ধারিত হবে ক্রীড়া সাংবাদিকতার গতিপথ।

খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া। বিভিন্ন রূপে সোশ্যাল মিডিয়ার যেভাবে উত্থান ঘটছে, একে অনেকটা ছিপি খুলে দেওয়ার পর বোতলের ভেতর থেকে বের হয়ে আসা একটি ভয়ংকর দৈত্যের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। এই দৈত্য কোনো নিয়মকানুন মানতে চাইছে না। দৈত্যটিকে বোতলে ঢুকিয়ে কিংবা অন্য উপায়ে একটা নিয়মের মধ্যে আনতে না পারলে হুমকির মধ্যে পড়ে যাবে সাংবাদিকতা। প্রচলিত সাংবাদিকতার বিকল্প হয়ে উঠছে সোশ্যাল মিডিয়ার সাংবাদিকতা। 'সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং'-এর মাধ্যমে সহজেই করা যাচ্ছে তথ্য লেনদেন। এটি ক্রমশ তুমুল জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সোশ্যাল মিডিয়ার এই পরিবর্তন ক্রীড়া সাংবাদিকদের মুখোমুখি করেছে বড়ো ধরনের চ্যালেঞ্জের। এখন তো শুধু লিখলে কিংবা বলে দিলেই দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না। অনেক ক্ষেত্রে পাঠক-শ্রোতা ও দর্শকদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ারও জবাব দিতে হয়। আর ব্লগ সাংবাদিকতার অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে 'ফলোয়ার্স'। যার অনুসরণকারী বেশি, তার গুরুত্বও অনেক বেশি।

এখন এমন একটা অবস্থা, কেউই জানেন না কোন পথে যাবে মিডিয়া? কেমন হবে আগামী দিনের ক্রীড়া সাংবাদিকতা? কেমন হবে ক্রীড়া সাংবাদিকদের ভূমিকা? প্রযুক্তি এত দ্রুত বদলে যাচ্ছে, মোটেও তাল রাখা যাচ্ছে না। বলতে গেলে কোনো ধারাবাহিকতাই থাকছে না। নিত্যনতুন চমকপ্রদ উদ্ভাবন নিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায়– প্রচলিত কোনো মিডিয়াই বোধহয় বিদ্যমান অবস্থায় থাকবে না। প্রতিনিয়তই বদলে যাচ্ছে অবয়ব, অবকাঠামো ও অবস্থান। সবকিছুর নির্ধারক হয়ে উঠছে এক চিলতে চিপ। ক্ষুদ্র এই ইলেকট্রনিক বর্তনীর মধ্যে এঁটে যাচ্ছে তাবৎ কিছু। সেখানে আলাদাভাবে সংবাদপত্র, বেতার-টেলিভিশনের কোনো প্রয়োজন পড়বে না।

এ এক অস্থির সময়। খুবই কঠিন এক পরিস্থিতি। অনির্দিষ্ট গন্তব্য। মিডিয়া কোথায়, কী আকারে, কী অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াবে– সেটা অনুমান করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। যে কারণে ক্রীড়া সাংবাদিকদের অবস্থান ও ভূমিকা কী হবে– সেটাও বলা মুশকিল। তবে এ নিয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। সাংবাদিকতা এমনিতেই একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা। আগে মূলত তথ্য নিয়েই ভাবতে হতো। এখন নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে ডিজিটাল প্রযুক্তি। অবশ্য নিজেকে সময়ের সঙ্গে প্রস্তুত করে রাখলে যে কোনো পরিবর্তনই মানিয়ে নিতে সমস্যা হবে না। সাংবাদিকতার মৌলিক জ্ঞান, নির্দিষ্ট ক্রীড়ায় সম্যক ওয়াকিবহাল থাকা ও যথাযথ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করাটাও বড়ো একটি ফ্যাক্টর। একই সঙ্গে থাকতে হবে কাজের প্রতি আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, কষ্টসহিষ্ণুতা, সততা, ভালোবাসা ও দায়িত্বশীল মনোভাব। প্রকৃত অর্থেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আরো পেশাদার, পরিবর্তিত ও নবায়িত করার বিকল্প নেই। লাগসই শব্দচয়ন, প্রকৃত তথ্য ও যথাযথ রেফারেন্সের সমন্বয় ঘটিয়ে মিডিয়া ও খেলাধুলার মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তুলতে পারাটাই দক্ষতা ও কুশলতার নিদর্শন। লেখা, বলা, দ্রুততা, দক্ষতা, স্মার্টনেস ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পটু হলে কোনো কিছুই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। তাছাড়া অনিশ্চিত, উত্তেজনাপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর পথ পাড়ি দেওয়ার মধ্যে যে কৌতূহল, যে আনন্দ, যে শিহরণ থাকে– তার সঙ্গে আর কিছুর তুলনা চলে না। এ ধরনের চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে মেধাবী, সৃষ্টিশীল, দক্ষরা ঠিকই সময়ের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে উপহার দিতে পারবেন নতুন ঘরানার ক্রীড়া সাংবাদিকতা। সেটাই আশার কথা।

লেখক : *সম্পাদক, পাক্ষিক ক্রীড়া জগত*

হতে পারেন আপনিও ক্রীড়া সাংবাদিক

মামুন অর রশিদ

> তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে খুব সহজেই হাতের মুঠোয় পাওয়া যাচ্ছে। ... যেখানে নানা বর্ণের শ্রেণির দলের ঊর্ধ্বে এসে সবাই একই কাতারে দাঁড়াচ্ছে। শুধু এই সাংবাদিকতা পেশায় যে কেউ নিজেকে মেলে ধরতে পারেন

সাংবাদিকতা চ্যালেঞ্জিং হলেও এটিকে বলা হয় মহান পেশা। আর সাংবাদিকতার নানা ক্ষেত্রের মধ্যে অন্যতম হলো ক্রীড়া সাংবাদিকতা। ক্রীড়া সংবাদিকতাকে বলা হয় রোমাঞ্চকর সাংবাদিকতা। বর্তমান বিশ্বে খেলাধুলার প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধির কারণে ক্রীড়া সাংবাদিকতার কদরও বেড়েছে অনেক। বাংলাদেশে মিডিয়া বুমিংয়ের সাংবাদিকতার ক্ষেত্র অনেকগুণ প্রসারিত হয়েছে। আজকাল দেখা যায়, অনেক তরুণ-তরুণীই ক্রীড়া সাংবাদিকতার দিকে ঝুঁকছে। অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশের গণমাধ্যমগুলোয়ও খেলাধুলার সংবাদকে বিশেষ স্থান দিয়ে প্রচার বা প্রকাশিত হচ্ছে। সংবাদপত্রে নির্দিষ্টভাবে পাতা বরাদ্দ রাখা হচ্ছে খেলার সংবাদ পরিবেশনের জন্য। আবার টেলিভিশন ও রেডিওর সংবাদেও নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ রাখা হচ্ছে খেলার সংবাদ প্রচারের জন্য। এছাড়া খেলাধুলা নিয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষণধর্মী অনুষ্ঠানও প্রচারিত হতে দেখা যাচ্ছে।

ক্রীড়া সাংবাদিকতা কী

সাংবাদিকতার নানা ধরনের মধ্যে ক্রীড়া সাংবাদিকতাও পড়ে, এটি একদম আলাদা কিছু নয়। খেলাধুলা সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় জানা এবং এ সংক্রান্ত তথ্য বা সংবাদ উৎপাদন থেকে পরিবেশন পর্যন্ত কার্যক্রমে জড়িত থাকার নামই হচ্ছে ক্রীড়া সাংবাদিকতা।

Andi Krasniqi-এর মতে, 'Sports Journalism is a sub-form of journalism. It involves the journalist writing reports on a variety of Sporting topics.'

উইকিপিডিয়ায় বলা হয়েছে, 'Sports journalists write about and report on amateur and professional sports. As a sports journalist, you can expect a variety of job duties such as reporting game statistics, interviewing coaches and players and offering game commentary. You can work in a variety of media, including radio, television and print.'

মোদ্দাকথা হলো, স্বীকৃত সব খেলাধুলাবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও সংবাদ আকারে যে কোনো গণমাধ্যমে (সংবাদপত্র, টেলিভিশন, অনলাইন মিডিয়া ইত্যাদি) প্রচার বা প্রকাশিত কার্যক্রমরে সঙ্গে জড়িত থাকার নামই হচ্ছে ক্রীড়া সাংবাদিকতা।

ক্রীড়া সাংবাদিকতার ইতিহাস

প্রাচীন গ্রিসে রেসিলিং, বরশা নিক্ষেপ, কুস্তি এবং ঘোড়দৌড় নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। খেলাধুলা নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন লেখক তাদের লেখায় উল্লেখ করেছেন। বিখ্যাত গ্রিক লেখক হোমার গ্রিকের রেসলিং (Wrestling) নিয়ে তার লেখায় লিখেছেন। যেমন, মহাবীর একলিক্স তাদের যুদ্ধে বিজয় লাভে দুই হাত উঁচু করতেন। আঠারো শতকের মাঝামাঝির দিকে আমেরিকায় সাংবাদিকরা ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে লেখালেখি শুরু করেছিলেন। তবে তার সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। যদিও উনিশ শতকের আগে খেলাধুলাবিষয়ক কিছু লেখালেখি হতো, কিন্তু সেটি সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত ছিল না। ১৭৯০ সালের দিকে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বেঞ্জামিন ফ্রাকলিনের সাঁতার সম্পর্কিত কিছু উক্তি নিয়ে কিছু পত্রিকা লেখালেখি করে এবং এ সময় নিউইয়র্ক ম্যাগাজিনে খেলাধুলাবিষয়ক প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিল।

অন্যদিকে আঠারো শতকের গোড়ার দিকে নিউইয়র্ক পোস্ট, চার্লস্টন কুরিয়ার, রিচসন্ড এনকোয়ারার খেলাধুলা সংক্রান্ত কিছু সংবাদকে তাদের পত্রিকার পাতায় স্থান দেয়।

মূলত আমেরিকায় ১৮৭০ সালের আগে ক্রীড়া সংবাদপত্রে আলাদা কোনো বিভাগ হিসেবে গড়ে উঠেনি। বিখ্যাত সাংবাদিক জোসেপ পুলিৎজার সর্বপ্রথম তার 'নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড' পত্রিকায় ১৮৮৩ সালে একজনকে ভাড়া করে ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ দেন। সে সময় খেলাধুলার সংবাদের জন্য কাভারেজ ছিল দুই বা তিন কলামেই সীমাবদ্ধ। খুব তাড়াতাড়িই এটির পরিবর্তন ঘটে। এরপর ১৯৩০ সালের দিকে প্রথমবার সংবাদপত্র ক্রীড়া বিভাগ নামে আলাদা একটি বিভাগ তৈরি করে। সেখানে নির্বাহী ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে সাংবাদিকদের নিয়োগ দিতে শুরু করে। ১৯৪০ সালে খেলাধুলাবিষয়ক কার্টুনও খুব জনপ্রিয় হতে শুরু করে। আর খুব তাড়াতাড়িই এটি পত্রিকার পাতার একটি বড় জায়গা দখল করে নেয়। মজার বিষয় হলো, ১৯১৪ সালের আগে ক্রীড়া সম্পাদকের চাকরিকে প্রকৃত চাকরি হিসেবে গণ্য করা হতো না। আর সেসময় ক্রীড়া বিভাগকে 'টয় ডিপার্টমেন্ট' (Toy Department) হিসেবে উপহাস করা হতো।

খেলাধুলার নাম

বিশ্বে কতশত ধরনের খেলাধুলা রয়েছে, তার কোনো হিসাব নেই। তবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত খেলাধুলাই মোটামুটিভাবে গণমাধ্যমে স্থান পায় এবং খেলাধুলা সম্পর্কে বিপুল পরিমাণ পাঠক বা দর্শকের চাহিদা থাকে। আর সেসব খেলাধুলা হলো:

ক্রিকেট, ফুটবল (Football), হকি, ভলিবল (Volleyball), বেসবল (Baseball), বাস্কেট বল (Basketball), টেবিল টেনিস (Table Tennis), লন টেনিস (Lawn Tennis), গলফ (Golf), দাবা (Chess), ঘোড়দৌড় (Horse Racing), কুস্তি (Wrestling), ব্যাডমিন্টন (Badminton), সাঁতার (Swimming), বক্সিং (Boxing), উইম্বলডন অলিম্পিক গেমস, এশিয়ান গেমসসহ নানা ধরনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলাধুলা রয়েছে। শুধু খেলাধুলা নিয়ে সংবাদপত্র প্রকাশিত ফ্রান্সের লা-ইকুফ (L'Equipe), ইতালি থেকে লা গেজেটা ডেলো স্পোর্ট, (La Gazzetta dello Sport), স্পেনের মার্কা (Marca), ব্রিটেন থেকে স্পোর্টিং লাইফ (Sporting Life), আমেরিকা থেকে স্পোর্ট ইলাস্ট্রেড (Sports Illustrated) ও স্পোর্টিং নিউজ (Sporting News), টেলিভিশন চ্যানেল ইউরো স্পোর্ট (Eurosport), ফক্স স্পোর্টস (Fox Sports), রেডিও বিবিসি রেডিও, ইএসপিএন ফক্স স্পোর্টস রেডিও, টিএসএন রেডিও এবং ওয়েবসাইট ইএসপিএন ডটকম (ESPN.com) এবং ফক্সস্পোর্টস ডটকম (Foxsports.com), ইয়াহু, স্পোর্টস (Yahoo! Sports) ও ক্রিকইনফো (Cricinfo).

খেলাধুলার সংবাদ সংগ্রহের সহজ পদ্ধতি:

১. খেলা শুরু হওয়ার আগে:

* যে কোন খেলাই হোক না কোন, প্রতিটি খেলা শুরু হওয়ার আগে ওই খেলা সম্পর্কিত নানা নিয়মকানুন ও বিধিবিধান আগেই ভালোভাবে রপ্ত করতে হবে।
* ওই খেলাধুলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় এবং অন্যদের সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য জেনে রাখতে হবে।
* খেলোয়াড় ও সংশ্লিষ্টদের নামের বানান ও পদবি ঠিকঠাকভাবে জানতে হবে।
* অধিনায়ক বা যে কোনো খেলোয়াড়ের সাক্ষাৎকার নেয়ার চেষ্টা করতে হবে যে, আজকের খেলা সম্পর্কে তাদের প্রত্যাশা কেমন।

২. খেলা চলাকালীন

* খেলা দেখার জন্য এমন স্থান নির্বাচন করা, যাতে খেলাধুলার খুঁটিনাটি খুব সহজেই দেখতে পাওয়া যায়।
* খুব সতর্কতার সঙ্গে খেলাকে পর্যবেক্ষণ করা।
* স্কোর ও অন্যান্য বিষয় নোট করে রাখা

৩. খেলা শেষের পর

* স্কোরের নানা বিষয় ক্রস চেক করে নেয়।
* ওই দিনের খেলার তারকা খেলোয়াড়কে বা কোচের সাক্ষাৎকার নেয়া।
* দর্শকদের উল্লাস বা প্রতিক্রিয়া নেয়া।

খেলাধুলার সংবাদ কাঠামো

খেলাধুলার সংবাদ অন্যান্য হার্ড নিউজের মতোই এখানে লিখতে হবে। এখানেও ষড়-'ক' এর ব্যবহারে সংবাদ লিখতে হবে। আর পরিকাঠামোটি হবে উল্টা পিরামিড কাঠামো। খেলাধুলার সংবাদে খেলার আকর্ষণীয় এবং গুরুত্ব বা উত্তেজনাকর মুহূর্তের বর্ণনা থাকতে হবে। বিশেষ বিশেষ বিশেষণবাচক শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। খেলার স্কোর বোর্ডের ফিগারের বিশ্লেষণ ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। যেমন:

১. শিরোনাম

অন্যান্য সংবাদের মতো খেলার সংবাদেরও শিরোনাম দিতে হবে। তবে শিরোনামটি খুবই পরিশীলিত ও আর্কষণীয় হওয়া চাই।

২. লিড বা ইন্ট্রো

* খেলার চমৎকার তথ্য এখানে উঠে আসবে।
* যেসব খেলোয়াড় অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছে, তাদের তথ্য দিয়েও ইন্ট্রো করা যেতে পারে।
* খেলার বিশ্লেষণধর্মী কিছু তথ্য দিয়ে শুরু করা যেতে পারে।

৩. বডি বা মূল অংশ

* খেলার হাইলাইটস থাকতে পারে, একনজরে পাঠক বা দর্শক যাতে এটি দেখে বা পড়ে নিতে পারেন।
* খেলার সবচেয়ে ভালো স্কোর কোন কোন খেলোয়াড় করেছে, তার একটা বর্ণনা থাকবে বডিতে।
* টিমের একটা সার্বিক পর্যালোচনাও দেওয়া যেতে পারে।
* খেলোয়াড় বা অন্যদের কোটেশন বা উদ্ধৃতিও দেওয়া যেতে পারে।
* আবহাওয়ার অবস্থা কেমন ছিল, সেটাও থাকতে পারে।
* সর্বোপরি খেলা শেষে দর্শকের উদযাপন, উল্লাসের কথা অব্যশই লিখতে বা বলতে ভুলে গেলে চলবে না।

ক্রীড়া সাংবাদিকতা করার ১০ টিপস

সব সাংবাদিকই চায় একজন নামজাদা প্রতিবেদক হতে। তার পরিবেশিত প্রতিবেদন সবাই পড়ুক, দেখুক বা জানুক। কিন্তু ক'জনই বা পারে পাঠক বা দর্শকের মনে একটু ঠাঁই বা জায়গা করে নিতে। তবে কিছু গুণ রপ্ত করলেই যে

ক্রীড়া সাংবাদিক একজন ভালো ও দক্ষ ক্রীড়া সাংবাদিক হয়ে উঠতে পারে। আর সেসব গুণাবলি গুলো হলো:

১. যিনি ক্রীড়া সাংবাদিকতা করবেন, তাকে অবশ্যই খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী বা ঝোঁক থাকতেই হবে। খেলাপ্রেমী হতে হবে।
২. একজন ক্রীড়া সাংবাদিক যে বিষয়টি প্রথমেই মাথায় রাখবেন তা হলো: তিনি নিজের জন্য, পাঠক বা দর্শকের জন্য সংবাদটি লিখছেন।
৩. তাকে অবশ্যই মাঠে উপস্থিত থেকে খেলা দেখতে হবে। তবে একজন রিপোর্টারের ক্ষেত্রে দর্শক বা উল্লাসকারী হিসেবে নয়।
৪. খেলায় অংশগ্রহণকারী পক্ষ-বিপক্ষ দলের এবং খেলোয়াড়দের আগের রেকর্ডগুলো জানা থাকতে হবে।
৫. প্রতিটি খেলার মৌলিক কিছু বিষয় থাকে, সেগুলো অবশ্যই জানতে হবে। এছাড়া প্রতিটি খেলারই আলাদা আলাদা নিয়মকানুন বা বিধিবিধান থাকে, সেগুলোও আগেভাগেই রপ্ত করতে হবে।
৬. দ্রুত নোট নেওয়ার অভ্যাস থাকতে হবে, যেন খেলার গুরুত্বপূর্ণ সিকোয়েন্সের তথ্য বাদ না পড়ে যায়।
৭. খেলার প্রতিবেদন লেখার সময় অবশ্যই নিরপেক্ষ থাকতে হবে। যদিও নিজের পছন্দের দল বা খেলোয়াড়ও খেলে। এটিই একজন ক্রীড়া সাংবাদিকের সবচেয়ে বড়ো গুণ, যা অবশ্যই থাকা চাই।
৮. খেলার বিভিন্ন তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে নির্ভুলতা অবশ্যই চেক করে নিতে হবে।
৯. খেলাধুলা সংশ্লিষ্ট পরিভাষাগুলোর ওপর ভালো দখল থাকতে হবে।
১০. খেলাধুলা সম্পর্কিত স্ল্যাং ওয়ার্ড ব্যবহার করা যাবে না এবং তথ্যবহুল বাস্তবিক শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার করতে হবে।

ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে ক্যারিয়ার গঠনের সুযোগ

আমাদের জীবনে খেলাধুলা বর্তমানে বিনোদনের অন্যতম একটি অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খেলাধুলার পরিসর যেমন বেড়েছে, তেমনি অর্থনৈতিকভাবে খেলাধুলা একটা শিল্প হিসেবেও গড়ে উঠেছে। বছরের ১২ মাসই নানা ধরনের খেলা চলতেই থাকে। বিভিন্ন প্লাটফর্মে এসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর তাই এসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের চাহিদাও বাড়ছে। বর্তমানে সুপার টেকনোলজির যুগে সবকিছুই হাতের মুঠোই পওয়ার একটা অবারিত সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশও এখন আর পিছিয়ে নেই। আমাদের দেশে বেড়েছে মিডিয়ার সংখ্যা। সংবাদপত্র, টেলিভিশন এবং অনলাইন সাইট। এসব গণমাধ্যমের চাহিদা মেটানোর জন্য দরকার একঝাঁক দক্ষ রিপোর্টার। অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে খুব সহজেই খেলার প্রতি আগ্রহী যে কেউ এই জগতে নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারেন। আরো যেসব সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন একজন ক্রীড়া সাংবাদিক– ভালো বেতন, তারকা খেলোয়াড়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ এবং আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখার সুযোগ। পৃথিবীর নানা দেশে গিয়ে খেলা কাভারেজের সুযোগ। খুব অল্প সময়েই সারা দেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠার সুযোগ।

ক্রীড়া সাংবাদিকতায় যে কেউ নিম্নোক্ত বিষয়ে নিজের কাঙ্ক্ষিত ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারেন:

* Sports writers/reporters for print media (including newspapers and magazines).
* Sports editors for print media (including newspapers and magazines).
* Hosts of radio or television sports shows.
* Sports announcers/commentators for radio or television.
* Sports writers/reporters for television or radio broadcasts.
* Producers or directors of television or radio sports shows.
* Online writers/reporters for sports websites, e-magazines or e-newspapers.
* Online editors for sports websites, e-magazines or e-newspapers.
* Sports information specialists.
* Media Representative for sports teams, associations or major venues.

খেলাধুলা সংশ্লিষ্ট কিছু পরিভাষা (টার্ম)

প্রতিটি খেলাধুলার রয়েছে নির্দিষ্ট টার্ম বা পরিভাষা। আর এ পরিভাষাগুলো সাংবাদিকদের আয়ত্তে বা দখলে অবশ্যই রাখতে হবে।

ক্রিকেট: Asking rate, Ball Tampering, Bouncer, Boundary, Chinaman, Cow corner, Dead ball, Economy rate, Full toss, Good length, Googly, Leg-Before Wicket (LBW), Net Run Rate, Night watch man, No-ball, Off-spin, Off-side, Out, Outswing, Run-chase, Run-rate, Sledging, Strike rate, Swing, Throwing, Wicket, Wide, Yorker.

ফুটবল (SOCCER/ FOOTBALL) – goal, penalty, area, goal keeper, goalie, fullbacks, halfbacks,

wingers, free kick, corner kick, offside, banana kick, heading, tackle.

টেনিস (TENNIS): best of three matches, surfeit services, straight set, singles, mush cut volley, ace, fault, error.

গলফ (GOLF): eagle, bogey, birdie, 18-holes.

বক্সিং (BOXING): knock-out, jab, hook, clinch, technical knock-out, upper cut, right cross, duckling, slipping, hitting bellow the belt, Boxing Divisions: fly weight, bantam weight, feather weight, light weight, welterweight.

বাস্কেটবল (BASKETBALL): field goal, foul, quintet, alley hoop, dunk, traveling, backing, goal tending, rainbow shot, lay 0 up

ভলিবল (VOLLEYBALL): toss, spike, net, 3 touches, netters, blockers, spikes, tosses, netball

দাবা (CHESS): castling, capture, check, checkmate, stalemate, touch move, opening.

সাঁতার (SWIMMING): tanker naiads, aqua bell, breast stoke, freestyle, butterfly, flippers.

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে খুব সহজেই হাতের মুঠোয় পাওয়া যাচ্ছে। প্রযুক্তির কল্যাণে এক ক্লিকেই সবকিছু পাওয়া যায়। অতএব যে কেউ চাইলেই নিজেকে ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার দাঁড় করাতে পারেন। খেলাধুলাবিষয়ক নানা একাডেমি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, খেলাধুলার গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে। খেলা প্রতিটি দেশের একটি জাতীয়তাবাদ এবং আবেগের জায়গা হয়ে উঠেছে। যেখানে নানা বর্ণের শ্রেণির দলের উর্ধ্বে এসে সবাই একই কাতারে দাঁড়াচ্ছে। শুধু এই সাংবাদিকতা পেশায় যে কেউ নিজেকে মেলে ধরতে পারেন। এখানে ধরাবাধা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রির দরকার পড়ে না। পৃথিবীর এমনকি আমাদের দেশেরও অনেক বড়ো বড়ো তারকা সাংবাদিক রয়েছেন, যাদের সাংবাদিকতায় প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ডিগ্রি নেই। তারপরও উনারা এ জগতের মহাপুরুষ হিসেবে রয়েছেন। নিজের একাগ্র, অদম্য প্রচেষ্টার ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে। তবে বর্তমানে সাংবাদিকতা শিক্ষার অনেক প্রসার ঘটেছে। এর পাশাপাশি অনেক সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যলয়ের 'ক্রীড়া সাংবাদিকতা' শিরোনামে আলাদা কোর্সই পড়ানো হচ্ছে।

তথ্যসূত্র

* Andrews, P. Sports Journalism: A Practical Introduction. Sage Publications. 2005. ISBN 1412902711
* https://en.wikipedia.org/wiki/Sports_journalism
* Heath, Harry E. How to Cover, Write, and Edit Sports. The Iowa State College Press 1951. OCLC 1402415
* MacCambridge, M. The Franchise: A history of Sports Illustrated Magazine. Hyperion Books. 1997. ISBN 0786862165
* Schultz, B. Sports Media: Reporting, Producing, and Planning. Focal Press. 2005. ISBN 0240807316
* Steen, R, *Sports Journalism: A Multimedia Primer*, Routledge, 2007,ISBN 978-0-415-39424-6
* Wilstein, Steve, *AP Sports Writing Handbook*, McGraw-Hill, 2001, ISBN 978-0-07-137218-3, ISBN 0-07-137218-0

লেখক: সহকারী অধ্যাপক,
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রীড়া প্রতিবেদনে সাক্ষাৎকার

শুভ কর্মকার

> ক্রীড়া সাংবাদিকতায় তথ্য সংগ্রহের অন্যতম হাতিয়ার সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার শুধু তথ্য সংগ্রহই করে না, সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে একটি সংবাদও তৈরি হতে পারে। ক্রীড়া প্রতিবেদককে অবশ্যই সাক্ষাৎকারের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে

আন্তর্জাতিক ম্যাচ শেষ হয়েছে। চারিদিকে খেলা নিয়ে চলছে আলোচনা-সমালোচনা। জয়ী দলের নাচানাচি আর পরাজিত দলের বিষাদ ভর করেছে মাঠে। পুরো মাঠ দেখে মনে হবে উৎসবের আনন্দ-বেদনা চলছে। প্রতিবেদকরা তখন ব্যস্ত প্রশ্নের পসরা নিয়ে। কী প্রশ্ন করবে, কাকে প্রশ্ন করবে ইত্যাদি। সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও কিংবা অনলাইন– যেটাই বলি না কেন, ক্রীড়া প্রতিবেদক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এখনও ক্রীড়া প্রতিবেদনের পাঠকসংখ্যা উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার কথাই বিবেচনা করা যাক। উনিশ শতকে আমেরিকান সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক. পেনি প্রেস এবং দুই. হলুদ সাংবাদিকতা। পেনি প্রেস ও হলুদ সাংবাদিকতার অন্যতম লক্ষ্য ছিল সংবাদপত্রের সার্কুলেশন বৃদ্ধি করা। সার্কুলেশন বৃদ্ধি পেলে বেড়ে যাবে পাঠকসংখ্যা। পেনি প্রেস ও হলুদ সাংবাদিকতা আমেরিকায় পেশাগত ক্রীড়া সাংবাদিকতার উদ্ভবে সহায়তা করেছে। কেননা ক্রীড়া সাংবাদিকতা সংবাদপত্রের সার্কুলেশন বৃদ্ধিতে খুবই সহায়ক। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পায় পাঠকসংখ্যা। শুধু

আমেরিকা নয়, বাংলাদেশেরও বড়ো বড়ো সংবাদপত্রকে ক্রীড়াবিষয়ক প্রতিবেদনকে অনেক গুরুত্ব দিতে দেখা যায়। দেশের উল্লেখযোগ্য দৈনিক সংবাদপত্রগুলো কমপক্ষে দুই পৃষ্ঠায় খেলার খবর ছাপায়। যখন বড়ো টুর্নামেন্ট আয়োজিত হয়, বিশেষত বিশ্বকাপ ফুটবল কিংবা বিশ্বকাপ ক্রিকেটের মতো টুর্নামেন্ট, তখন সংবাদপত্রগুলো খেলার পৃষ্ঠার গণ্ডি ছাড়িয়ে প্রথম পৃষ্ঠায়ও চলে আসে ক্রীড়া প্রতিবেদন। পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধিই অন্যতম কারণ। উল্লিখিত ঘটনাগুলো ক্রীড়া সাংবাদিকতার গুরুত্বকে ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করে। প্রতিবেদককে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাই হতে হয় অনেক সংবেদনশীল ও সক্রিয়। ক্রীড়া সাংবাদিকতায় তথ্য সংগ্রহের অন্যতম হাতিয়ার সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার শুধু তথ্য সংগ্রহই করে না, সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে একটি সংবাদও তৈরি হতে পারে। ক্রীড়া প্রতিবেদককে অবশ্যই সাক্ষাৎকারের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে। আলোচ্য প্রবন্ধে ক্রীড়া প্রতিবেদনের সাক্ষাৎকারের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

ক্রীড়া প্রতিবেদনে সাক্ষাৎকার

ক্রীড়া প্রতিবেদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সাক্ষাৎকার। প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, অনলাইন মিডিয়ার যে কোনোটাই হোক না কেন, সাক্ষাৎকার তথ্য সংগ্রহের অন্যতম মাধ্যম। খেলা শেষে গৃহীত সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য যে কোনো সংবাদের চিত্রই বদলে দিতে পারে। পাঠকের চাহিদা ও সংবাদের ডেডলাইন বিবেচনা করে সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে। খেলার কিছু কিছু ঘটনার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারের বিকল্প কোনো কিছুই গণমাধ্যমের থাকে না। যে কারণে প্রত্যেক ক্রীড়া প্রতিবেদককেই সাক্ষাৎকার গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়।

সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য

সাক্ষাৎকার গ্রহণের কয়েকটি উদ্দেশ্য থাকে। প্রথমত, খেলার শুরুতে বা প্রথমার্ধে কী ঘটেছে, সে বিষয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা। এ ধরনের সাক্ষাৎকার দর্শকদের মনে উত্তেজনা তৈরি করে। উত্তেজনা হতে পারে প্রশান্তির কিংবা আশার। এ ধরনের সাক্ষাৎকার পড়ে বা দেখে ভালো অবস্থানে থাকা দলের সমর্থনকারীরা প্রশান্তি অনুভব করে। সেই সঙ্গে তুলনামূলক সমস্যার সম্মুখীন দলের সমর্থকরা আশা বাঁধতে থাকে। ক্রীড়া প্রতিবেদককে অবশ্যই এ দুটি বিষয়ে নজর রাখতে হবে। এ দ্বৈত উপস্থাপনা দর্শক-শ্রোতাদের যথেষ্ট বিনোদন দিতে পারে।

আরেক ধরনের উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়ে থাকে, সেটা হলো দলের সদস্যদের যেমন– খেলোয়াড়, সাবেক খেলোয়াড়, রেফারি বা আম্পায়ারকে প্রভাবিত করা।

সাক্ষাৎকারের সময় বিবেচ্য বিষয়

সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় প্রতিবেদককে বেশকিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়। পাঠক, দর্শক, শ্রোতা থেকে শুরু করে খেলোয়াড় এমনকি সংবাদের আউটলাইনও ঠিক করে দেয় সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় কোন কোন বিষয় বিবেচনা করা উচিত। ব্রাড স্কলৎজ সাক্ষাৎকার গ্রহণের বেশ কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে বলেন। বিষয়গুলো হলো (Schultz, 2005)–

১. শ্রোতা

শ্রোতাকে বিবেচনা করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়ে থাকে। প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক যে গণমাধ্যমই হোক না কেন, প্রতিবেদক পাঠকের চাহিদার বিষয়টি সবসময় মনে রাখবে। সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। তবে রেডিও কিংবা টেলিভিশনের ক্রীড়া সাক্ষাৎকার একটু ভিন্ন দৃষ্টি পেয়ে থাকে। বিশেষ করে গভীর রাতে প্রচারিত ক্রীড়া সাক্ষাৎকার 'এক্সক্লুসিভ' কিংবা 'সিরিয়াস জার্নালিজম' নিয়ে করতে নিষেধ করেছেন ইউনিভার্সিটি অব মিসিসিপির সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ব্রাড স্কলৎজ।

২. সম্মান

'সম্মান' যে কোনো পেশার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্রীড়া প্রতিবেদনের জন্য এটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। খেলোয়াড়রা ভালো খেলা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে বিশেষ সম্মান অর্জন করে থাকে, হয়ে উঠেন কিংবদন্তি। খেলোয়াড়, কোচ বা খেলা সংশ্লিষ্ট যে কোনো তারকা সম্পর্কে জনগণ জানতে চায় অধীর আগ্রহে। এসব সম্মানীয় ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা ক্রীড়া প্রতিবেদকের অন্যতম কাজ। এ ধরনের সাক্ষাৎকার ক্রীড়া প্রতিবেদনের পৃষ্ঠাকে উজ্জ্বল করে তোলে।

৩. নির্দিষ্ট প্রশ্ন

ক্রীড়া প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করার দক্ষতা রিপোর্টারের স্মার্টনেসের বহিঃপ্রকাশ। অনেক অভিজ্ঞ প্রতিবেদকও 'বোকা' প্রশ্ন করে ফেলেন। 'বোকা' প্রশ্ন বলতে একই ধরনের গতানুগতিক প্রশ্ন করাকে বোঝায়। এ ধরনের গতানুগতিক প্রশ্ন করলে খেলোয়াড় ও কোচ উভয়ই বিরক্ত অনুভব করেন। পাঠকের দৃষ্টিকোণেও এ ধরনের প্রশ্ন গুরুত্বহীন। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, বড়ো খেলার জন্য আপনি মানসিক শক্তি কোথা থেকে পেয়ে থাকেন? কোন ধরনের ভুলকে আপনি খেলায় পরাজয়ের মূল কারণ হিসেবে দেখছেন? এ ধরনের প্রশ্ন প্রায়ই খেলার শেষে করা হয়ে থাকে। গতানুগতিক এ প্রশ্নগুলো খেলোয়াড়, কোচ, পাঠক-দর্শক কেউই ভালোভাবে নেন না। যদিও আপনি এ ধরনের উত্তর নিতেই চান, তবে প্রশ্নটি ঘুরিয়ে করুন। যেমন, কোন ধরনের ভুলকে আপনি খেলায় পরাজয়ের মূল কারণ হিসেবে দেখছেন? এই প্রশ্নের বিপরীতে আপনি বলতে পারেন, ফল যা-ই হোক, আপনারা সর্বোচ্চটা দিয়ে খেলেছেন। তারপরও আজকের খেলা সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন। এভাবে প্রশ্ন করার মাধ্যম গতানুগতিক প্রশ্ন থেকে রিপোর্টার বেড়িয়ে আসতে পারেন। সেই সঙ্গে সাক্ষাৎকারদাতাও স্বাচ্ছন্দ্যে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন। যেখান থেকে তৈরি হতে পারে ভালো সংবাদ। তবে প্রতিবেদকের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো 'গোল্ডেন মোমেন্ট'। প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে সাক্ষাৎকারদাতা উত্তর প্রদান করলে প্রতিবেদক মুহূর্তের জন্য নিশ্চুপ থাকলে বা প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকলে তাকে 'গোল্ডেন মোমেন্ট' বলে। এই মুহূর্ত সাক্ষাৎকারদাতাকে কথা চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে। প্রতিবেদক গোল্ডেন মোমেন্ট থেকে অনেক অজানা তথ্য পেয়ে থাকেন।

৪. সংবাদ গল্পের আউটলাইন

সংবাদ গল্পের আউটলাইন হলো সংবাদের মূল কাঠামো। প্রতিবেদক কোনো প্রতিবেদন লেখার আগে লিখিত বা অলিখিত আউটলাইন তৈরি করে। এ আউটলাইন কাগজে-কলমে থাকতে পারে কিংবা রিপোর্টারের মস্তিষ্কে থাকতে পারে। প্রতিবেদক এ আউটলাইনের ভিত্তিতেই তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। গবেষণার ভাষায় এ ধরনের কল্পনাকে হাইপোথিসিস বলে থাকে। মূলত ঘটনা কী ঘটতে পারে বা কেমন হতে পারে, তার অনুমান করাই হাইপোথিসিস। সেরকম প্রতিবেদক তার লিখিত প্রতিবেদন নিয়েও এ ধরনের আউটলাইন করে থাকেন। আউটলাইন নির্ধারণ করে দেয় কী ধরনের তথ্য প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং কী ধরনের তথ্য প্রতিবেদনকে আরও মজবুত করে তুলবে। সে ধরনের তথ্য সংগ্রহের চিন্তা মাথায় নিয়েই প্রতিবেদক সাক্ষাৎকারদাতা ও সাক্ষাৎকার প্রশ্ন নির্ধারণ করবে। আউটলাইন হলো সংবাদের ব্লু প্রিন্ট। এই ব্লু প্রিন্ট তথ্য সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে এবং তথ্যের গুরুত্ব অনুসারে যে কোনো সময়ই পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।

৫. দৃশ্য

ক্রীড়া প্রতিবেদককে সর্বদা মাঠে থাকতে হয়। শুধু বসে থাকলেই চলে না। গতিশীল যোগাযোগের মধ্য দিয়ে তাকে চলতে হয়। সম্ভাব্য নতুন নতুন দৃষ্টিকোণের জন্য চোখ-কান সবসময় খোলা রাখতে হয়। এক মুহূর্তের ঘটনায় সংবাদের বিষয়বস্তু পরিবর্তন হয়ে গেছে, এরকম ডজন ডজন উদাহরণ রয়েছে। এজন্য প্রতিবেদককে সম্ভাব্য পরিবর্তনগুলো বিবেচনা করে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য সংরক্ষণ করতে হয়। পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটের জন্য প্রতিবেদককে সম্ভাব্য প্রস্তুতিও রাখতে হয়। পরিবর্তনশীল মুহূর্তে সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রশ্ন করার দক্ষতা প্রতিবেদকের থাকতে হবে। যদি কোনো ঘটনা নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন হয়, তাহলে প্রতিবেদকের উচিত সব ধরনের প্রস্তুতির কথা ভুলে গিয়ে নতুন পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা। খেলাধুলায় চূড়ান্ত কিছু মুহূর্তেরও অবতারণা ঘটে। শক্তি বা ক্ষমতা প্রয়োগের কারণে মাঝপথে খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়া বা স্থগিত হয়ে যাওয়ার ঘটনা, যা স্পষ্টভাবে সংবাদে নতুন মোড় নেবে। যদিও এধরনের ঘটনা খেলাধুলার ক্ষেত্রে খুবই কম ঘটে থাকে। তবুও গণমাধ্যম ও গণমাধ্যমকর্মীদের এ ঘটনাগুলোর সম্মুখীন হওয়ার দক্ষতা থাকতে হবে।

সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুতি

ক্যাথরিন টি. স্টোফার ও প্রমুখ স্পোর্টস জার্নালিজম গ্রন্থে ক্রীড়া প্রতিবেদকদের সাক্ষাৎকার বিষয়ে প্রস্তুতির জন্য কয়েকটি বিষয়ের কথা বলেন। বিষয়গুলো হলো (Stofer et al, 2010):

ক. সম্ভব হলে সাক্ষাৎকার ২৪ ঘণ্টা আগে নির্ধারণ করতে হবে।
খ. সাক্ষাৎকারদাতাকে সাক্ষাৎকারের বিষয় সম্পর্কে অবগত করতে হবে।
গ. ব্যক্তিগত তথ্যসূত্র থেকে কমপক্ষে পাঁচটি প্রশ্ন লিখে ফেলতে হবে।
ঘ. গবেষণা, গবেষণা, গবেষণা।
ঙ. টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করবেন, তবে অবশ্যই নোট নিবেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগে ক্রীড়া প্রতিবেদকের নাম্বার ওয়ান নিয়ম হলো হোমওয়ার্ক করা। যে যত বেশি হোমওয়ার্ক করবে, সে তত ভালো সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পারবে। সাক্ষাৎকারের বিষয় সম্পর্কে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাম্যক ধারণা প্রতিবেদকের থাকতে হবে। যে খেলার বিষয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন, সেই খেলার রেকর্ডগুলো সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে।

ক্রীড়া সাক্ষাৎকারের ধরন

ক্রীড়া সাক্ষাৎকারের অনেক ধরন রয়েছে। তবে প্রচলিত খেলাগুলোর ক্ষেত্রে যে ধরনগুলো বেশি কার্যকর, এখানে সেই ধরনগুলো উপস্থাপন করা হলো।

ক. ওয়ান-অন-ওয়ান সাক্ষাৎকার

প্রতিবেদক এবং শুধু সাক্ষাৎকারদাতা উপস্থিত থাকলে সেটিকে ওয়ান-অন-ওয়ান সাক্ষাৎকার বলে। ক্রীড়া প্রতিবেদকের জন্য এটা সবচেয়ে ভালো সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতি। কিন্তু এজন্য ক্রীড়া প্রতিবেদককে অনেক বেশি পরিশ্রম ও গবেষণা করতে হয়। যেহেতু প্রতিবেদক একাই প্রশ্ন করছে, তাই এখানে ভুল হওয়া যাবে না। প্রতিবেদকের অবশ্যই ভালো পরিকল্পনা থাকতে হবে। তবে এ ধরনের সাক্ষাৎকারে

প্রতিবেদক একটা এক্সক্লুসিভ সুবিধা পেয়ে থাকেন। সেটা হলো, এখানে কোনো প্রতিবেদক উপস্থিত থাকে না। তাই এ ধরনের সাক্ষাৎকার থেকে ব্রেকিং নিউজ অথবা স্কুপের মতো সংবাদ প্রতিবেদক পেতে পারেন। এমনকি সাক্ষাৎকারটি সাধারণ ফিচারেও রূপান্তরিত হতে পারে।

খ. ছোট দল ও খেলা-পরবর্তী সাক্ষাৎকার

খেলা-পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকরা ছোট দল হয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এখানে খেলোয়াড়রা নানামুখী প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। সেই সঙ্গে প্রতিবেদকরাও অস্থির সময় পার করেন। প্রথমত, তথ্য সংগ্রহ এবং দ্বিতীয়ত, ডেডলাইনের চাপ। ছোট থেকে মধ্যম দলের প্রতিবেদকরা নবিশ প্রতিবেদকদের ভয় দেখান বা আতঙ্কিত করে থাকেন। কিন্তু নবিশ প্রতিবেদকদের ভয় পেলে চলবে না। নবিশই হোক কিংবা অভিজ্ঞ প্রতিবেদকই হোক, তাকে অবশ্যই তথ্যের বিষয়ে উৎসাহিত হতে হবে। কিন্তু উত্তেজিত হওয়া যাবে না বরং শান্ত থাকতে হবে। বেশি প্রশ্ন করে প্রভাব বিস্তার করবেন না। আবার এমনও করবেন না যেন একই প্রতিবেদক সব প্রশ্ন করছেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় খেলোয়াড় থেকে খেলোয়াড় এবং দল থেকে দলে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। যত উৎস থেকে সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এ ধরনের অভিজ্ঞতা চাপপূর্ণ আবার সেই সঙ্গে উল্লাসজনকও বটে।

গ. সংবাদ সম্মেলন

সবচেয়ে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার হলো সংবাদ সম্মেলন। সংবাদ সম্মেলনে সংবাদসূত্র একদল সাংবাদিকদের সামনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তথ্য উপস্থাপন করে। তথ্য উপস্থাপিত হলে সাংবাদিকরা সূত্রকে নানা প্রশ্ন করেন। ছোট দলীয় সাক্ষাৎকারের চেয়ে সংবাদ সম্মেলন অনেক বেশি কাঠামোগত এবং সংগঠিত। সংবাদ সম্মেলনে সংবাদ সূত্রের নিয়ন্ত্রণ থাকে। এখানে প্রতিবেদকের কোনো নিয়ন্ত্রণই থাকে না। ক্রীড়াবিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে সাধারণত দলের কোচ, দলনেতা কিংবা দলের পক্ষ থেকে কোনো খেলোয়াড় তথ্য উপস্থাপন করে থাকেন। তথ্য উপস্থাপন হলে প্রতিবেদকরা বিভিন্ন প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে সংবাদের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে থাকেন। সংবাদ সম্মেলন কমপক্ষে পাঁচ মিনিট থেকে আধা ঘণ্টা কিংবা তারও বেশি সময় হয়ে থাকে। সময় নির্ভর করে সংবাদ সম্মেলনের বিষয়বস্তুর ওপর। কিছু কিছু সংবাদ সম্মেলনে সূত্র শুধু তথ্য উপস্থাপন করে, কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ প্রদান করে না। সংবাদ সম্মেলনের জন্য কিছু পরামর্শ:

- নির্ধারিত সময়ের আগেই সংবাদ সম্মেলনস্থলে পৌঁছান।
- সংবাদ সম্মেলনে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিন।
- সংবাদ সম্মেলনে তথ্য উপস্থাপন করতে করতে নির্ধারণ করে ফেলুন আপনি কী জিজ্ঞাসা করতে চাইছেন।
- সম্মেলনস্থলে প্রশ্ন দ্বারা অতিরিক্ত প্রভাব বিস্তার না করে পরিস্থিতিকে বিবেচনা করুন। প্রয়োজনে সম্মেলন শেষে সূত্রের একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করুন।

ঘ. ইলেকট্রনিক সাক্ষাৎকার

সরাসরি সাক্ষাৎকারের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অনেক সময় সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে। ইলেকট্রনিক সাক্ষাৎকারের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় সাক্ষাৎকার হলো টেলিফোন সাক্ষাৎকার। এ ধরনের সাক্ষাৎকারে ক্রীড়া প্রতিবেদক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন এবং তার প্রত্যুত্তর নিতে পারেন। সাক্ষাৎকারদাতার অবাচনিক চিহ্নগুলো বুঝতেও পারেন না। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে তাকে 'নিউজ টেলিকনফারেন্স' বলে। ইলেকট্রনিক সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে ক্রীড়া প্রতিবেদকের শেষ আশ্রয়স্থল হলো ইমেইলের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার। ইমেইল সাক্ষাৎকারে প্রতিবেদক একগুচ্ছ প্রশ্ন ইমেইলে পাঠিয়ে দেন এবং সূত্র প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর ইমেইলে প্রেরণ করে। ফলো-আপ প্রশ্নের কোনো সুযোগ ইমেইল সাক্ষাৎকারে নেই। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলে হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও যে কারো সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা যায়। আর এ সাক্ষাৎকার গ্রহণের অন্যতম অন্যতম উৎস হলো ইমেইল ও সামাজিক যোগাযোগ সাইট।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে উদ্বিগ্নতা কমানোর উপায়

সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় অনেক প্রতিবেদকই উদ্বিগ্নতায় ভোগেন। এই উদ্বিগ্নতা কমানোর বেশ কিছু উপায় রয়েছে। উপায়গুলো উপস্থাপন করা হলো।

- সাক্ষাৎকারের বিষয় নিয়ে গবেষণা করলে প্রতিবেদকের উদ্বিগ্নতা অনেক কমে যায়। বিষয়ের ওপর দখল প্রতিবেদককে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। সৃষ্ট আত্মবিশ্বাস সাক্ষাৎকার গ্রহণে প্রতিবেদকের উদ্বিগ্নতা কমিয়ে দেয়।
- প্রতিবেদক যে বিষয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন, সে বিষয়টি তাকে অবশ্যই ভালো করে বুঝতে হবে। না হলে প্রতিবেদকের মধ্যে সৃষ্ট দোদুল্যমানতা সাক্ষাৎকার গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করবে। দোদুল্যমানতা যেমন প্রতিবেদকের মনে উদ্বিগ্নতা তৈরি করে, তেমনি বিষয় সম্পর্কে প্রতিবেদকের ভালো বোঝাপড়া উদ্বিগ্নতা কমিয়ে ফেলে।
- ক্রীড়া প্রতিবেদক খেলা নিয়ে প্রতিবেদন করবেন, সেটাই স্বাভাবিক। খেলার নিয়ম ও ভাষা বোঝা ক্রীড়া প্রতিবেদকের জন্য বাধ্যতামূলক। তিনি যদি খেলার নিয়ম না জানেন, তাহলে সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় তিনি উদ্বিগ্নতায় ভুগবেন। তাই উদ্বিগ্নতা কমাতে ক্রীড়া প্রতিবেদককে অবশ্যই খেলার ভাষা জানতে হবে।
- চর্চা, চর্চা, চর্চা। সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগে প্রতিবেদক যত চর্চা করবেন, তিনি তত কম উদ্বিগ্নতায় ভুগবেন।

প্রশ্ন করার কৌশল

সাক্ষাৎকার গ্রহণের অন্যতম অস্ত্র হলো প্রশ্ন। ক্রীড়া প্রতিবেদক যদি সঠিক সময়ে সঠিক প্রশ্ন না করতে পারেন, তাহলে পুরো প্রতিবেদনই বিফলে যেতে পারে। প্রতিবেদকের মনে হতে পারে 'ইশ্' শব্দটি। সময়ের কাজ সময়ে না করলে একটি সম্ভাবনাময় প্রতিবেদন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতে পারে। এ কারণে ক্রীড়া প্রতিবেদককে সব সময় সজাগ থাকতে হয়। সতর্ক থাকতে হয় সব দৃষ্টিকোণের প্রশ্নের বিষয়ে। প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে এবং প্রশ্ন তৈরি করার ক্ষেত্রে ক্রীড়া প্রতিবেদক কী কী কৌশল অবলম্বন করতে পারেন, সে বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

ক. সঠিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা

ক্রীড়া প্রতিবেদন নয়, সব ধরনের প্রদিবেদনের ক্ষেত্রেই সঠিক প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মনে হতে পারে, সঠিক প্রশ্ন কী? সঠিক প্রশ্নের নির্দিষ্ট কোনো কাঠামো নেই। নেই কোনো সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব, বিষয়টি আপেক্ষিক। ক্রীড়া প্রতিবেদক কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, কোন বিষয়ে সংবাদ করছেন, তার ভিত্তিতেই নির্মিত হয় সঠিক প্রশ্ন। এক্ষেত্রে প্রতিবেদকের অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে।

খ. প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ওপর নির্ভর করে সাক্ষাৎকারটি সফলতার দিকে যাবে নাকি বিফলতায় পর্যবসিত হবে। ক্রীড়া প্রতিবেদককে আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে। ক্রীড়া প্রতিবেদক বলবেন অল্প; কিন্তু সঠিক বলবেন। তিনি বর্ণনা আকারে বলবেন না। যদি ক্রীড়া প্রতিবেদক বর্ণনাই দিয়ে ফেলেন, তাহলে সেটি হবে প্রতিবেদকের নিজস্ব মন্তব্য। খেলায় কী কী ভুল হয়েছে, সে বিষয়ে প্রতিবেদক কোচকে বর্ণনা দিতে পারেন না। যদি তিনি বর্ণনা দেন, তাহলে প্রতিবেদকের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো উত্তর কাম্য নয়। কারণ বর্ণনার প্রত্যুত্তরে কোনো উত্তর হয় না। যদি প্রতিবেদক বর্ণনা দিয়েই ফেলেন, তাহলে সেক্ষেত্রে খেলোয়াড় বা কোচ উত্তর দেন এভাবে, 'এটা বর্ণনা, অনুগ্রহ করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। পরবর্তী প্রশ্ন করুন।'

গ. খোলা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা

হ্যাঁ, না প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তো আপনি হ্যাঁ-না উত্তরই পাবেন। আপনার প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য কি এটা যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য? ক্রীড়া প্রতিবেদন লেখার সময় প্রয়োজন পড়ে খেলোয়াড় বা কোচের দীর্ঘ উত্তর। এ ধরনের উত্তরের জন্য প্রতিবেদককে খোলা প্রশ্ন করতে হবে। অথবা এমন ধরনের প্রশ্ন করতে হবে, যার মাধ্যমে সংবাদসূত্র মতামত বা ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে। সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে সংবাদসূত্র যে কোনো দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্তর দিতে পারে– এমন প্রশ্ন প্রতিবেদককে করতে হবে। প্রতিবেদক যেন সূত্রকে কাঠামোর মধ্যে বেঁধে না ফেলেন। সাক্ষাৎকারে এ ধরনের প্রশ্ন কাঠামোবিহীন প্রশ্ন হিসেবেও পরিচিত।

ঘ. প্রতিনিধিত্বকারী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন না

খোলা প্রশ্নে প্রতিবেদক স্বাধীনভাবে উত্তর দিতে পারেন। প্রতিনিধিত্বকারী প্রশ্ন ঠিক এর বিপরীত দিকে অবস্থান করে। প্রতিনিধিত্বকারী প্রশ্ন হলো সেই ধরনের প্রশ্ন, যা সংবাদসূত্রকে নির্দিষ্ট উত্তরের দিকে ধাবিত করে। বর্ণনা কিংবা মতামতের সম্মিলনে ক্রীড়া প্রতিবেদক এ ধরনের প্রশ্ন করে থাকেন। প্রতিনিধিত্বকারী প্রশ্নে প্রতিবেদক প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরের সূত্রও খেলোয়াড় বা কোচকে প্রদান করে থাকেন। এর মূল কারণ হলো, সূত্রের কাছ থেকে ওই বিষয়ে তার মতামত বা বর্ণনা গ্রহণ করা। প্রতিবেদক তার সংবাদের দৃষ্টিকোণকে সমর্থন করাতে এ ধরনের প্রশ্ন করে থাকেন।

ঙ. ফলো-আপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন

প্রতিবেদক সাধারণত কিছু সাজানোগোছানো প্রশ্ন নিয়ে যান। নির্দিষ্ট এ প্রশ্নগুলো করার সময় সংবাদসূত্র এমন কিছু উত্তর প্রদান করে, যা পরবর্তী আরেকটি প্রশ্নের জন্ম দেয়। এ ধরনের প্রশ্ন ফলো-আপ প্রশ্ন হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ক্রীড়া প্রতিবেদককে অবশ্যই ফলোআপ প্রশ্ন করার দক্ষতা থাকতে হবে। অনেক সময় একটি সাধারণ ফলো-আপ প্রশ্ন পুরো সাক্ষাৎকার এমনকি সংবাদের দৃষ্টিভঙ্গিই পরিবর্তন করে ফেলতে পারে। ফলোআপ প্রশ্ন দিয়ে অনেক সময় নতুন সংবাদও তৈরি হতে পারে।

তথ্যসূত্র

Schultz, Brad (2005). Sports Media: Planning, Production and Reporting. UK: Focal Press.

Stofer, T. Kathryn, Schaffer, James R, Rosenthal, Brian A (2010). Sports Journalism: An introduction to reporting and writing. New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

লেখক: প্রভাষক, পিআইবি

বাংলাদেশে ক্রীড়া সাংবাদিকতার মান বিকশিত হচ্ছে

— জাকারিয়া পিন্টু

> ১৯৭১ সালের ২৪ জুলাই নদীয়ার কৃষ্ণনগরের ম্যাচটির কথা বলতেই হয়। কৃষ্ণনগরের বিপক্ষে আমরা ম্যাচ খেলি। ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়। ... নদীয়ার প্রশাসক প্রথমে রাজি না হলেও পরে উড়িয়েছিলেন

ফুটবলে বাংলাদেশের বিরল রেকর্ড রয়েছে, যা বিশ্বের অন্য কোনো দেশের নেই। দেশ স্বাধীন করার পেছনে ফুটবল দলের অবদান আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ভারতে ১৬টি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে। প্রদর্শনী ম্যাচের প্রাপ্ত অর্থ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা তহবিলে দিয়ে সাহায্য করেছে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল। স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন জাকারিয়া পিন্টু। ১৯৫৭ সালে ইস্ট এন্ড ক্লাব দিয়ে ফুটবল ক্যারিয়ারের শুরু। ১৯৫৯-৬০এ খেলেছেন ওয়ান্ডারার্সে। এরপর প্রায় দেড় যুগ মোহামেডানের সাদা-কালো জার্সি গায়ে। তার অধীনে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ১৬ ম্যাচ খেলেছে। ১৯৭২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম ম্যাচ ঢাকা স্টেডিয়ামে। রাষ্ট্রপতি একাদশের বিপক্ষে মুজিবনগর একাদশের অধিনায়কও ছিলেন তিনি। স্বাধীনতার পর দেশের বাইরের প্রথম সফর আসামের গৌহাটিতে সর্বভারতীয় লোকপ্রিয় বরদৌলই টুর্নামেন্টে

ঢাকা একাদশেরও নেতৃত্ব দিয়েছেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে মারদেকা টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের প্রথম অধিনায়কও পিন্টু। তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় দলে খেলা বাঙালিদের জন্য বেশ কষ্টসাধ্য। মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান দলেও সুযোগ পেয়েছিলেন। ফুটবলার হিসেবে অনেক বড়ো উচ্চতায় তিনি। এরপরও তার সবচেয়ে বড়ো পরিচয়– স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক। খেলার পাশাপাশি লেখালেখিও করেছেন। জাতীয় প্রেস ক্লাব ও বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতির সদস্য। স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টুর সঙ্গে পিআইবির নিরীক্ষা'র পক্ষ থেকে দৈনিক সংবাদের ক্রীড়া সাংবাদিক **আরাফাত জোবায়ের** কথা বলেছেন স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ও ক্রীড়া সাংবাদিকতা নিয়ে।

নিরীক্ষা: স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ও জাকারিয়া পিন্টু নামটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের সেই দিনগুলোর কথা যদি বলতেন–
জাকারিয়া পিন্টু: সত্তরোউর্ধ্ব বয়স এখন আমার। সেই সময়ের কথা স্মরণ হলে ফিরে পাই তারুণ্য। ওই সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত চিরস্মরণীয়। তখন ফুটবল ছিল উপমহাদেশে জনপ্রিয় খেলা। আমরা ফুটবলাররাও ছিলাম জনপ্রিয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন আমরা ভাবলাম, দেশের মানুষ আমাদের এত ভালোবাসে, আমাদেরও তো দেশের জন্য করণীয় আছে। সেই ভাবনায় দেশের জন্য ফুটবলের মাধ্যমে লড়াই করেছি আমরা।

নিরীক্ষা: ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আপনারা অনেক ম্যাচ খেলেছেন। কোনো ম্যাচের বিশেষ কোনো ঘটনা বলবেন কি?
জাকারিয়া পিন্টু: প্রথম যে কোনো কিছুই বিশেষ। সেক্ষেত্রে ১৯৭১ সালের ২৪ জুলাই নদীয়ার কৃষ্ণনগরের ম্যাচটির কথা বলতেই হয়। কৃষ্ণনগরের বিপক্ষে আমরা ম্যাচ খেলি। ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়। ফলের চেয়ে বড়ো বিষয় ছিল, আমরা আমাদের দেশের পতাকা উড়াতে বলেছিলাম। নদীয়ার প্রশাসক প্রথমে রাজি না হলেও পরে উড়িয়েছিলেন। এজন্য শেষ পর্যন্ত তাকে সাসপেন্ড করা হয়। নদীয়ায় কৃষ্ণনগর অফিসিয়াল নাম দিয়ে খেলেছিল। প্রশাসক সাসপেন্ড হওয়ার পর অন্য জায়গার দলগুলো অফিসিয়াল নাম ব্যবহার করেনি। মোহনবাগান খেলেছিল গোস্টপাল একাদশ নামে।

নিরীক্ষা: ভারতে সারা পেয়েছিলেন কেমন?
জাকারিয়া পিন্টু: ভারতে যে ক'টি ম্যাচ খেলেছি, প্রতিটিতে সাড়া পেয়েছি। অনেক দর্শক ছিল। আমরা প্রতি জায়গাতেই বেশ আথিতেয়তা পেয়েছি।

নিরীক্ষা: নদীয়ায় যেমন তিক্ত ঘটনার অভিজ্ঞতা, মজার অভিজ্ঞতাও রয়েছে নিশ্চয়।
জাকারিয়া পিন্টু: মুম্বাইয়ে মহারাষ্ট্র একাদশের হয়ে খেলেছিলেন স্বয়ং নবাব মনসুর আলী খান পতৌদি (জনপ্রিয় অভিনেতা সাইফ আলী খানের বাবা)। আমাদের বিপক্ষে তিনি একটি গোলও করেছিলেন। সেই গোলটি এখনো আমার চোখে ভাসে। ওই ম্যাচ দেখতে দিলীপ কুমারও এসেছিলেন। এক লাখ রুপি দেন আমাদের দলকে।

নিরীক্ষা: প্র্যাকটিস ও আবাসন নিয়ে যদি কিছু বলেন...।
জাকারিয়া পিন্টু: কলকাতার পার্ক সার্কাস এভিনিউয়ের কোকো-কোলা বিল্ডিংয়ের দোতলায় থাকতাম। পাশেই মাঠ ছিল। ওখানে অনুশীলন করতাম। আমাদের কোচ ছিলেন প্রখ্যাত রেফারি ননী বসাক (চিত্রনায়িকা শবনমের বাবা)। এক শহর থেকে আরেক শহরে গিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতাও হয়েছে।

নিরীক্ষা: সেই অভিজ্ঞতাগুলো একটু যদি বলতেন...।
জাকারিয়া পিন্টু: বিহার যাচ্ছিলাম ট্রেনে। হঠাৎ ট্রেন এক জায়গায় থামল। মুহূর্তের মধ্যে দরজা ধাক্কাধাক্কি। ৫০-৬০ জনের দলটা ইনকিলাব জিন্দবাদ বলে স্লোগান দিচ্ছে। ভয়ে জানালা বন্ধ করে দেই। কীভাবে যেন ওরা ঢুকে পড়ল বগিতে। ওই লোকগুলোর শরীর থেকে বের হচ্ছিল দুর্গন্ধ। এক-দুই স্টেশন পরে দলটি নেমে পড়ল। তাদের নাকি কী একটা জমায়েত ছিল। ওরা যাওয়ার পর দেখা গেল, সালাউদ্দিনের স্যান্ডেল হাওয়া। এনায়েতের ব্যাগ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে আমরা বাঁচলাম। যাক বাবা, বড়ো লোকসান তো হয়নি! প্রতাপ খুব রাগ হয়েছিল দরজা খোলায়। ও বারবার না করেছিল। আমাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন গিয়ে দরজাটা খুলে দেয় আর বানের পানির মতো লোক ঢুকে গেল ট্রেনের কামরায়। স্টেশনে পৌঁছার পর আরেক অভিজ্ঞতার শিকার। বিহারিরা বলছিল, 'তোমরা বিহারিদের মেরেছ, কাজেই তোমাদের শহরে যেতে দেব না আমরা।' আমরা কোনো গোল করতে পারব না ম্যাচে, এই শর্তে যেতে দিল অবশেষে। সালাহউদ্দিন দুর্দান্ত এক গোল করে বসল। এরপর তো প্রায় লঙ্কাকাণ্ড। ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বাধীন বাংলা দলের ওপর। রাম দা নিয়ে সবাই মাঠে নামল আক্রমণ করতে। সামনে পেলে মেরেও ফেলতে পারত! উপায় না দেখে জার্সি খুলে দৌড়ালাম। পুলিশ অবশ্য সহায়তা করেছিল।

নিরীক্ষা: মুক্তিযুদ্ধ ও দেশ স্বাধীনের পেছনে আপনাদের অনেক অবদান। দেশ স্বাধীনের পর স্বীকৃতি কেমন পেলেন?
জাকারিয়া পিন্টু: ব্যক্তিগতভাবে আমি দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক 'স্বাধীনতা পদক' পুরস্কার পেয়েছি। জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারও পেয়েছি। স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে ক্রীড়া পুরস্কার ও স্বাধীনতা পদক (ক্রীড়া ক্ষেত্রে) পেলেও দলগতভাবে আমাদের তেমন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। সালাহউদ্দিন বাফুফে সভাপতি হওয়ার পর ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে একটা সংবর্ধনা দিয়েছিল দলকে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলকে একটা মাসিক ভাতা দেয়। স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অনেক সদস্য পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। যারা আছি, তারা যদি একটা রাষ্ট্রীয় সম্মান পেতাম, তাহলে শেষ জীবনে তৃপ্তি পেতাম।

নিরীক্ষা: কিছু দিন আগে ফিফা থেকে আপনাদের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এটা তো বিশেষ গর্বের।
জাকারিয়া পিন্টু: স্বাধীন বাংলা দলকে ফিফা বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়ায় আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশ্বফুটবলের জন্যও এটা বড়ো ইতিহাস।

নিরীক্ষা: পাঁচ দশকের বেশি সময় ফুটবলের সঙ্গে রয়েছেন। অনেক বিশ্বকাপই দেখেছেন। রাশিয়া বিশ্বকাপ সম্পর্কে আপনার পর্যবেক্ষণ কী?
জাকারিয়া পিন্টু: রাশিয়া বিশ্বকাপ আমার কাছে সেই অর্থে ভালো লাগেনি। কয়েকটি ম্যাচ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হলেও রেফারিংটা ভালো লাগেনি। বিশ্বকাপ মানের রেফারিং হয়নি।

নিরীক্ষা: রাশিয়া বিশ্বকাপ আয়োজন সম্পর্কে কী বলবেন?
জাকারিয়া পিন্টু: রাশিয়ার সেরা ফুটবলার লেভ ইয়াসিন। লেভ ইয়াসিনকে তারা সেভাবে স্মরণ করেনি মনে হয়েছে। এতগুলো স্টেডিয়াম। একটি স্টেডিয়ামের নাম বা একটি গ্যালারিও তার নামে নেই। লেভ ইয়াসিন সর্বকালের সেরা গোলরক্ষকদের একজন। রাশিয়া আতিথেয়তা দিয়েছে অনেক। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে, লেভ ইয়াসিনকে পর্যাপ্ত সম্মান দেখায়নি।

নিরীক্ষা: বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেলে না। কিন্তু বিশ্বকাপের সময় বাংলাদেশে এত উন্মাদনা, যা আয়োজক দেশেও দেখা যায় না। এ ব্যাপারে আপনার ভাবনা কী?
জাকারিয়া পিন্টু: আমরা ক্রীড়ামোদি জাতি। ফুটবল আমাদের প্রাণের খেলা। মানুষ ফুটবল ভালোবাসে। বাংলাদেশ ফুটবল র‍্যাংকিংয়ের তলানিতে। গত দেড় বছরে বাংলাদেশ তেমন খেলার সুযোগই পায়নি। নিজের দলকে সমর্থন করার সুযোগ না পেলেও ফুটবলপ্রেমীরা বিশ্বকাপে নিজেদের ফুটবলের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করে।

নিরীক্ষা: ফুটবলের প্রতি মানুষের এত ভালোবাসা-নিবেদন। এরপরও বাংলাদেশের ফুটবল পিছিয়ে। সাবেক ফুটবলার ও সংগঠক হিসেবে আপনার দৃষ্টিতে এর কারণ?
জাকারিয়া পিন্টু: সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব। পরিকল্পনা সঠিক থাকতে হবে। বাফুফেকে সঠিক ও বাস্তবিক লক্ষ্য নিয়ে এগোতে হবে। সরাসরি বিশ্বকাপ খেলার চিন্তা না করে সাফ, এশিয়া কাপ নিয়ে ভাবা উচিত। সেপ্টেম্বরেই দেশের মাটিতে সাফ। বাংলাদেশ প্রস্তুতি নিচ্ছে। আশা করি, ফুটবলপ্রেমীদের ভালো কিছু দিতে পারবে বর্তমান ফুটবলাররা।

নিরীক্ষা: আপনি প্রেস ক্লাবের সদস্য, ক্রীড়া নিয়ে লেখালেখিও করেছেন অনেক। বাংলাদেশের ক্রীড়া সাংবাদিকতার মান ও বিশ্বকাপে কাভারেজ সম্পর্কে কী বলবেন?

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের খেলোয়াড়রা

জাকারিয়া পিন্টু: বাংলাদেশের ক্রীড়া সাংবাদিকতার মান বেড়েছে অনেক। এ বিশ্বকাপে পত্রিকা, টিভিগুলো খুবই ভালো কাভারেজ দিয়েছে। মাঠের ঘটনা ছাড়াও অনেক কিছুই জেনেছি পত্রিকাগুলোর মাধ্যমে। মাঠের বাইরে অনেক ঘটনা জেনেছি।

নিরীক্ষা: আপনারা যখন খেলতেন, তখনকার সাংবাদিকতার অবস্থা আর এখনকার অবস্থার একটু বিশ্লেষণ করবেন?
জাকারিয়া পিন্টু: তখন খেলার সংবাদ ছাপা হতো এক কলাম কয়েক ইঞ্চির মধ্যে। আস্তে আস্তে সেটা বাড়ে। এখন তো অনেক পত্রিকায় খেলার পাতা দুইটি। বাংলাদেশের ক্রীড়া সাংবাদিকতা অনেক বিকশিত হয়েছে। ক্রীড়া সাংবাদিকতার মানও বিকশিত হচ্ছে। ক্রীড়া সাংবাদিকতার বিষয় বলতে গেলে আমার বন্ধু মুহাম্মদ কামরুজ্জামানের কথা বলতেই হবে। ক্রীড়া সাংবাদিকতার এই উৎকর্ষতার পেছনে ওর অবদান অনেক।

নিরীক্ষা: মুহাম্মদ কামরুজ্জামানকে ক্রীড়া সাংবাদিকতার প্রথিকৃৎ বলা হয়। আর আপনি স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক। দুই বন্ধুর এমন স্বীকৃতি কেমন লাগে?
জাকারিয়া পিন্টু: স্বাধীন বাংলা ফুটবলর দলের অধিনায়ক, এটা আমার গর্ব। বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড, গোলের রেকর্ড, অধিনায়কত্বসহ অনেক রেকর্ড গড়তে পারে আবার ভেঙেও যাবে সময়ের বিবর্তনে। তবে আমার রেকর্ড থাকবে আজীবন, যতদিন পৃথিবী ও বাংলাদেশ থাকবে। শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বফুটবলেও এটা বিরল কৃতিত্ব। দেশের স্বাধীনতার জন্য কোনো ফুটবল দল গঠন। ফিফাও কিছুদিন আগে আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। জামান (কামরুজ্জামান) আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবন, খেলোয়াড়ি জীবন, সংগঠক জীবন– আমার জীবনের সর্বস্তরেই ও রয়েছে।

নিরীক্ষা: আপনাদের সময় জাতীয় দলের প্রায় সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। সবাই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। বর্তমান ফুটবলারদের মধ্যে শিক্ষার হারটা কম। এটা কীভাবে দেখেন?
জাকারিয়া পিন্টু: শিক্ষা অনেক বড়ো বিষয়। একাডেমিক শিক্ষা থাকলে ফুটবলারদের ক্যারিয়ারের অনেক বিষয় সহজ হয়ে যায়। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা খেলা ছাড়ার পর আরো বোঝা যাবে। সমাজে চলাফেরা, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত– এসব ক্ষেত্রে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

নিরীক্ষা: বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) সম্পর্কে কিছু বলুন।
জাকারিয়া পিন্টু: আমি ফুটবলার হলেও সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পিআইবি সাংবাদিকতার মানোন্নয়নে কাজ করছে। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ খুবই কার্যকরী। ক্রীড়া সাংবাদিকতায় অনেক তরুণ আসছে। পিআইবির কাছে ছোট্ট অনুরোধ, বাংলাদেশ ক্রীড়াক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। ক্রীড়া সাংবাদিকতাও বিকশিত হচ্ছে। ক্রীড়া সাংবাদিকতা নিয়ে আলাদা ট্রেনিংয়ের আয়োজন করতে পারে। সাংবাদিকতার জ্ঞানের পাশাপাশি সেই ট্রেনিংয়ে সাবেক ফুটবলার, ক্রিকেটার, অন্য ডিসিপ্লিনের খেলোয়াড়দের নিয়ে খেলাধুলা সম্পর্কে ধারণা দিলে নবীনদের ভিত্তি পোক্ত হবে। সর্বোপরি পিআইবির সাফল্য কামনা করি। এর পাশাপাশি আরেকটি অনুরোধ করতে চাই সরকার ও বিশেষ করে তথ্য মন্ত্রণালয়কে, বাংলাদেশের ফুটবল এবং ক্রীড়াক্ষেত্রের বিভিন্ন ইতিহাস যেন সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ আকারে একটি বই করা হয়। কিছু দিন আগে একজন সাংবাদিক (মাসুদ আলম) ব্যক্তিগত উদ্যোগে দেশের ১০০ ফুটবলারের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে বই করেছেন। সরকার যদি ক্রীড়াঙ্গনের ইতিহাস রক্ষা করতে উদ্যোগী হয়, তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম আরো ক্রীড়াবান্ধব হবে।
নিরীক্ষা: সময় দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
জাকারিয়া পিন্টু: আপনাকেও ধন্যবাদ।

আগের চেয়ে ক্রিকেট এখন অনেক সহজ

—শফিকুল হক হীরা

> সেরা অধিনায়ক মাশরাফি মুর্তজা। অধিনায়কত্ব করার মতো মাশরাফির সব ধরনের ক্ষমতা রয়েছে। ... বিশেষ করে দলকে উদ্দীপ্ত করতে তার জুড়ি নেই। বাংলাদেশের অধিকাংশ বড়ো সাফল্যও এসেছে তার হাত ধরেই

শফিকুল হক হীরা। বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক। ছিলেন উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। ১৯৮৫ সালে খেলোয়াড় জীবন থেকে অবসর নেন। খেলোয়াড় জীবন থেকে বিদায় নিলেও এখনও ক্রিকেটের সঙ্গেই আছেন তিনি। বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ জাতীয় দলের ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেছেন। নারী ক্রিকেট দলেরও ম্যানেজার ছিলেন। এছাড়া বিসিবির টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য শফিকুল হক। শুরু থেকে বাংলাদেশ দল কীভাবে তিল তিল করে এগিয়েছে– সবই তিনি কাছ থেকে দেখেছেন। তার ধারণা, আগের চেয়ে ক্রিকেট এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। বাংলাদেশের উন্নতির গ্রাফটা বজায় রাখার জন্য পাইপলাইন তৈরির দিকে মন দিতে বললেন এই সাবেক অধিনায়ক। ক্রিকেটের সামগ্রিক বিষয় নিয়ে পিআইবি নিরীক্ষা'র পক্ষ থেকে শফিকুল হক হীরার সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন দৈনিক যুগান্তরের স্পোর্টস রিপোর্টার **জ্যোতির্ময় মণ্ডল**।

নিরীক্ষা: বাংলাদেশের বর্তমান ক্রিকেটের অবস্থা কী?

শফিকুল হক হীরা: বাংলাদেশের বর্তমান দলটির বেশ কয়েকজন সিনিয়র ক্রিকেটার একসঙ্গে খেলছে। তাদের মধ্যে বোঝাপড়াটা যখন ভালো থাকে, তখন দলও সাফল্য পায়। সর্বশেষ বিদায়ী কোচ চন্ডিকা হাথুরুসিংহে বাংলাদেশকে হয়তো বেশ কিছু সাফল্য এনে দিয়েছেন; কিন্তু একটা দল হিসেবে গড়ে তুলতে পারেননি তিনি। যেখানে যেভাবে সাময়িকভাবে কাজে লাগিয়ে সাফল্য পাওয়া যায়, সেভাবেই খেলানোর চেষ্টা করেছেন। টেস্ট কিংবা সংক্ষিপ্ত ফরম্যাট কোনো জায়গাতেই ব্যাটিং অর্ডার ঠিকমতো দাঁড় করাতে পারেননি তিনি। তাঁর সময়ে খেলা সৌম্য সরকার, তাসকিন আহমেদরা আজ আলোচনার বাইরে চলে যাচ্ছে। একজনকে দিয়ে একবার ওপেন করিয়ে পরের ম্যাচে তাকে আবার সাতে খেলিয়েছেন। চন্ডিকা চলে যাওয়ার পর বাংলাদেশ দলের কোচ ছিল না। এখন নতুন কোচ এসেছেন। তার সাপোর্টিং স্টাফদের নিয়ে তিনি বাংলাদেশকে বুঝে হয়তো সামনে এগোনোর চেষ্টা করবেন। কোচ হিসেবে ডেভ হোয়াটমোর-জেমি সিডন্সই যা একটু দল হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলেন বাংলাদেশকে। কিছুটা সফলও হয়েছিলেন তারা। বাংলাদেশ দলে এখন যারা খেলছে, তাদের সক্ষমতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। তবে ভয়ের ব্যাপার হলো, পাইপলাইন মোটেও শক্ত নয়।

নিরীক্ষা: আপনাদের সময়ের সঙ্গে এখনকার সময়ের ক্রিকেটে পার্থক্যটা কোথায়?

শফিকুল হক হীরা: অনেক অনেক পার্থক্য। আমার শুরুতে লড়াইটা করতে হতো পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে। তখন বাঘাবাঘা সব বোলার, ব্যাটসম্যান ছিল। তখন যে কয়েকটি ট্রফি হতো, সেগুলোর মান খুবই উঁচুতে ছিল। পেসারদের সামলাতে বুকের পাটা থাকা লাগত। এখন সেই মানের পেসারই তো নেই। ঘাসের উইকেটে খেলা হতো। হেলমেট বা অন্য সুবিধাগুলো এখনকার মতো আধুনিক ছিল না। ব্যাটসম্যানদের বলা হতো কভার ড্রাইভ খেলতে, মানে মাটি থেকে চার আঙুলও বল উপরে উঠবে না। এমন কিছু জিনিস ছিল যেগুলো ক্রিকেটকে আসলেই সুন্দর করে তোলে। এককথায়, তখন অনেক কঠিন ছিল।

নিরীক্ষা: বাংলাদেশ দলের শতভাগ পারফরম্যান্স কীভাবে বের করা যায়?

শফিকুল হক হীরা: শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে হবে সবাইকে। দলের মধ্যে এমন একজন ম্যানেজারের থাকা দরকার, যিনি সব সময় খেলোয়াড়দের ব্যাপারে অবগত থাকবেন। একজন খেলোয়াড় কোথায় যাচ্ছে, কী খাচ্ছে, অনিয়ম করছে কি না। খেলোয়াড়দের দায়িত্বটা কী, সেটা ঠিকমতো বুঝিয়ে দেওয়া সবাইকে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

নিরীক্ষা: বাংলাদেশ ক্রিকেটের পাইপলাইন ঠিক থাকছে না কেন?

শফিকুল হক হীরা: পাইপলাইন ঠিক রাখতে হলে 'এ' দলের বেশি বেশি ম্যাচ খেলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বয়সভিত্তিক দলগুলোকে সবসময়ই অন্য দেশের বিপক্ষে খেলা নিয়ে ব্যস্ত রাখা জরুরি। বেশি করে ম্যাচ না খেললে হঠাৎ করেই বড়ো মঞ্চের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে না। আমাদের তো 'এ' দলের ম্যাচই হয় না। তাহলে পাইপলাইন ঠিক থাকবে কীভাবে। এছাড়া ঘরোয়া ক্রিকেট একটা বড়ো সমস্যা। ঘরোয়া ক্রিকেটে এমন ধরনের উইকেট তৈরি করা হয়, যেখানে ব্যাটসম্যানরা অনেক রান করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ম্যাচে গেলে সেটা করতে পারে না। এছাড়া উইকেটগুলোর স্পিনারদের জন্য সহায়তা থাকে। তাই পেসাররা নিজেদের সম্পর্কে ঠিক ধারণা রাখতে পারে না।

নিরীক্ষা: টেস্ট ক্রিকেটে আমরা আসলেই কতটা এগিয়েছি?

শফিকুল হক হিরা: টেস্টে আমরা আবার এগোলাম কোথায়? টেস্টই তো শিখতে পারিনি। টেস্টের ধরন কী, সেটাই বুঝতে পারছি না। একজন সত্যিকারের টেস্ট বোলার বা টেস্ট ব্যাটসম্যানই এখনও তৈরি করতে পারেনি বাংলাদেশ। টেস্ট মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য যেসব কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া উচিত ছিল, সেগুলো আসলেই ঠিক নেই বোধহয়।

নিরীক্ষা: আপনার চোখে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সেরা উইকেটকিপার কে?

শফিকুল হক হীরা: আমার চোখে এখন পর্যন্ত একনম্বরে থাকবে পাইলট (খালেদ মাসুদ)। উইকেটকিপার হিসেবে যেসব গুণাবলি থাকা দরকার, তার মধ্যে সবকিছুই ছিল। ব্যাটিংয়ে সে অনেক সময়ই দলকে টেনে তুলেছে।

নিরীক্ষা: একজন ভালো উইকেটকিপার হতে গেলে সবচেয়ে বেশি কী প্রয়োজন?

শফিকুল হক হীরা: মুভমেন্ট। নড়াচড়া খুবই প্রয়োজন। বলের ধরন বুঝতে হবে। বোলারের হাতের দিকে খেয়াল করতে হবে। বলের গতি অনুযায়ী দ্রুত নিজেকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। আর যারা স্পিনটা ভালো বোঝে, তাদের জন্য কিপিং সহজ হয়ে যায়। বলটা কতটা টার্ন করবে বা লাফাতে পারে, সে অনুযায়ী গ্লাভসটাও সেখানে নিয়ে যেতে হবে। দৃষ্টি সবসময় ঠিক রাখতে হবে।

নিরীক্ষা: আপনার সময় থেকে এখন পর্যন্ত সেরা ব্যাটসম্যান কে?

শফিকুল হক হীরা: এখনকার প্রধান নির্বাচক। মানে মিনহাজুল আবেদিন নান্নু। তার মতো কাউকে দেখি না। অসাধারণ তার ব্যাটিং ক্ষমতা ছিল। আমি দুইয়ে রাখতে চাই আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে। তৃতীয় স্থানে রাখব মুশফিকুর রহিমকে। ব্যাটসম্যান হিসেবে মুশফিকের সেই প্যাশনটাও আছে।

নিরীক্ষা: এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের পেস বোলার হিসেবে কে সেরা?

শফিকুল হক হীরা: আমার চোখে সেরা পেসার দৌলত-উজ-জামান। দারুণ পেসার। পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েও সে তার প্রতিভা দেখিয়েছে। পেস ও ভ্যারিয়েশন ছিল খুবই ভালো। এরপর পেস অলরাওন্ডার হিসেবে এগিয়ে রাখব জাহাঙ্গীর শাহ বাদশাকে। তিনে থাকবে বর্তমান ওয়ানডে অধিনায়ক মাশরাফি মুর্তজা।

নিরীক্ষা: আপনার চোখে বাংলাদেশের সেরা অধিনায়ক কে?

শফিকুল হক হীরা: সেরা অধিনায়ক মাশরাফি মুর্তজা। অধিনায়কত্ব করার মতো মাশরাফির সব ধরনের ক্ষমতা রয়েছে। সবাইকে সে সম্মান দিতে জানে। দলের জুনিয়র ও সিনিয়রদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে, সেটাও তার জানা। বিশেষ করে দলকে উদ্দীপ্ত করতে তার জুড়ি নেই। বাংলাদেশের অধিকাংশ বড়ো সাফল্যও এসেছে তার হাত ধরেই।

নিরীক্ষা: আপনি বাংলাদেশ দলের ম্যানেজারের দায়িত্বও পালন করেছেন। দলে কেন একজন ম্যানেজারের প্রয়োজন হয়?

শফিকুল হক হীরা: একজন ম্যানেজারের দায়িত্ব দলের সব খেলোয়াড় ও দিনের কর্মকাণ্ড জানা। সব খেলোয়াড়কে সেটা সময়মতো অবহিত করা। খেলোয়াড়দের কোনো সমস্যা আছে কি না বা তারা নিয়মের বাইরে চলাফেরা করছে কি না, সেটা দেখাশোনা করা। সবমিলিয়ে দলের সব অবস্থা জানা এবং সে মতোই ম্যানেজমেন্টকে কাজে সহযোগিতা করা।

নিরীক্ষা: সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

শফিকুল হক হীরা: আপনাকেও ধন্যবাদ।

আমাদের খেলোয়াড়রা জন্মগতভাবেই মেধাবী

— দিলু খন্দকার

দিলু খন্দকার। বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের স্পোর্টস এডিটর। ৩৫ বছরের সাংবাদিকতা জীবনের পুরোটা জুড়েই স্পোর্টসের বর্ণিল অভিজ্ঞতা। কিংবদন্তি ফুটবলার দিয়াগো ম্যারাডোনার সাক্ষাৎ পেতে স্ত্রীর গয়না বন্দক রেখে ১৯৯৪-এর বিশ্বকাপ ফুটবল কাভার করতে পাড়ি জমিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে। ফুটবলের প্রতি তার অদম্য আগ্রহ। কিন্তু বাংলাদেশ কেন ক্রিকেটের মতো ফুটবল বিশ্বকাপে খেলতে পারে না? বাংলাদেশের ফুটবলের সংকট এবং সম্ভাবনাই বা কতটুকু? নিরীক্ষার পক্ষ থেকে দিলু খন্দকারের সঙ্গে কথা বলে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের সাংবাদিক **আমীন আল রশীদ**

> সার্জেই আমাকে ম্যারাডোনার খুব কাছে নিয়ে গেল। আমি তার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলাম। আমার স্বপ্নের নায়ক; যার জন্য সাংবাদিক হয়েছি। ... আমি ওইদিন আর হাতে পানি স্পর্শ করিনি। যে হাত দিয়ে আমি দিয়াগোকে স্পর্শ করেছি, ভেবেছি সেই গন্ধটা থাকুক

নিরীক্ষা: দিলু ভাই, এবারের বিশ্বকাপ নিয়েই শুরু করা যাক।

দিলু খন্দকার: হ্যাঁ, এবার রাশিয়া নিয়ে ৬ নম্বর বিশ্বকাপ ফুটবল দেখার অভিজ্ঞতা হলো। এবার তিনটি ম্যাচের টিকিট নিয়েছিলাম। কিন্তু দুটি দেখে চলে এসেছি।

অফিসের কাজের চাপ বেশি ছিল। ফলে বেশিদিন আর থাকিনি। আগের পাঁচবার গিয়েছিলাম সাংবাদিক হিসেবে। এবার দর্শক হিসেবে।

নিরীক্ষা: প্রথমবারের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

দিলু খন্দকার: এভাবে বলা যায় যে, আমি সাংবাদিক হয়েছিলাম বিশ্বকাপ ফুটবল কাভার করব বলেই। মাঠে বসে খেলা দেখব। প্রেস বক্সে বসে রিপোর্ট লিখব। এ ইচ্ছা ছিল আমার ভীষণ। বড়ো বড়ো আসরে বাংলাদেশি রিপোর্টার হয়ে কাভার করতে যাব, সেটা ফুটবল হোক, ক্রিকেট হোক আর অলিম্পিক হোক।

নিরীক্ষা: আপনিই তো বিশ্বকাপ ফুটবল কাভার করতে গেলেন ১৯৯৪ সালে এবং তখন কাজ করতেন দৈনিক ইত্তেফাকে।

দিলু খন্দকার: হ্যাঁ। তখন বাংলাদেশ থেকে খুব বেশি সাংবাদিক বিশ্বকাপ কাভার করতে যেতেন না।

নিরীক্ষা: আপনার জানা মতে বাংলাদেশের কোন সাংবাদিক প্রথম বিশ্বকাপ কাভার করেন?

দিলু খন্দকার: মতিউর রহমান চৌধুরী। এখন দৈনিক মানবজমিনের সম্পাদক। মতি ভাই তখন ইত্তেফাকের কূটনৈতিক সাংবাদিক। ১৯৯০ সালে তিনি ইতালি বিশ্বকাপ কাভার করতে যান। ওই সময়ে আমি ছিলাম নেদারল্যান্ডসে, আইসিসি ট্রফি কাভার করতে। অনেক চেষ্টা করেছিলাম সেখান থেকে ইতালির ভিসা নিয়ে বিশ্বকাপ কাভার করতে যাব। কিন্তু ভিসা নিতে পারিনি।

নিরীক্ষা: বিশ্বকাপ আসরে প্রথমে গ্যালারিতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা মনে আছে?

দিলু খন্দকার: অবশ্যই মনে আছে। এখানে বলে রাখি, ১৯৯৪ সালে বিশ্বকাপ কাভার করার জন্য বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনে মাত্র চারজন সাংবাদিকের জন্য অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড এসেছিল। ২৯ ডিসেম্বর আমার হাতে একটি ফরম দেওয়া হয়। আমি অনেকদিন ধরে নক করছিলাম। ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি শেখ আকমল হোসেন ২৯ ডিসেম্বর রাত ১০টার দিকে আমার হাতে যখন ফরমটা দিলেন, সেখানে দেখা গেল, ৩১ ডিসেম্বর এটি জমা দেওয়ার শেষদিন। ফরমে লেখা ছিল, কোনো সুনির্দিষ্ট টিমকে আমি ফলো করব কি না? আমি লিখলাম, আর্জেন্টিনা টিমের খেলা আমি ফলো করব এবং দিয়াগো ম্যারাডোনার সাক্ষাৎকার নিতে চাই। ম্যারাডোনার সঙ্গে কথা বলার বিষয়টি আমি বিশেষ নোটে লিখলাম। কিন্তু এটা যারাই দেখেছ তারা বিস্মিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের একজন সাংবাদিক বিশ্বের সেরা ফুটবলারের সঙ্গে কথা বলতে চায়। অনেকে উপহাস করল। তবে আমি ধন্যবাদ দিই ইত্তেফাককে। তারা আমাকে বেশ সাহস ও সহযোগিতা দিয়েছে। গোলাম সারোয়ার তখন নিউজ এডিটর। বললেন, যাও দিলু, তোমার বিশ্বকাপ মিশন শুরু।

নিরীক্ষা: তার মানে আপনি যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করলেন...।

দিলু খন্দকার: আমি অ্যাডামেন্ট ছিলাম যে যাবই। কিন্তু সমস্যা হলো আমি যেহেতু এর আগে কখনো আমেরিকায় যাইনি এবং বিশ্বকাপ কাভারের অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই ঠিক বুঝতে পারছিলাম না আমার আসলে কত টাকা লাগবে? খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। আবার যুক্তরাষ্ট্রে খালার সঙ্গে কথা বললাম। তিনি আমাকে বললেন, দিলু টাকা-পয়সা নিয়ে চিন্তা করো না। আমরা আছি। কিন্তু তারপরও আমার টেনশন দূর হয় না। তখন স্ত্রীর সঙ্গে কথা বললাম। এর দুই বছর আগেই আমি বিয়ে করি। আমার স্ত্রী তার গয়নাগুলো আমাকে দিয়ে বলল, এটা কোথাও রেখে তুমি টাকা জোগাড় করো। স্ত্রীর এই স্যাক্রিফাইস কোনোদিন শোধ হওয়ার নয়। গয়নাগুলো বন্দক রেখে অনেক টাকা পেলাম। তারপর বিমানবন্দরে যখন আমাকে সবাই বিদায় দিতে গেল, সে এক অন্যরকম অনুভূতি। কারণ লোকে আমেরিকা যায় পয়সা কামাতে। জীবন নতুন করে শুরু করতে। কিন্তু আমি যাচ্ছি ম্যারাডোনার সাক্ষাৎ পেতে। এটা বলতে পার যে একটা স্বপ্নের মতো।

নিরীক্ষা: তারপর আপনি যুক্তরাষ্ট্রে গেলেন এবং বিশ্বকাপ খেলা দেখলেন...

দিলু খন্দকার: প্রথম খেলাটা কাভার করি শিকাগোতে জার্মানি-বলিভিয়া ম্যাচ। শিকাগোতে পরদিন সকালে খেলা। আমি আর আমার এক কাজিন সারা রাত শিকাগো শহর ঘুরলাম। বললাম, ঘুমিয়ে কী হবে? আগে শহরটা দেখি। পরদিন সকালে মাঠে গেলাম। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন আসবেন। নিরাপত্তায় খুবই কড়াকড়ি। তো প্রেস বক্সে বসলাম। প্রচণ্ড রোদের ভেতরে খেলা হচ্ছিল। প্রথম গোলের সময় হাজার হাজার দর্শকের সঙ্গে আমিও চিৎকার করে উঠলাম। পাশ থেকে আমাকে একজন বললেন, ইউ আর অ্যা জার্নালিস্ট। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আমি বিশ্বকাপ কাভার করতে গিয়েছি। প্রেস বক্সে বসে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখছি। কৈশরের সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন। সে এক অন্যরকম অনুভূতি। এটা ঠিক বলে বোঝানো যাবে না।

নিরীক্ষা: ম্যারাডোনার সাক্ষাৎ পেলেন কখন?

আমার যেহেতু মূল আগ্রহ ম্যারাডোনার খেলা দেখা, তাই শিকাগো থেকে পরদিন বস্টনে চলে যাই আর্জেন্টিনা-গ্রিসের খেলা দেখতে। সুবিধাটা ছিল বস্টনে আমার খালার বাসা। ফলে আমার থাকা-খাওয়ার অসুবিধা নেই। যাতায়াতেও সুবিধা। ওখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় আর্জেন্টাইন সাংবাদিক সার্জেই লেভারস্কির সঙ্গে। তিনি ম্যারাডোনার ঘনিষ্ঠ। তাকে বললাম, আমি ফুটবল এবং দিয়াগোর ভক্ত এবং আমি দিয়াগোর সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমরা সবাই একসঙ্গে খেলা দেখতে গেলাম। মাঠে এত মানুষ! পুরো মাঠে ম্যারাডোনা, ম্যারাডোনা। দুপুরে খেলা; কিন্তু ফ্লাড লাইট জ্বলছিল। মাঠের দুই-তৃতীয়াংশই আর্জেন্টিনার সমর্থক। বাতিস্তুতা হ্যাটট্রিক করলেন। চতুর্থ গোলটি ম্যারাডোনা করলেন। এরপর তার যে এক্সপ্রেশন... লেগফুটে একটা অসাধারণ গোল করলেন। আমি তন্ময় হয়ে খেলা দেখছি। খেলা শেষে ২ ঘণ্টা ম্যাচের অ্যানালাইসিস দেখলাম কম্পিউটারে। ম্যারাডোনার পাস, গোল এসব। কিন্তু রিপোর্ট লিখতেই ভুলে গেলাম। ইত্তেফাকে রিপোর্ট পাঠিয়ে আবার বসে গেলাম। গোটা ম্যাচ বিভিন্ন এঙ্গেলে দেখলাম। এ সময় সার্জেই এলেন। বললেন, মি. ইসলাম (দিলু খন্দকার) কাল তো ম্যারাডোনা প্র্যাকটিস করবে। তুমি কি যাবে? তখন মনে হলো, দিয়াগোর সঙ্গে কথা বলার এটাই সুযোগ।

ডেডহ্যামে প্র্যাকটিস। আমার বাসা থেকে খুবই কাছে। সারা রাত এক ফোঁটা ঘুমাইনি। কারণ যে কারণে সাংবাদিক হলাম, সেই ম্যারাডোনার সাক্ষাৎ পাব। হাজারখানেক সাংবাদিক। এফবিআই আটকে দিল। বলল, আর্জেন্টিনা যখন কল করবে, তখন যেতে পারবে। দুই ঘণ্টা পর আমরা ভেতরে ঢোকার অনুমতি পাই। কিন্তু মাঠে ঢুকে দেখি ক্যানিজিয়া-গ্যায়কুচকিয়া-বাতিস্তুতা প্র্যাকটিস করছেন। কিন্তু ম্যারাডোনাকে দেখি না। সার্জেই বলল, দিয়াগো আসেনি। কিন্তু আসবে। জীবনের প্রথম কোনো বিশ্বসেরা টিমের প্র্যাকটিস দেখছি। কিছুক্ষণ পর দেখলাম সব সাংবাদিক দৌড় দিচ্ছে। ক্যামেরার শাটারের অনবরত আওয়াজ। দিয়াগো এসেছেন। তিনি আর্জেন্টিনার একটি টেলিভিশনকে লম্বা সাক্ষাৎকার দিলেন। হাতে একটা টেনিস বল। সেটিকে যেভাবে জাগলিং করলেন... থাইয়ের ওপর, বুটের ডগায়, মাথায়– সে এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য! আধা ঘণ্টারও বেশি সময় একটা টেনিস বল নিয়ে কসরত করলেন দিয়াগো। তারপর সরাসরি প্র্যাকটিসে ঢুকে গেলেন। প্র্যাকটিস শেষে আমরা তার মুখোমুখি।

নিরীক্ষা: অবশেষে আপনি তার দেখা পেলেন...

সার্জেই আমাকে ম্যারাডোনার খুব কাছে নিয়ে গেল। আমি তার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলাম। আমার স্বপ্নের নায়ক; যার জন্য সাংবাদিক হয়েছি। হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে, স্ত্রীর গয়না বন্দক রেখে টাকা জোগাড় করেছি, সেই মানুষটির সামনে দাঁড়িয়ে আমি। সে এক তন্ময় ভাব। আমি শক্ত করে তার হাতটি ধরলাম। ম্যারাডোনা বুঝতে পারলেন। তিনি হাতটা আরও শক্ত করলেন। এটা অনেকটা আমরা ছোটবেলায় যেমন শক্তি পরীক্ষা করতাম, সেরকম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এবার বিশ্বকাপে তিনি আর্জেন্টিনাকে কোথায় নিয়ে যেতে চান? আমার ইংরেজি প্রশ্নটি সার্জেই স্প্যানিশে তাকে বুঝিয়ে দিলেন। দিয়াগো সেটির জবাব দিলেন স্প্যানিশে। আমি ওইদিন আর হাতে পানি স্পর্শ করিনি। যে হাত দিয়ে আমি দিয়াগোকে স্পর্শ করেছি, ভেবেছি সেই গন্ধটা থাকুক।

নিরীক্ষা: ম্যারাডোনাকে নিয়ে বিতর্কও তো আছে। বিশেষ করে ছিয়াশির বিশ্বকাপে তার হাত দিয়ে গোল করা...

দিলু খন্দকার: ঠিক আছে, কিন্তু এর পরের গোলটা? কয়েকজন খেলোয়াড়কে পাশ কাটিয়ে, গোলরক্ষককে ধোঁকা দিয়ে তিনি যে গোলটা করলেন, সেটি তো সর্বকালের সেরা গোল।

নিরীক্ষা: ম্যারাডোনা ডোপ টেস্টেও পজিটিভ। অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে মাদক গ্রহণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়।

দিলু খন্দকার: ম্যারাডোনা একজন বিশ্বসেরা ফুটবলার, যাকে আমরা বলি সর্বকালের সেরা ফুটবলার। তার জীবনে নিশ্চয়ই এটি একটি ব্ল্যাক স্পট।

নিরীক্ষা: অনেকে মেসির মধ্যে ম্যারাডোনাকে খোঁজার চেষ্টা করেন।

দিলু খন্দকার: এটা কোনোভাবেই মানা যায় না। ম্যারাডোনার সঙ্গে মেসির তুলনা চলে না। ম্যারাডোনার সঙ্গে পেলেরও তুলনা চলে না। কারণ লাতিন আমেরিকার বাইরে পেলে ওই অর্থে খেলেননি। কিন্তু ম্যারাডোনো ইউরোপের ফুটবলেও ইতিহাস তৈরি করেছেন। নাপোলির মতো তলানিতে থাকা একটি দলকে টেনে তুলেছেন। সেটা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

নিরীক্ষা: ফুটবলের প্রতি আপনার বিশেষ আগ্রহ। আপনার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের ফুটবলের সংকটটা কোথায়? ক্রিকেট বিশ্বকাপে বাংলাদেশ খেলছে। কিন্তু ফুটবলে কেন পারছে না?

দিলু খন্দকার: বিশ্বকাপে না গেলে বুঝতে পারতাম না যে ফুটবল শুধু টাকার খেলা না। এখানে সবচেয়ে বেশি দরকার সাংগঠনিক দক্ষতা। ২০০৬ বিশ্বকাপে টোগো কোয়ালিফাই করেছিল। তাদের ফুটবল ফেডারেশনের কোনো টাকা ছিল না। টেলিফোন লাইন ছিল না। ফেডারেশনের মালিকের টাকায় চলত। তারা কিন্তু কোয়ালিফাই করেছিল। ইতালি বিশ্বকাপে ক্যামেরুন হারিয়ে দিয়েছিল আর্জেন্টিনাকে। ক্যামেরুনের এক ডিফেন্ডার সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, তার বাড়িতে টেলিভিশন নেই। তিনবেলা খাবার জোটে না। প্রথম টেলিভিশন দেখেছেন ইতালিতে এসে হোটেল রুমে। তাদের কাছে ফুটবলটা জীবনের চেয়ে বড়। কারণ ওরা ফুটবল খেলে জীবিকা নির্বাহ করে। আর আমাদের দেশে ঘটনাটি ঠিক উল্টো। আমাদের ফুটবলের সবচেয়ে বড় সর্বনাশ করেছে আমাদের বড় ক্লাবগুলো। তারা একবারেই অপেশাদারি ঢঙে গড়া।

নিরীক্ষা: অভিযোগটা ঢালাও হয়ে গেল না?

দিলু খন্দকার: একটা উদাহরণ দিই। জার্মান বুন্দেসলিগার অনেক আগে আমাদের দেশে ফুটবল লিগ হচ্ছে। বুন্দেসলিগা শুরু হয় মধ্য ষাটে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। এরপর তারা তিনবার বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আমাদের ফুটবল লিগ তৎকালীন ব্রিটিশ আমলে, ত্রিশের দশকে। কিন্তু আমরা বরাবরই ফুটবল খেলেছি শৌখিনতার আদলে। এখানে ওই অর্থে পেশাদারিত্ব গড়ে উঠেনি। মধ্য সত্তর থেকে নব্বই পর্যন্ত আমাদের আবাহনী-মোহামেডানের কোটি কোটি সমর্থক ছিল। যেটা বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদ, বায়ার্ন মিউনিখ বা ম্যানচেস্টারেরও নেই। যদিও ওদের জনসংখ্যাও কম। কিন্তু আমরা এই সমর্থন কাজে লাগাতে পারলাম না। আমাদের সংগঠকদের দুরদর্শিতার অভাবে ফুটবল পিছিয়েছে। সারা দুনিয়ায় ফুটবল এগিয়েছে। আমরা পিছিয়েছি। সারা দুনিয়ায় ফুটবলের উন্নয়ন হয় ক্লাবগুলোর হাত ধরে। আমাদের এখানে ক্লাবগুলো ওই অর্থে ফুটবলের উন্নয়নে বড়ো কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। আবাহনী-মোহামেডানের মতো ক্লাবেরও ভালো আবাসন নেই। বার্সেলোনার ক্লাবের যে আভিজাত্য, তার পাশাপাশি তার একটা একাডেমি রয়েছে, যেখানে নতুন প্রজন্ম ফুটবল শেখে। আমাদের এখানে একাডেমি কোথায়? মেসির জন্ম বার্সেলোনার ফুটবল একাডেমি থেকে। সে এখন দুনিয়াসেরা ফুটবলার। আমাদের ক্লাবগুলোর সংগঠকরা দক্ষ ছিলেন। নব্বই পর্যন্ত রমরমা ছিল। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তারা ফুটবলের কোনো ভিত গড়ে যেতে পারেননি। চেষ্টাও করেননি। মোহামেডানের সক্ষমতা ছিল একাডেমি পরিচালনা করার। একটা স্টেডিয়ামও তারা বানাতে পারত। কিন্তু তারা সেটা করেনি। এখন পর্যন্ত আমাদের ক্লাবগুলো শৌখিনতার আড়ালেই রয়ে গেছে।

নিরীক্ষা: ক্রিকেটের মতো ফুটবলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা নেই, এরকম অভিযোগও আছে।

দিলু খন্দকার: আমি একমত নই। সত্তর দশকের শুরুর দিকে ফুটবল ফেডারেশনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ক্রিকেট চলত। তখন ফুটবলের গেটমানি আসত কোটি টাকার ওপরে। সেখান থেকে ২০ লাখ টাকা নিত ক্রিকেট। সাবের হোসেন চৌধুরী ক্রিকেট বোর্ডের দায়িত্ব নিয়ে পুরো ধারণাই বদলে দিলেন। তিনি একসময় ছিলেন ফুটবলের সংগঠক। কিন্তু ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ক্রিকেটকে তিনি করপোরেট রূপ দেন। তিনি জানতেন সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলে ক্রিকেট বাঁচবে না। '৯৭ সালে আইসিসি চ্যাম্পিয়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রথম ধাপ অতিক্রম করে। তখন টেস্ট ও ওয়ানডে ক্রিকেট স্ট্যাটাসের জন্য আবেদন করা হয়। যখন বাংলাদেশ টেস্ট ও ওয়ানডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল, তখন ক্রিকেট বোর্ড শুধু টিভিস্বত্ব বিক্রি করল ১০০ কোটি টাকার বেশি। যেটা তাদের মূলধন হলো। ক্রিকেটের টাকায় গুলশানে একটি করপোরেট অফিস কিনে ফেলল। সাবের চৌধুরী দেখালেন কীভাবে একটি অপেশাদার সংগঠনকে পেশাদারে পরিণত করা যায়। তারপর থেকে আমাদের ক্রিকেট একটি পরিকল্পনা নিয়ে সামনেই যাচ্ছে। এখন ক্রিকেটের যে আয়, সেটা অবিশ্বাস্য। বছরে তাদের প্রায় ৪০০ কোটি টাকা সঞ্চয় থাকে। সেটার অধিকাংশই টিভি স্বত্ব ও স্পন্সর। ক্রিকেটে এখন আর সরকারের কোনো অর্থ লাগে না।

নিরীক্ষা: ফুটবলেও তো আমরা সালাউদ্দিনের মতো একজন ভালো লিডার পেয়েছি, কিন্তু...

দিলু খন্দকার: সালাউদ্দিনের ভিশন পরিষ্কার। ফুটবলকে সামনে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তার সমস্যা আর্থিক সংকট। আমাদের ফুটবল এখনও একার্থে ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে চলে। তাছাড়া আমাদের বড় ক্লাবগুলো এখনও অ্যামেচার। ইদানীং কিছু ক্লাব ইংলিশ আদলে ফুটবলের উন্নয়নে কিছু কাজ শুরু করেছে। এ উদ্যোগটা নিতে আমাদের ৪৫ বছর সময় লাগল।

নিরীক্ষা: তার মানে ভবিষ্যৎ ভালো?

দিলু খন্দকার: ভবিষ্যৎ ভালো। দরকার একটা ভালো পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন। জাপান-কোরিয়া-সৌদি আরব এরকম পরিকল্পনার কারণেই ফুটবলে এগিয়েছে এবং বিশ্বকাপ খেলছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রায় আটটি একাডেমি আছে যেখানে খেলোয়াড় তৈরি হয়। একেকটি ক্লাবের পেছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়। কোরিয়ান খেলোয়াড়রা এখন ইউরোপিয়ান ও স্প্যানিশ লিগেও খেলছেন। চায়না স্কুল অব ফুটবল করেছে। জাপান পেশাদার ফুটবল করার জন্য ব্রাজিল থেকে জিকোর মতো খেলোয়াড় নিয়ে এসে তাকে কোচের দায়িত্ব দিয়েছিল। ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের নিজ দেশের নাগরিকত্ব দিয়েছে। এটা হলো সুন্দর পরিকল্পনার দৃষ্টান্ত। সেই জাপান এখন বিশ্বকাপে খেলছে। তার মানে, রাষ্ট্রের একটা ভিশন থাকতে হয়।

নিরীক্ষা: অনেক সময় বলা হয় যে, আমাদের খেলোয়াড়দের শারীরিক সক্ষমতা ফুটবলের আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটা অন্তরায়...

দিলু খন্দকার: আমি এই ধারণার সঙ্গে মোটেই একমত নই। আমাদের খেলোয়াড়রা জন্মগতভাবেই মেধাবী। শুধু একটা মোটিভেশন আর গাইডেন্স দরকার। ১৯৭৮ সালে এশিয়ান যুব ফুটবল হয়েছিল। এশিয়ার ২৪টি দেশ খেলেছে। সেখানে বাংলাদেশ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছে। তার মানে, বাংলাদেশ ফুটবলে তখন এশিয়ার ৮ নম্বর পাওয়ার ছিল। তখন বাংলাদেশের কোচ ছিলেন জার্মানির ওয়ার্নার বেকেলহফট। তিনি খেলোয়াড়দের এমন প্রশিক্ষণ দিলেন যে আমরা কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত যেতে পারলাম। সুতরাং আমি মনে করি, ট্যালেন্ট বা স্ট্যামিনার দিক দিয়ে আমাদের খেলোয়াড়দের কোনো ঘাটতি নেই। শুধু দরকার মোটিভেট করার জন্য একজন ভালো শিক্ষক। ১৯৯৫ সালে আমরা মিয়ানমারের বিরুদ্ধে ইনভাইনেশনাল ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি, যেটি বাংলাদেশের প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক ট্রফি। ১৯৯৯ সালে আমরা সাফ গেমস জিতলাম কাঠমান্ডুতে। এরপর আরো একাধিক বিশ্বমানের খেলোয়াড়কে আমরা পেয়েছি কোচ হিসেবে। প্রশ্ন হলো, এতকিছুর পরও আমাদের ফুটবল কেন পরে আর এগোতে পারল না? আমি আবারও বলব, এর জন্য মূলত দায়ী আমাদের ক্লাবগুলোর অপেশাদারিত্ব। তাদের শক্ত কোনো ভিত্তি নেই।

নিরীক্ষা: পরিকল্পনার অভাব থাকলে সম্প্রতি আমাদের মেয়েরা ফুটবলে একটি বড় সাফল্য কী করে পেল?

দিলু খন্দকার: আমাদের দুর্বলতাগুলো আমরা অনুধাবন করতে পারলাম ২০১৮ সালে এসে। এখন ফুটবল নিয়ে যে ধরনের চিন্তাভাবনা হচ্ছে, তা তো এতদিন ছিল না। তুমি শুনে আশ্চর্য হবে যে, আমাদের মেয়েরা যে সাফল্য পেল, ওদের কোচিং চলে কাজী সালাউদ্দিনের ব্যক্তিগত টাকায়। অদ্ভুত প্রতিভাধর কিছু মেয়ে আমরা পেয়েছি। ওদের এখন পর্যাপ্ত নার্সিং হলে আমরা আরো অনেক দূর যাব।

নিরীক্ষা: স্কুল পর্যায়ে ওই অর্থে খুব বেশি ফুটবল কি হচ্ছে?

দিলু খন্দকার: এখন বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গমাতার নামে জাতীয় পর্যায়ে টুর্নামেন্ট হচ্ছে। যেখানে হাজার হাজার শিক্ষার্থী খেলছে। আশির দশকের শুরুতে ফিফার প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে এসেছিলেন। ওই বছর বাংলাদেশ একটি নতুন জিনিস চালু করেছিল। অনূর্ধ্ব-১৬ ফুটবলে প্রায় ২২০টি ক্লাব অংশ নিয়েছিল। উনি বলেছিলেন, যে দেশে এত ক্লাব, এত খেলোয়াড়, সেই দেশ ফুটবলে পিছিয়ে থাকবে, এটা আমি মানতে পারি না। দরকার একটা প্ল্যানিংয়ের। সেই পরিকল্পনাটা আমরা দীর্ঘদিনেও নিতে পারিনি। ইদানীং কিছু কিছু শুরু হয়েছে। এটা যথেষ্ট নয়। অবাক হলেও সত্যি, আমাদের ফুটবলের নিজস্ব কোনো স্টেডিয়াম নেই। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। আমাদের ক্রিকেট স্টেডিয়াম আছে, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, কাবাডির জন্য আলাদা স্টেডিয়াম আছে। সবচেয়ে জনপ্রিয় ফুটবলের জন্য নেই।

নিরীক্ষা: ফুটবলের সংকট কাটাতে সরকারের কী করণীয়?

দিলু খন্দকার: সরকারের একটা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা দরকার। কেন আমরা বিভাগীয় শহরগুলোয় একটি করে ফুটবল স্টেডিয়াম বানাতে পারছি না? কেন প্রত্যেকটা বিভাগে একটা ফুটবল একাডেমি বানাতে পারছি না? আমি তো মনে করি, সব বড় শহরে একটি করে ফুটবল একাডেমি যদি বানানো যায় এবং সেখানে বিশ্বমানের খেলোয়াড় এনে প্রশিক্ষণ দেয়া যায়, আমাদের ফুটবল অনেক দূরে যাবে। আমরা বিশ্বকাপ খেলব। আমাদের অজস্র প্রতিভা লুকিয়ে আছে। এখন ক্লাবগুলো অনূর্ধ্ব-১৭ টিম বানাচ্ছে। আমরা এটা শুরু করলাম যথেষ্ট পরে। তবে দেরি হলেও আমি মনে করি, এটাকে ধরে রাখতে হবে। যদি পরিকল্পনা করা যায়, ক্লাবগুলো পর্যাপ্ত সহায়তা দেয়, তাহলে বিশ্বর‍্যাংকিকে একশ'র মধ্যে আমরা চলে আসব।

নিরীক্ষা: সময় দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

দিলু খন্দকার: আপনাকেও ধন্যবাদ।

প্রায় ২০০ দক্ষ নারী খেলোয়াড় এখন দেশের সম্পদ

—কামরুন নাহার ডানা

এদেশের সমাজ বাস্তবতার শত প্রতিকূলতায় নারীরা খেলার জগতে টিকে থাকার চেষ্টা করছেন। তাদের এই অর্জনের পেছনে রয়েছে অনেক কাঠখড় পোড়ানোর গল্প আর কঠোর অনুশীলন ও পরিশ্রম। কয়েক বছরে বাংলাদেশে ক্রিকেট ও ফুটবল খেলায় নারী উপস্থিতি যতটা দেখা যাচ্ছে– খেলার অন্য বিভাগে নারীদের অবস্থা ও অবস্থান কেমন, কতটা সুযোগ পাচ্ছেন তারা? এছাড়াও বাংলাদেশে খেলার জগতে নারীর অবস্থা ও অবস্থানসহ নানা প্রসঙ্গ নিয়ে বলেছেন একসময়ের ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন, ক্রীড়াব্যক্তিত্ব কামরুন নাহার ডানা। পিআইবি নিরীক্ষা'র পক্ষ থেকে আলাপচারিতায় ছিলেন '৭১ টিভির সাংবাদিক **বনশ্রী ডলি**।

> অনেক প্রতিকূলতার পরও প্রায় ২০০ দক্ষ নারী খেলোয়াড় এখন দেশের সম্পদ। আর প্রশিক্ষক আছেন কয়েকজন। ... একটি মেয়ের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা না থাকলে পরিবার তাকে কীভাবে খেলোয়াড় বানানোর কথা ভাববে

নিরীক্ষা: বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনা কদ্দূর! এদেশের মেয়েরা ফুটবল নিয়ে বিশ্বকাপে যাবে– এমন স্বপ্ন দেখেন?

কামরুন নাহার ডানা: খেলার মানুষ তো, তাই সম্ভবনা দেখি। তাছাড়া ফুটবল নিয়ে আমার বাড়তি আগ্রহ রয়েছে। এদেশের মেয়েরা ফুটবল নিয়ে বিশ্বকাপে যাবে, সে স্বপ্ন দেখতে তো বাধা নেই। বাস্তবতা মোকাবিলা করেই সম্ভাবনার পথ তৈরি করতে হয়।

নিরীক্ষা: বাংলাদেশে খেলায় মেয়েদের বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান কেমন? সামাজিক বাধা কতটা পার হতে পেরেছে বলে মনে করেন?

কামরুন নাহার ডানা: পঞ্চাশ-ষাট দশকের সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশের মেয়েরা খেলার জগতে এসেছে বেশ আগেই। তবে দেওয়ালের বাইরে মাঠে আসতে পেরেছে সত্তর-আশির দশকে। তখন শহরভিত্তিক ও কিছু উপশহরে স্কুল-কলেজে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু খেলা নির্ধারিত ছিল, যা বছরে এক-দুবার তারা খেলতে পারত, তা-ও পরিবার মত না দিলে অংশ নেওয়া সম্ভব হতো না। এ অবস্থাটা পাল্টাতে শুরু করে আশির দশক থেকে। মুক্তিযুদ্ধের পরে স্বাধীন দেশে প্রতিটি স্কুল-কলেজ ও পাড়ায় স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মেয়েরা খেলার সুযোগ পেতে শুরু করে। কিন্তু তা বেশির ভাগ সময় দেওয়ালের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। সামাজিক প্রচলিত ধারণা ও মানসিকতা এমনই ছিল যে, মেয়েরা খেলাধুলা করলে তাদের কোমলতা নষ্ট হয়, সমাজও মেয়েদের খেলা ভালো চোখে দেখে না, আর বিয়ে দিতেও সমস্যা। সমাজ এই ধারণা থেকে এখনো যে পুরোপুরি মুক্ত হতে পেরেছে, তা বলব না। তবে মেয়েদের খেলার বিষয়ে মানসিকতার পরিবর্তন অনেকটাই বদলে গেছে। অনেক অভিভাবক চান, লেখাপড়ার পাশাপাশি ছেলে বড়ো খেলোয়াড় হোক। তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে তা এখনো অন্যরকম। যদিও খেলোয়াড়রা এখন শুধু শখের বশে নয় বা বছরে দুইবার নয়, অনেকে নিয়মিত খেলে উপার্জন করছেন আবার সম্মান পাচ্ছেন। বাংলাদেশে ছেলেদের খেলার বিভাগটি বড়ো হয়েছে এবং দক্ষ হয়ে উঠেছে ক্রমাগত। এগিয়ে যাচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়াও শুটিংয়ে বাংলাদেশ সাফ গেমসসহ আন্তর্জাতিক আসরে মেয়েরাও ভালো করছেন।

ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা অনেক বাধাবিপত্তি পার করেও কিছু ক্ষেত্রে বেশ ভালো খেলছেন। শুটিংয়ে মেয়েরা ভালো করছেন। আর ক্রিকেটে তো এবার অসাধারণ এক জয় ছিনিয়ে এনেছে বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটাররা। অনেক সীমাবদ্ধতার পরও ক্রিকেটে পেরেছে যোগ্যতা প্রমাণ করতে। ২০১৮তে এসে সত্যি দেখিয়ে দিল যে বাংলাদেশের মেয়েরাও ক্রিকেট খেলতে পারে। এ সফলতা একদিনে আসেনি। দীর্ঘ সময় কঠোর অনুশীলন আর পরিশ্রম করেছে বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট দল। এর সুফল হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশে নারী দলের বিজয় এনে দিয়েছে। এটা যেন এ সময়ে বাংলাদেশের পাওনা ছিল। এ বিজয় সব খেলোয়াড়ের জন্য অনুপ্রেরণা আর সাহস জোগাল। তাতে দলের ও অন্যদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে।

নিরীক্ষা: কয়েক বছরে ক্রিকেটে একটা অবস্থান তৈরি হলেও অন্য বিভাগগুলোয় মেয়েদের অংশগ্রহণের বাস্তব চিত্র কী, কতটা সুযোগ পাচ্ছেন তারা?

কামরুন নাহার ডানা: সব বিভাগে মেয়েরা এগিয়ে নেই, এটা সত্যি। তবে বাংলাদেশের নারী ফুটবল দলের কথা বলা যায়। পাশের দেশগুলোসহ অন্য দেশে যখন নারী ফুটবল দল গড়ে উঠেছে এবং তারা খেলছে, তখন আমাদের দেশে ক্রীড়া সংগঠক এবং মেয়েরা ফুটবল খেলার কথা ভাবতে দ্বিধা করেছেন। হয়তো তাদের সামনে ছিল সামাজিক বাধার দেওয়াল। এরপর ২০০৩ সালে ইন্টারনেট ঘেঁটে জানতে পারি, তৃতীয় বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে নারীদের খেলার উন্নয়নে অনুদান হিসেবে অর্থ পাঠায় ফিফা। সেসময়ে জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনে আমি যুক্ত।

বাংলাদেশে আসা ফিফার টাকা ছেলেদের খেলার জন্য খরচ হতো। কারণ তখন পর্যন্ত বাংলাদেশে নারী ফুটবল দল গড়ে উঠেনি। সেসময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন সিরাজুল ইসলাম বাচ্চু। বিষয়টি নিয়ে কথা বলে নারী ফুটবল দল গঠনের উদ্যোগ নিই। তখন ফেডারেশনের কর্মকর্তারা ওমেন উইং করে সাব-কমিটি করে দিলেন। তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এ উদ্যোগ কিছুটা চ্যালেঞ্জেই ছিল। এমনকি ক্রীড়া সংগঠকদের মধ্যেও অনেকে ভেবেছেন নারীরা মাঠে জার্সি পরে ফুটবল খেলবে, তাতে সমস্যা হতে পারে। যদিও ১৯৮১ সাল থেকে এদেশে মেয়েরা সাঁতারে অংশ নেয়। সুইমিং কস্টিউম পরে বাংলাদেশে প্রথম আমিনা মোশারফ সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। তারপরও ফুটবল দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর অনেকে শঙ্কা প্রকাশ করেছে; কিন্তু দমে যাইনি।

বিজ্ঞাপন দিয়ে ডাকার পর ২৫০ জন মেয়ে আবেদন জানায়। তাদের ৭০ জনকে ১০-১২ দিন ট্রেনিং দেওয়ার পর ৪৫ জনকে বাছাই করে দল গঠন করা হয়। দলটিকে দুই মাস ট্রেনিং দেওয়া হয়। সেসময়ে সবচেয়ে বেশি সার্বিক সহায়তা দিয়েছে শফিপুর আনসার ক্যাম্পের ক্রীড়া বিভাগ ও নারী ক্রীড়া দল। প্রশিক্ষণ দিয়েছেন কাজী সাত্তার, মোশারফ, বাদল, ইউসুফসহ আরো কয়েকজন। ততদিনে ফিফাকে জানানো হয় বাংলাদেশে নারী ফুটবল দল গঠন করা হয়েছে। এরপর ফিফা প্রতিনিধি দল এসে ক্যাম্প দেখে যায়।

দলটি মোটামুটি তৈরি হওয়ার পর ২০০৪ সালে ছয়টি জেলায় টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হলো। ধর্মীয় বিধিনিষেধ উল্লেখ করে স্থানীয় মুসল্লিদের বাধায় নেত্রকোনা মাঠে মেয়েরা ফুটবল খেলতেই পারেনি। ঢাকা স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্ট হওয়ার আগের দিন বায়তুল মোকাররম থেকে খেলা বন্ধ করার ফতোয়া ঘোষণা হলো। অনেকে ভয় পেলেও আমি পাইনি। বরং মরিয়া হয়ে ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিকভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও নারী সংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে ফতোয়ার বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে অনুরোধ করি। তাতে সুফল আসে। সংকটে পাশে দাঁড়ান অনেকে। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে ফোন করে পরামর্শ ও সতর্ক করেছেন তারা। মনে আছে, মহিলা পরিষদের আয়শা খানম, জাসদ নেতা শিরীন, তার বোন নাট্যব্যক্তিত্ব বেবী পাশে দাঁড়িয়েছেন, সাহস দিয়েছেন। হুমকিধমকিতেও সাহস হারাইনি। কঠোর নিরাপত্তায় টুর্নামেন্ট হলো শেষ পর্যন্ত। তবে প্রধান অতিথি বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী ফজলুর রহমান পটল টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করতে আসেননি। এত বিরূপ পরিস্থিতিতেও টুর্নামেন্ট হওয়ায় সবার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। এ পথচলায় নারী ফুটবল দল একটা অবস্থানে পৌঁছেছে বলা যায়। এর জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। এরপর থেকে অনূর্ধ্ব-১৪, ১৬ ও ১৯ দল দেশে ও বিদেশের মাঠে ছোটবড়ো টুর্নামেন্ট খেলে যাচ্ছে। এটাও কম নয়। তবে দলকে টিকিয়ে রাখাটাও বড়ো কাজ। অনেকে ঝরে পড়ে নানা কারণে। বিয়ে, সন্তান, সংসার, পারিবারিক ও সামাজিক কারণ থাকার পাশাপাশি আর্থিক বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। আগে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে খেলোয়াড়দের চাকরির ব্যবস্থা ছিল, তা এখন কমে গছে। যা এখন আরো বেশি প্রয়োজন।

নিরীক্ষা: বাংলাদেশে খেলার জগতে কয়েক বছর ধরে ব্যাডমিন্টনে কামরুন নাহার ডানা, টেবিল টেনিসে লিনু, দাবায় রানী হামিদের নাম অনুপ্রেরণা ছিল। তিন বিভাগে কতজন নারী খেলোয়াড় তৈরি হয়েছে, এই খেলায় মেয়েদের শক্ত অবস্থান নেই কেন?

কামরুন নাহার ডানা: যে কোনো ক্ষেত্রে কেউ ভালো করলে তিনি অন্যদের অনুপ্রেরণায় অনুকরণীয় হন। আমরা তিনজন সেসময় খেলার সুযোগ পেয়েছি। পারিবারিক বাধা যেমন কম ছিল, তেমনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিভি-ন্ন সংগঠনের সমর্থন ও সহায়তা পেয়েছি যথেষ্ট। অনেকদিন পর্যন্ত ব্যাডমিন্টন খেলেছি এবং সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেছি। আমাদের সময়টায় খেলায় মেয়েরা কম আসত। যে ক'জন খেলেছে, তাদের বেশির ভাগই শহরের। খেলার সংগঠনও কম ছিল। সারা দেশের মেয়েদের জন্য এই সুযোগ কমই ছিল। আর খেলোয়াড় তৈরি করার বিষয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগ খুব একটা কাজে আসে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা প্রাতিষ্ঠানিক বা সাংগঠনিকভাবে এর ব্যবস্থা করা যায়। অন্য দুজন দুই বিভাগে ভালো খেলেছেন এবং সফলতাও পেয়েছেন। আমি ও লিনু ব্যাডমিন্টনে ডাবলসে খেলেছি। টেবিল টেনিসও খেলেছি। একটা সময় আমি ব্যাডমিন্টন বিভাগ থেকে অন্য দায়িত্বে চলে আসি। খেলোয়াড় তৈরির ক্ষেত্রে দায়িত্বের বিষয়ে অন্যদের কথা বলতে পারব না, তবে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করি। বেশ ক'বছর ব্যাডমিন্টন খেলে অর্থও পেয়েছি। তার চেয়ে বেশি পেয়েছি সম্মান। খেলা ছেড়ে দেওয়ার পর জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের নারী বিভাগের দায়িত্ব পাই। সেসময় ফেডারেশনে সবসময়ই মেয়েদের বিষয়ে আমি ছিলাম সোচ্চার। তা না হলে মেয়েদের বিষয়ে ফিফার অনুদানের বিষয়টির খোঁজ নিয়ে ফুটবল দল গঠনের উদ্যোগ নেওয়ার কথা ভাবতাম না। তবে এটা করা আমার কর্তব্য মনে করেছি। এরপর থেকে কয়েকটা খেলার প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালনের কাজটি করছি। এখন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে আছি। সব জায়গায়ই একই ধারা। শুধু ব্যাডমিন্টন নয়, প্রায় সব খেলায়ই সবসময়ই টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে খেলোয়াড় বাছাই ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। টুর্নামেন্ট শেষ হলে খেলোয়াড়রা নিজেদের পেশায় মনোযোগ দেন। এটাই

হয়ে আসছে। নিয়মিত খেলার সংগঠন আমাদের দেশে এ পর্যন্ত কমই গড়ে উঠেছে বলা যায়। কেউ ইচ্ছে করলেই খেলোয়াড় হয়ে যেতে পারেন না বা তৈরিও করা যায় না। খেলোয়াড় হয়ে ওঠার বিষয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে তো এটা বড়ো বাস্তবতা। খেলোয়াড় তৈরির বিষয়টি রাষ্ট্র ও সংগঠনগত পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়। আর যে খেলতে চায়, তার আগ্রহ ও যোগ্যতা থাকতে হবে। প্রতিভা খুঁজে বের করাও বড়ো কাজ। আর্থিক বিষয়টিও এখানে বড়ো বিষয়।

নিরীক্ষা: তাহলে কি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব? খেলায় পেশাদারিত্বের জায়গাটা কি তৈরি হয়েছে? প্রশিক্ষক ও দক্ষ খেলোয়াড় কতজন তৈরি হতে পারলেন...

কামরুন নাহার ডানা: একবাক্যে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব তা বলা যাবে না। আগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সংগঠন বিভিন্ন খেলার পৃষ্ঠপোষক হতো। মাঝেমধ্যে টুর্নামেন্টের আয়োজন করে খেলায় নারী-পুরুষ সবাইকেই উৎসাহ দিত। সেখান থেকে প্রতিভা বেরিয়ে আসত। তারাই একসময় জাতীয় পর্যায়ে খেলত। এখনো সেগুলো আছে, তবে তুলনামূলকভাবে কমে গেছে। খেলায় একটা ধারাবাহিকতার প্রয়োজন থাকে। আর খেলার সুযোগ সবসময়ই মেয়েদের জন্য কম ছিল। মানুষের জীবনযাপনের ধরন বদলে গেছে। শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসগুলোয় ব্যস্ততা বেড়েছে অন্য অনেক আনুষঙ্গিকতায়। খেলাধুলার চেয়ে আয়-রোজগারে সময় ব্যয় করছেন তারা। আশার দিকটি হলো, ২০০৯ সাল থেকে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব টুর্নামেন্ট চালুর পর থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নারী খেলোয়াড় তৈরির একটা চলমান প্রক্রিয়া শুরু হয়। এটা একটি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। ফলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই সারা দেশে খেলায় নারীদের আসার একটা বড়ো সুযোগ তৈরি হয়েছে। ক'বছরে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, কাবাডিসহ কয়েকটি খেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েরাও অংশ নিচ্ছে। তাদের মধ্য থেকে স্থানীয় পর্যায়ে যারা সফল হয়, তারা জাতীয় দলে খেলার জন্য নির্বাচিত হচ্ছে। কম হলেও খেলোয়াড় তৈরি হচ্ছে। তবে আমাদের সমাজ বাস্তবতায় মেয়েরা বড়ো হলে সে যাই করুক, তার বিয়ের জন্য পরিবার অস্থির হয়। এখানে নারীর সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি জড়িত। এ সম্ভাবনাগুলোকে ধরে রাখার জন্য সুদূরপ্রসারী ও সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার বিকল্প নেই। পেশাদারি খেলোয়াড়, দল ও প্রশিক্ষক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ফেডারেশনের দায়িত্ব অনেক। প্রতিটি বিভাগে নারী দল গঠন ও তাদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য অভিজ্ঞ ও পেশাদার মনোভাবের উপযুক্ত ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং পরিচালনার জায়গাটিতে বসাতে হবে। কমিটিতে নিয়ম অনুযায়ী নারী সদস্য নেই, ৩০ শতাংশ থাকার নিয়ম থাকলেও সেখানে তিন শতাংশও নারী সদস্য নেই। সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

অনেক প্রতিকূলতার পরও প্রায় ২০০ দক্ষ নারী খেলোয়াড় এখন দেশের সম্পদ। আর প্রশিক্ষক আছেন কয়েকজন। তাদের ধরে রাখা, কাজ করতে দেওয়া বা কাজ করানোর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা বিবেচনায় নিলে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক মানের নারী খেলোয়াড় ও প্রশিক্ষক তৈরি হবে।

নিয়মিত লিগ খেলার আয়োজন করা খুব প্রয়োজন। লিগ খেলার সময় খেলোয়াড়রা ভাতা পান। তাতে তাদের আর্থিক দিকটি নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। খেয়েপরে স্বল্প আয়ের পরিবারের নারী খেলোয়াড় সদস্যটিও নিশ্চিন্তে খেলায় মনোযোগ দিতে পারেন। একটি মেয়ের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা না থাকলে পরিবার তাকে কীভাবে খেলোয়াড় বানানোর কথা ভাববে।

এখানে একটা কথা না বললেই নয়। এতকিছুর পরও আমাদের মেয়েরা যে খেলছে বা চেষ্টা করছে, তা প্রচার হয় কম। তাদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের সফলতা ও ব্যর্থতা এবং এর কারণগুলোও গণমাধ্যমে আলোচনায় আসা দরকার। গণমাধ্যমেরও দায়িত্ব রয়েছে এসব ধারাবাহিকভাবে প্রচার করা।

নিরীক্ষা: সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ

কামরুন নাহার ডানা: আপনাকেও ধন্যবাদ।

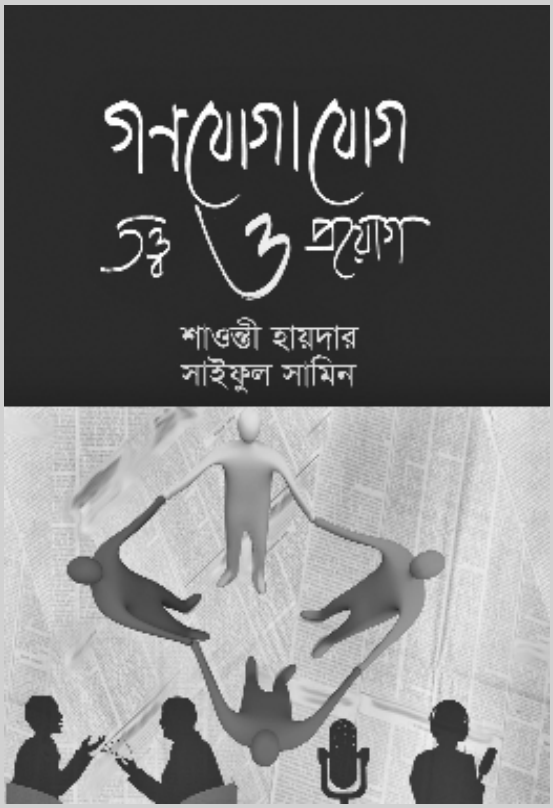

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র স্পোর্টস ফটোগ্রাফি

—শামসুল হক টেংকু

> একটি ভালো ক্যামেরা আর কয়েকটি লেন্সের মাধ্যমেই ভালো ফটোগ্রাফার হওয়া যায় না। ... তাই সবদিকে মনোযোগ রাখতে হবে। চ্যালেঞ্জিং মনোভাব থাকতে হবে। উদ্যমী হতে হবে

গতানুগতিক চাকরির বাইরে এমন অনেক পেশা আছে, যেখানে ভালোভাবে উপার্জন ও সম্মান আদায় করা সম্ভব। এরকমই একটি পেশা ফটোগ্রাফি। এখানে নিজের দক্ষতার পাশাপাশি শৈল্পিক জ্ঞানের সমন্বয়ে যে কেউ গড়তে পারেন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। পড়ালেখা শেষ করে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই গতানুগতিক চাকরির পেছনে ছোটেন। এতে কেউ সফল হন আবার কেউ কেউ বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে থাকেন। তাদের জন্য চাকরির বাইরে ফটোগ্রাফির মতো পেশা হয়ে উঠতে পারে সাফল্যের চাবিকাঠি। ফটোগ্রাফির নানা দিক রয়েছে। যেমন– পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি, ফটো ডকুমেন্টারি, ওয়েডিং ফটোগ্রাফি, ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি, ফ্যাশন ফটোগ্রাফি, ফিল্ম ফটোগ্রাফি, বিজ্ঞাপন ফটোগ্রাফি, ফরেনসিক ফটোগ্রাফি ও স্পোর্টস ফটোগ্রাফি। বর্তমানে জনসংযোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়া তথা গণমাধ্যম নতুন মাত্রা লাভ করেছে। বিভিন্ন ঘটনার বাস্তব দৃশ্য উন্মোচনে গুরুত্ব পাচ্ছে ফটোগ্রাফিও। সংবাদপত্রে বিশ্বকাপসহ বিভিন্ন

খেলাধুলার খবর দিতে গেলে সঙ্গে ছবি দেওয়াটা আবশ্যক। তাই ঘটনাস্থলে সাংবাদিকের পাশাপাশি পাঠাতে হয় স্পোর্টস ফটোগ্রাফারও। আমাদের দেশে স্পোর্টস ফটোগ্রাফারের কথা বলতে গেলে সবার আগে উঠে আসে যার নাম, তিনি হলেন শামসুল হক টেংকু। গতানুগতিক ফটোগ্রাফারের মতো তিনি শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য নয়, খেলাধুলার সৌন্দর্যগুলোও ক্যামেরায় খুঁজে বেড়ান দেশ-বিদেশে। প্রায় সব দেশেই গিয়েছেন ক্রিকেটের সুন্দর মুহূর্তগুলো ক্যামেরাবন্দি করতে। ক্যামেরাবন্দি করেছেন দেশ-বিদেশের খ্যাতিমান খেলোয়াড় থেকে শুরু করে আম্পায়ার, গ্যালারি, দর্শক– সবই। অর্জন করেছেন ফুটবল ফটোগ্রাফিতে প্রেসিডেন্ট গোল্ডকাপে প্রথম পুরস্কার, ক্রিকেট অ্যাওয়ার্ড নাইটের প্রথম পুরস্কার, ফটো জার্নালিস্টসের চাল ও চুলোর সাপ্তাহিক ফটোগ্রাফিতে প্রথম পুরস্কার, লং টেনিসে দ্বিতীয় পুরস্কারসহ আরো অসংখ্য পুরস্কার। আত্মপ্রচারবিমূখ এ মানুষটি খেলাধুলার গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো ক্যামেরাবন্দি করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ক্যামেরার সামনের ও পেছনের গল্প এবং স্পোর্টস ফটোগ্রাফিতে সম্ভাবনার দিকগুলো নিয়ে দৈনিক প্রথম আলোয় কর্মরত এই আত্মপ্রত্যয়ী স্পোর্টস ফটোগ্রাফার শামসুল হক টেংকু-এর সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন পিআইবি'র সম্পাদনা সহকারী **মো. লুৎফর রহমান**।

নিরীক্ষা: দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের ফটোগ্রাফারদের অবস্থান কেমন?
শামসুল হক টেংকু: আমাদের দেশের ফটোগ্রাফারদের ক্ষেত্রে খুবই ভালো। বাংলাদেশ এ মুহূর্তে বিশ্ব আলোকচিত্রে চতুর্থ অবস্থায় রয়েছে। আমাদের থেকে একটু এগিয়ে ভারত। তবে ভারতের চেয়ে অনেক আন্তর্জাতিক পুরস্কার আমাদের দেশের আলোকচিত্রীরা পাচ্ছেন। আমাদের ছবির মানও তাদের থেকে ভালো হচ্ছে। আশা করি, অচিরেই সবাইকে পেছনে ফেলে পৃথিবীর আলোকচিত্রে বাংলাদেশ এক নম্বর হবে।

নিরীক্ষা: অনেকে একে চ্যালেঞ্জিং পেশা মনে করেন।
শামসুল হক টেংকু: ফটোগ্রাফি ব্যাপারটি এখন আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়েছে। এখন তো ডিজিটাল ফটোগ্রাফি– তাই এত ফটোগ্রাফার। আমরা যখন শুরু করি, তখন ফিল্মে ছিল। চোখের লাইট, চোখের আন্দাজে ছবি তুলতে হতো। কোনটায় কী লাইট লাগবে, ফ্লাশ কোথায় দিতে হবে, কখন কোথায় ফোকাস রাখতে হবে এবং সেট– এগুলো দেখে কাজ করতে হতো। এখন তো বোঝা যায় ছবিটা ঠিকমতো উঠল কি না। আগে তো সেটা দেখা যেত না। অনুমানে তোলা হতো ছবি। সেটা একরকম চ্যালেঞ্জ আর এখন অন্যরকম চ্যালেঞ্জ।

নিরীক্ষা: বিশ্বদরবারে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে দেশের ফটোগ্রাফাররা অবদান রাখছেন বলে মনে করেন কি?
শামসুল হক টেংকু: অবশ্যই। দেশের ফটোগ্রাফাররা বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখছেন। দেশের যে কোনো উন্নয়নচিত্র ফুটিয়ে তুলতে সচিত্র প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফারের ভূমিকা অপরিসীম। কথায় আছে– অনেক কথার চেয়ে বিশি কথা বলে একটি ছবি। আর সেই ছবির মাধ্যমে বাংলাদেশকে পৃথিবীর সর্বত্র তুলে ধরছেন ফটোগ্রাফাররা। ফটোগ্রাফিতে বাংলাদেশ অনেক ভালো। দেশের অনেক ফটোগ্রাফারই বড়ো বড়ো পুরস্কার পেয়েছেন। যেমন– দৃকের প্রতিষ্ঠাতা শহিদুল আলম নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড প্রেস ফটো প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আরও রয়েছেন ইউরোপিয়ান প্রেস ফটো এজেন্সির আলোকচিত্রী আবির আবদুল্লাহ, ইনডিপেনডেন্ট ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফার কেএম আসাদ, ফটোগ্রাফি সোসাইটির সভাপতি আবদুল্লাহ আল এহসান। তারা ফটোগ্রাফিতে ভালো করেছেন বলেই পুরস্কৃত হয়েছেন। এরকম অনেকেই আছেন, যারা আন্তর্জাতিকভাবে বড়ো বড়ো পুরস্কার পেয়েছেন।

নিরীক্ষা: দেশে ফটোগ্রাফারদের মানোন্নয়নে যেসব সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তারা কেমন ভূমিকা রাখছেন?
শামসুল হক টেংকু: একসময় বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটির (বিপিএস) ভূমিকা ছিল বেশ। বর্তমানে দৃক গ্যালারি ভালো কাজ করছে। বেগার্টেরও একসময় অবদান ছিল। এখন আমাদের দেশে ফটোগ্রাফি শেখানোর অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। যেমন– বেগার্ট ইনস্টিটিউট অব ফটোগ্রাফি, ঢাকা ফটোগ্রাফি ইনস্টিটিউট, দৃক গ্যালারি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটি (ডিইউপিএস), জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, পাঠশালা, কাউন্টার ফটো, আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ, ওয়েডিং ডায়েরে, প্রিজম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে ফটোগ্রাফিতে বেসিক কোর্সসহ বিভিন্ন ডিপ্লোমা কোর্স চালু রয়েছে।

নিরীক্ষা: বাংলাদেশে ফটোগ্রাফির ভবিষ্যৎ কেমন?
শামসুল হক টেংকু: ভালো। খুবই ভালো। আমি মনে করি, ফটোগ্রাফি ক্যারিয়ারটা দিন দিন আরো মজবুত হচ্ছে। কারণ ফটোগ্রাফি শিখে যদি বাজারে নামা যায়, তাহলে ভালো ফটোগ্রাফারের পদ কিন্তু একেবারে পাকা। ফটোগ্রাফি শিখে পারমানেন্ট কোনো চাকরি না পেলেও ক্ষতি নেই। নিজেই বাড়িতে পোর্টফলিও বানিয়ে বা ফ্রিল্যান্সিং করে রোজগার করা যায়। জনসংযোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়া (গণমাধ্যম) নতুন মাত্রা লাভ করছে। বিভিন্ন ঘটনার বাস্তব দৃশ্য উন্মোচনে গুরুত্ব পাচ্ছে ফটোগ্রাফিও। সংবাদপত্রে বিশ্বকাপ কিংবা প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ ভ্রমণের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণ দিতে গেলে সঙ্গে ছবি দেওয়াটা আবশ্যক। তাই ঘটনাস্থলে সাংবাদিকের পাশাপাশি পাঠাতে হয় চিত্রসাংবাদিক বা আলোকচিত্রীদেরও। তাই বলা যায়, অনেক সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হলো স্পোর্টস ফটোগ্রাফি।

নিরীক্ষা: ক্রীড়াক্ষেত্রে ফটো সাংবাদিক হিসেবে শুরুটা হয়েছিল কীভাবে?
শামসুল হক টেংকু: আমার বাড়িতে তিনজন ফটোগ্রাফার ছিলেন। আমার চাচা প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্টের (পিআইডি) চিফ ছিলেন। উনি ১৯৬০ সালের আগ থেকেই ফটোগ্রাফি করতেন। এছাড়া আমার দুলাভাইও ফটোগ্রাফার ছিলেন। উনিও আমার চাচার কাছ থেকে ফটোগ্রাফি শেখেন। তিনিও পিআইডির ফটোগ্রাফার ছিলেন। আমার বড়োভাইও একজন ফটোগ্রাফার ছিলেন। সেই সুবাদে ছোটবেলায়ই ক্যামেরা হাতে উঠেছিল। তাই বলা চলে পারিবারিক আবহেই ফটোগ্রাফিতে আসা। আসলে সেই ছোটবেলায়ই ফটোগ্রাফির আগ্রহটা সৃষ্টি। স্কুলজীবনেই আমার হাতে ক্যামেরা ছিল। স্কুলে এবং ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর্সে ক্যামেরা নিয়ে যেতাম। বন্ধুদের ছবি তুলতাম, প্রকৃতির ছবি তুলতাম। আর আমি ছোটকাল থেকেই খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী ছিলাম। আমি ফুটবল ভালো খেলতাম। তাই খেলাধুলার প্রতি একটা ঝোঁক ছিল আগে থেকেই। খেলাধুলায় ঝোঁক আর ফটোগ্রফিতে ভালো করা– এ দুটি মিলেই ক্রীড়া ফটো সাংবাদিকতায় আসা।

নিরীক্ষা: ছবি তোলার ক্ষেত্রে নারী খেলোয়াড়ের গ্ল্যামারকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় কি না? প্রায়ই এরকমটা দেখা যায় ...।
শামসুল হক টেংকু: সাধারণত পশ্চিমা বিশ্বে এরকমটা দেখা যায়। আমাদের দেশের ফটোগ্রাফাররা এরকম করেন না। পশ্চিমা বিশ্বে হয়তো এরকম চাহিদা আছে। আমাদের দেশে তো আর এরকমটা হয় না, তাই না। আমাদের দেশে মেয়ে খেলোয়াড়দের স্বাভাবিক ছবিই তোলা হয়। তাছাড়া খেলার সময় খেলোয়াড়দের অ্যাকশন, জয়োচ্ছ্বাস প্রভৃতি ছবিই তোলা হয়ে থাকে।

নিরীক্ষা: বিদেশে পাপারাজ্জিদের উপস্থিতি যেভাবে দেখা যায়, বাংলাদেশে এর ধরনটা কেমন?
শামসুল হক টেংকু: বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি খুবই কঠিন। কারণ দেশে বিভিন্ন আইনকানুন আছে। এদিকটায় সবাইকে খেয়াল রেখে কাজ করতে হয়।

নিরীক্ষা: একজন সেলিব্রেটি এবং পাপারাজ্জি– বিষয়টি কীভাবে দেখেন?
শামসুল হক টেংকু: বাইরের ক্ষেত্রে বিষয়টি যতটা স্বাভাবিক, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ততটা না। কারণ কারো অনুমতি ব্যতীত ছবি তোলাটা এখানে একরকম অন্যায়ই। অথচ দেখুন ব্রিটিশ রাজবধূ কেট মিডলটনও পাপারাজ্জিদের যন্ত্রণায় ঘর থেকে ঠিকমতো বের হতে পারেন না।

নিরীক্ষা: একজন খেলোয়াড় ও ফটো সাংবাদিকের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত?
শামসুল হক টেংকু: একজন খেলোয়াড় ও ফটো সাংবাদিকের মধ্যে অবশ্যই ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে। তাদের সঙ্গে সুন্দর ও ভালো সম্পর্ক না থাকলে আসলে সুন্দর ছবিও তোলা যায় না। আপনাকে একজন খেলোয়াড়ের মন-মানসিকতাও বুঝতে হবে। কারণ কোনো খেলায় জিতলে একধরনের মানসিকতা, হারলে আরেক রকম আবার ড্র করলে আরেক ধরনের মানসিকতা কাজ করে। অর্থাৎ তাদের মন-মানসিকতা বুঝেই কাজ করতে হবে আপনাকে।

নিরীক্ষা: দেশে ফটোগ্রাফি পেশায় কোনো সীমাবদ্ধতা আছে কি না?
শামসুল হক টেংকু: আমরা যখন এ পেশায় আসি, তখন তো অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। ক্যামেরা ছিল ফিল্মের। লেন্স ছিল খুবই ছোট। ৫৮ লেন্স দিয়ে কাজ করতাম। দীর্ঘ সময় ছবি তুলতে হতো আবার হিসাব করে ছবি তুলতে হতো। তখন দীর্ঘ সময় কোনো ফুটবল ম্যাচে ১০-১৫ ফিল্ম ছবি তুলতে হতো। আর এখন তো খুবই সহজ। ডিজিটাল ক্যামেরা, মেমোরি কার্ড প্রচুর। এখন যে লেন্স আমরা ব্যবহার করি, তখন বাংলাদেশে কোথাও ছিল না।

নিরীক্ষা: ক্রীড়া সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ফটো সাংবাদিকতার গুরুত্ব কতটুকু?
শামসুল হক টেংকু: আমাদের দেশের মিডিয়ায় একটা সময় শুধু ফুটবল খেলার ছবি দেখা যেত। কমন দু-একটি ছবি যেমন খেলার ছবি আর গোলপোস্টের ছবি, কলাম আকারে দু-একটি নিউজ– ব্যস এ পর্যন্তই। কিন্তু আমরা যখন এ পেশায় আসি অর্থাৎ নব্বইয়ের দশকের পর থেকে ছবির গুরুত্ব বাড়তে থাকল। প্রথম পৃষ্ঠায় ছবি আসতে শুরু করল। এখন তো সুইমিং, শুটিং, টেনিস– সব খেলারই ছবি আসছে। আর ক্রিকেটের তো এখন জয়জয়কার। ১৯৮৬ সালের পর থেকেই আসলে স্পোর্টস ফটোগ্রাফির চাহিদা বাড়তে থাকে। মেক্সিকো বিশ্বকাপের পর থেকেই আসলে ফুটবলের ছবি আসতে থাকে। আর এএফপি স্পোর্টস ফটোগ্রাফিকে ডেভেলপ করেছে, ডিজিটাইজ করেছে।

নিরীক্ষা: আমাদের মিডিয়াগুলো এখনো এএফপি বা ওয়েবসাইটের ওপর নির্ভরশীল...।
শামসুল হক টেংকু: আসলে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই একটি নীতি ও খরচের ব্যাপার থাকে, সেজন্য হয়তো অনেকে স্পোর্টস ফটোগ্রাফার পাঠায় না। তবে অনেকেই পাঠায়।

নিরীক্ষা: আমাদের দেশেও ইদানীং অনেক নারী ফটোগ্রাফার দেখা যায়। এ সম্পর্কে যদি কিছু বলেন...।
শামসুল হক টেংকু: আসলে আমাদের দেশে নারীরা এখন অনেক এগিয়ে গেছে। বর্তমানে সমাজের সব ক্ষেত্রেই নারীর অবদান দৃশ্যমান। ক্রীড়া, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন, সাবাদিকতা, পুলিশ, সংগঠক, নেতা– সর্বত্রই নারীর বিচরণ রয়েছে। তাই এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকবে কেন? যদিও এটি একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা, তারপরও আমাদের দেশে নারী প্রেস ফটোগ্রাফারের সংখ্যা বাড়ছে। এটি একটি ভালো দিক। ফটো সাংবাদিক হিসেবে অনেক নারীই আজ কাজ করছেন দেশে। হরতাল, মিটিং, মিছিল আর সংঘর্ষের মাঝখান থেকে তুলে আনছেন ছবি। আমি মনে করি, দেশের প্রথম নারী ফটোগ্রাফার সাইদা খানম, শাহরিয়ার ফারজানা, কাকলী প্রধান নতুন নারী ফটোগ্রাফারদের জন্য পথপ্রদর্শক।

নিরীক্ষা: যারা এ পেশায় আসতে চান তাদের ব্যাপারে কী বলবেন?
শামসুল হক টেংকু: যেহেতু এটি একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা, তাই যারা এ পেশায় আসতে চায় তাদের বলব, কাজের ক্ষেত্রে খুবই আন্তরিক হতে হবে। যে কোনো কাজে যাওয়ার আগে সে কাজটি বা খেলাটি সম্পর্কে সম্মক ধারণা বা অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিতে হবে। সহজ কথায় বললে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে নিতে হবে। তাহলে কাজটিও সুন্দর হবে। বর্তমান যুগ ইন্টারনেটের যুগ। যে কোনো তথ্য সহজেই পাওয়া যায়। তাই খেলা এবং প্লেয়ারের গুরুত্ব বুঝে ছবি তুলতে হবে। যেমন- মেসি যখন বাংলাদেশে আসেন নাইজেরিয়ার সঙ্গে খেলতে, তখন আমি এক সপ্তাহ তার বিভিন্ন ছবি দেখেছি। তার ক্ষেত্রে কোন লুকে ছবি তুলতে হবে। মেসি বাঁ পায়ের প্লেয়ার। তিন বাঁ পায়ে খেলেন, বাঁ পায়ে শট নেন। তার এ মুভমেন্টগুলো লক্ষ করে ছবি তুলতে হবে। সেভাবেই আমি প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে বসেছিলাম। কোনো ম্যাচ কাভার করতে যাওয়ার আগে পুরোনো ম্যাচের ছবিগুলো দেখতে হবে। আগেই বলেছি, ম্যাচ জয়ের এক অনুভূতি-উচ্ছ্বাস কাজ করে এবং হারলে আরেক ধরনের মানসিকতা কাজ করে, তাই এ জিনিসগুলো খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে। দেখা গেল, এক ওভারে কোনো প্লেয়ার ছয়টি ছয় মারল, তার ছবি রাখতে হবে। বলতে গেলে প্রতিমুহূর্তের ছবি তুলতে হবে। তাছাড়া শুধু ছবি তোলাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে তা অফিসে পাঠাতে হবে। মনে রাখতে হবে– নিউজের সঙ্গে সংগতি রেখেই ছবি ছাপা হয়। একটি ভালো ক্যামেরা আর কয়েকটি লেন্সের মাধ্যমেই ভালো ফটোগ্রাফার হওয়া যায় না। সত্যি বলতে কী আপনি হয়তো ছবি তুলতে পারবেন, কিন্তু একজন ভালোমানের ফটোগ্রাফার বা সফল পেশাদার ফটোগ্রাফার হতে পারবেন না। মনে রাখতে হবে, এটিকে তৃতীয় নয়ন বলে। একজন সফল পেশাদার ফটোগ্রাফার বা স্পোর্টস ফটোগ্রাফার হতে হলে আপনাকে কিছু বিষয় অনুসরণ করতে হবে। তাই সবদিকে মনোযোগ রাখতে হবে। চ্যালেঞ্জিং মনোভাব থাকতে হবে। উদ্যমী হতে হবে। নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকতে হবে। অ্যাডোবি ফটোশপ, লাইটরুম প্রভৃতি সফটওয়্যারের ব্যবহার ফটোগ্রাফিতে গুরুত্বপূর্ণ। তাই নিত্যনতুন ফটোগ্রাফিক টার্মগুলো সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। ফটোগ্রাফিক সফটওয়্যারগুলো সম্পর্কে জানতে হবে। ফটোগ্রাফিকে পেশা হিসেবে নিতে চাইলে উপরিউক্ত বিষয়গুলো মাথায় রাখলে ক্যারিয়ারে সাফল্য আসবেই।

নিরীক্ষা: কর্মজীবন কীভাবে শুরু হয়েছিল?
শামসুল হক টেংকু: আমার চাচির কালার ল্যাব ছিল। সেখানে কিছুদিন কাজ করার পর ১৯৮৬ সালে সাপ্তাহিক তারকালোকে কাজ শুরু করি। সাপ্তাহিক আগামীতে স্পোর্টসে কাজ করা, সাপ্তাহিক মূলধারা, দৈনিক আজকের কাগজ দিয়ে দৈনিক পত্রিকায় কাজ করা শুরু। এরপর তো অনেক দৈনিক পত্রিকায়ই কাজ করেছি। বর্তমানে আছি প্রথম আলোর স্পোর্টস ফটো জার্নালিস্ট হিসেবে।

নিরীক্ষা: কাজের ক্ষেত্রে কোনো আইডল আছে কি না?
শামসুল হক টেংকু: আইডল, পথপ্রদর্শক, অনুকরণীয়, দিক-নির্দেশক, যা-ই বলেন না কেন সব ছিলেন আমার চাচা। যার কাছ থেকে আমি ক্যামেরা ধরা শিখেছিলাম। আমি যখন প্রফেশনালে আসি, তখন তো সেভাবে স্পোর্টস ফটোগ্রাফার ছিল না। যেহেতু আমি খেলাধুলা করতাম, তাই এখানেই কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি।

নিরীক্ষা: দেশে নিজের চেনা পরিবেশ ছেড়ে বাইরের অচেনা জায়গায় কাজের অনুভূতি কেমন?
শামসুল হক টেংকু: আমি শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছাড়া প্রায় সব দেশেই গিয়েছি ক্রিকেট কাভার করতে। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন পরিবেশ– একটু রোমাঞ্চ তো কাজ করবেই। আর কাজের পরিবেশ বলতে আমার যা মনে হয়, অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে মিডিয়া ফেসিলিটিজ বেশি। বিশেষ করে ক্রিকেটে। এটা শুধু আমার অনুভূতি নয়, বাইরের অনেক সাংবাদিকও আমাকে এ কথা বলেছেন। আমার একটি অভিজ্ঞতার কথাই বলি– আমি যখন ইংল্যান্ডে গেলাম খেলা কাভার করতে, কেমন যেন ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেলাম। লর্ডসে খেলা কাভার করতে গিয়ে ইন্টারনেট আমাদের নিজের কিনতে হয়েছে। তাছাড়া খেলা শুরুর প্রায় চার ঘণ্টা আগে যেতে হয়। নির্দিষ্ট জায়গায় বসতে হবে। জায়গা না নিলে আর জায়গা পাওয়া যায় না। দাঁড়িয়ে ছবি তোলা যায় না। আমাদের দেশে তো যে কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে ছবি তোলা যায়, সেখানে তা সম্ভব নয়। আগে থেকে বলে রাখতে হবে, এখানে আমি দুই ঘণ্টা বসে ছবি তুলব, তারপর অন্য জায়গায় বসে তুলব। দুই ঘণ্টা পর তারাই এসে সেই জায়গায় নিয়ে যাবে। এরকম অনেক ধরাবাধা নিয়ম মেনে চলতে হয়। সে তুলনায় আমাদের দেশে কাজ করা অনেক রিলাক্স। বাংলাদেশে দেশি-বিদেশি সব সাংবাদিকের জন্যই মিডিয়া ফেসিলিটিজ এককথায় চমৎকার।

নিরীক্ষা: একজন স্পোর্টস ফটোগ্রাফার হিসেবে কোনো অপ্রাপ্তি বা অতৃপ্তি...।
শামসুল হক টেংকু: আগেই বলেছি, এটি একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা। তারপরও সবার সহযোগিতা পেলে দেশের স্পোর্টস ফটোগ্রাফাররা আরো ভালো করবেন বলে আমি আশা করি। একজন ফটোগ্রাফার পত্রিকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ছবি ছাড়া পত্রিকা চলেই না। ছবি লাগবেই। সে তুলনায় ফটোগ্রাফাররা অবহেলিত। এখনো অনেক মিডিয়ায় দেখা যায় নিজস্ব ক্যামেরা ব্যবহার করতে হয়। মিডিয়াগুলো যদি এরকম সহযোগিতা যেমন- ক্যামেরা, ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা জ্যাকেট প্রভৃতি দেয়, তাহলে তারা আরো স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারবে। বর্তমানে অনেক শিক্ষিত ছেলেমেয়ে এ পেশায় আসছে। তাদের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে পারলে আরো ভালো করবে। তাছাড়া বাইরে খেলা কাভার করতে রিপোর্টারের পাশাপাশি স্পোর্টস ফটোগ্রাফারও পাঠাতে সহযোগিতা করতে পারে পত্রিকাগুলো।

নিরীক্ষা: সময় দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
শামসুল হক টেংকু: আপনাকেও ধন্যবাদ।

মেয়েরাই এখন মেয়েদের ম্যাচ পরিচালনা করছে

— জলি আক্তার বাঁধন

জলি আক্তার বাঁধন। একযুগেরও বেশি সময় রেফারি হিসেবে নিজেকে ফুটবল অঙ্গনে জড়িয়ে রেখেছেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। বাংলাদেশে 'নারী রেফারি'! তাও একযুগ আগে। এসব জানতেই জলি আক্তার বাঁধন-এর সঙ্গে নিরীক্ষা'র পক্ষ থেকে কথা বলেছেন– দৈনিক ভোরের কাগজ-এর সাংবাদিক **বোরহান বিশ্বাস**

> মাঠে গিয়ে পোশাক চেঞ্জের তেমন কোনো ব্যবস্থা না থাকায় বাসা থেকেই আমরা তৈরি হয়ে যেতাম। ... কেউ কেউ বাজে মন্তব্যও করত। একটা বিব্রতকর অবস্থার মধ্য দিয়ে তখন আমাদের চলতে হতো

নিরীক্ষা: নারী রেফারি হিসেবে শুরুটা কীভাবে হলো?

জলি আক্তার বাঁধন: বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) আওতায় ২০০৫ সালের ২৬ জুন আমাদের রেফারি প্রশিক্ষণ শুরু হয়। দেশের ইতিহাসে প্রথমবার প্রশিক্ষণ নেয়া ওই ব্যাচে আমরা সাতজন নারী ছিলাম।

নিরীক্ষা: কার উৎসাহে বা প্রেরণায় প্রশিক্ষণে আসা?

জলি আক্তার বাঁধন: আমি ধোলাইপাড় স্কুলের ছাত্রী ছিলাম। প্রতিবছর স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ

নিয়ে বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ী হতাম। এমন একটি প্রতিযোগিতায়ই আমার রেফারি গুরু মোজাফফর স্যারের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরবর্তী সময় এলাকার হারুন ভাই ও মিজান ভাইয়ের উৎসাহে প্রশিক্ষণের পথে এগিয়ে যাই। বলা যায়, একেবারে হাতে ধরে শিখিয়েছেন তারা। তাদের কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

আরেকটি কথা যা না বললেই নয়– ২০০৫ সালে যখন আমাদের কাছে সবকিছুই নতুন, ওই সময় ইব্রাহিম নেছার স্যার, প্রয়াত মনির স্যার আমাদের যে সাহস দিয়েছেন তা কখনোই ভোলার নয়। তাঁরা মাঠে, মাঠের বাইরে উৎসাহ দিয়ে বলতেন, তোমাদের লেগে থাকতে হবে। টিকে থাকতে হবে।

নিরীক্ষা: ওই সময় 'পাছের লোকে কিছু বলেছে' কি?

জলি আক্তার বাঁধন: আমাদের এলাকা থেকে আমি আর ঝর্ণা আপা প্রশিক্ষণ নিতে যেতাম। প্রতিদিন সকালে তাদের (হারুন ভাই, মিজান ভাই) সঙ্গে আমরা অনুশীলনে যেতাম। তারাই আবার আমাদের বাসায় পৌঁছে দিতেন। এলাকার অনেকে অনেক কথা বলতেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই তখন মনটা খারাপ হয়ে যেত। কিন্তু মাঠে পৌঁছে গেলে আর ওসব কথা মনে রাখতাম না। বিড়ম্বনার আরেকটি বিষয় ছিল– সাধারণত মেয়েরা থ্রি-পিস পরেই অভ্যস্ত। কিন্তু মাঠে গিয়ে পোশাক চেঞ্জের তেমন কোনো ব্যবস্থা না থাকায় বাসা থেকেই আমরা তৈরি হয়ে যেতাম। গেঞ্জি, ট্রাউজার পরে আমরা যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতাম, সবাই বিস্ময়কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। কেউ কেউ বাজে মন্তব্যও করত। একটা বিব্রতকর অবস্থার মধ্য দিয়ে তখন আমাদের চলতে হতো। এক্ষেত্রে এলাকার কমিশনার আমির হোসেন আঙ্কেলের কথা অবশ্যই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করব। তিনি নিজে পরবর্তী সময় আমাদের রেফারি প্রশিক্ষণ নেয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন। এলাকার মানুষকে ডেকে মিটিং করে বুঝিয়েছেন, মেয়েগুলোকে সাপোর্ট দেয়া দরকার। তার ওই পদক্ষেপ আমাদের জন্য অনেক পজিটিভ ফল বয়ে এনেছে। ধীরে ধীরে এলাকার মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছে।

নিরীক্ষা: বাসা থেকে কেমন সাপোর্ট পেয়েছিলেন?

জলি আক্তার বাঁধন: কে কী বলবে না বলবে, এসব ভেবে প্রথমদিকে আম্মা খুব একটা রাজি ছিলেন না। পরে যখন কমিশনার আঙ্কেল বললেন, ও এটা চালিয়ে যাক; আমরা সাপোর্ট দেব। আম্মা তখন আর না বললেন না। পুরো পরিবারই আমার সঙ্গে থাকল। বড়োভাই মাঝেমধ্যে আমাকে নিয়ে যেতেন। কয়েক বছর পর পুরো দৃশ্যপট পাল্টে গেল– এখন সবাই আমাকে খেলোয়াড় বলেই চেনে। সম্মান দেয়।

নিরীক্ষা: প্রথম ম্যাচের অভিজ্ঞতা কী রকম ছিল?

জলি আক্তার বাঁধন: প্রথমবার অ্যাসিসটেন্ট রেফারি হিসেবে মাঠে নেমেছিলাম। ফুটবল ফেডারেশনের আওতাধীন স্কুল টুর্নামেন্ট ছিল সেটি। মনে কিছুটা দ্বিধা ছিল, প্রথম ম্যাচ কী করি! ভয়-সংশয় চেহারায় ফুটে উঠেছিল। মাঠে থাকা কর্মকর্তারা আমাদের অভয় দিয়ে বললেন, আপনাদের ভয় নেই। খেলার সময় যা সিদ্ধান্ত হয়, সেটিই দেবেন। ওই সময় মাঠে হারুন ভাই আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন। পেছন থেকে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। ১০-১৫ মিনিট চলে যাওয়ার পর জড়তা কেটে যায়। বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ। মাঠে মোবাইল ফোন নেয়া নিষেধ। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। তবে এটা বুঝতে সমস্যা হয়নি যে খেলাটি টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে। ম্যাচ শেষে যখন বাসায় ফিরছিলাম, এলাকায় পা রাখতেই শুরু হলো আমাকে নিয়ে মুখোরচক আলোচনা। শুনতে খারাপ লাগছিল না!

নিরীক্ষা: 'ছেলেদের খেলায় মেয়ে রেফারি'– এটি কীভাবে দেখা হতো?

জলি আক্তার বাঁধন: আমরা যখন মাঠে খেলা পরিচালনা করেছি, তখন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্টদের সবসময় সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমাদের কোনো সমস্যা না হয়। প্রথমাবস্থায় আমরা যখন মাঠে নামতাম, তখন ছোটখাটো ভুল হলে সেটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতেই সবাই দেখেছেন।

নিরীক্ষা: খেলার প্রয়োজনে ঢাকার বাইরে কোথায় কোথায় যাওয়া হয়েছে?

জলি আক্তার বাঁধন: রাঙামাটি, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সাতক্ষীরাসহ দেশের অনেক স্থানেই গিয়েছি।

নিরীক্ষা: ম্যাচ পরিচালনায় কোনো মজার অভিজ্ঞতা–

জলি আক্তার বাঁধন: বছরখানেক আগের কথা– আমরা তিন নারী রেফারি সাতক্ষীরা গিয়েছিলাম। প্রথম নারী ফুটবল টুর্নামেন্ট, পাশাপাশি প্রথমবার নারী রেফারির উপস্থিতি– সবার মাঝে দারুণ চাঞ্চল্য। মাঠের চারপাশে প্রচুর দর্শক। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। অনেকে গাছে উঠে গেছেন। সবার একটিই কথা, নারী রেফারি! নারী খেলোয়াড় তারা কালেভদ্রে দেখেছেন। কিন্তু নারী রেফারি! এই প্রথম। তাদের বিস্ময়ের যেন শেষ ছিল না।

নিরীক্ষা: দেশের বাইরে কি যাওয়া হয়েছে?

জলি আক্তার বাঁধন: না, দেশের বাইরে যাওয়ার জন্য বয়সের একটা ব্যাপার থাকে। আমরা যেহেতু ২০০৫ সালে প্রথম ব্যাচের ছিলাম। তাই অনেক সংকট পার হয়ে আমাদের আসতে হয়েছে। ফলে বাইরে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত বয়সটা আমাদের ছিল না। এখনকার মেয়েরা যে সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে, আমরা তখন সেই সুবিধাটুকু পাইনি।

নিরীক্ষা: ফিটনেস পরীক্ষা কি হয়?

জলি আক্তার বাঁধন: অবশ্যই। প্রতি শুক্রবার জাতীয় স্টেডিয়ামে আমাদের অনুশীলন হচ্ছে। দু-তিন মাস পর পর ফিটনেস পরীক্ষা হচ্ছে। প্রতি শুক্রবার শুধু ঢাকা নয়, ঢাকার বাইরে থেকেও অনেকে আসছেন। দু-তিন মাস পর পর যে ফিটনেস পরীক্ষা হচ্ছে, তাতে সারা দেশ থেকে রেফারিরা ঢাকায় আসছেন।

নিরীক্ষা: প্রশিক্ষণ নেয়া সাতজনই কি পরবর্তী সময়ে রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন?

জলি আক্তার বাঁধন: নানা পারিপার্শ্বিকতায় সেটি সম্ভব হয়নি। যেমন, আয়েশার কথা বলতে পারি। ও এখন নারী ক্রিকেটের ন্যাশনাল টিমে আছে। শিমুল আপা ধানমন্ডি মহিলা কমপ্লেক্সের একটি পদের দায়িত্বে রয়েছেন। রেহানা আপা আছেন বাংলাদেশ আনসারে। ইতু ম্যাম, ঝর্ণা তারা একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে আছেন। আমি নিজেও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তবে নানা ব্যস্ততার মাঝেও মাঠের সঙ্গে আমাদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। সময়-সুযোগ করে এখনো আমরা গেম পরিচালনা করি।

নিরীক্ষা: কোনো বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন?

জলি আক্তার বাঁধন: না, এ ধরনের পরিস্থিতিতে কখনো পরিনি। সবাই খুব ভালো মনের ছিলেন। কখনো কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। বরং আমাদের এলাকার যেসব ছেলে খেলাধুলার সঙ্গে জড়িত ছিল, প্রায়ই আমরা একসঙ্গে স্টেডিয়াম যেতাম।

নিরীক্ষা: নারী রেফারিদের বর্তমান অবস্থা কেমন মনে হয়?

জলি আক্তার বাঁধন: আগের চেয়ে এখন অনেক বেটার। এখনকার মেয়েরা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। ওরা এখন আবাসিকভাবে থাকা-খাওয়ার সুবিধা পাচ্ছে। ঢাকার বাইরে যখন কেউ যাচ্ছে, সঙ্গে টেককেয়ার করার মতো লোকও থাকছে। আমরাও এসব পেয়েছিলাম, তবে এখনকার মতো অতটা না।

নিরীক্ষা: এ পর্যন্ত সেরা অর্জন কী?

জলি আক্তার বাঁধন: ২০১০ থেকে ২০১৭ সাল– বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপে নিয়মিত ছিলাম। ফাইনাল ম্যাচগুলো পরিচালনা করেছি। এ উপলক্ষ্যে প্রতিবছরই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফাইনাল ম্যাচে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাদের এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেন। ফুটবল নিয়ে তার আগ্রহের কথাও আমরা জানি। প্রধানমন্ত্রীর মতো একজন ক্রীড়ানুরাগী মানুষের কাছাকাছি যেতে পারাটা সৌভাগ্য বলে আমি মনে করি। আমার রেফারি জীবনে এটা একটা বড় পাওয়া।

নিরীক্ষা: আগামী দিনে যারা আসতে চায়, তাদের জন্য কী পরামর্শ থাকবে?

জলি আক্তার বাঁধন: নতুনদের অবশ্যই স্বাগত জানাব। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন, বাংলাদেশ রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশন নারী খেলোয়াড়দের প্রতি যে কেয়ার নিচ্ছে, এটা বজায় থাকলে আগামী দিনে মেয়েরা অনেক দূর এগিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। জয়া চাকমা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (বিকেএসপি) আছে। অন্যজন সালমা। নেপাল গেছেন খেলা পরিচালনার জন্য।

আগে মেয়েদের খেলায় ছেলেরা বাঁশি বাজাত। ধীরে ধীরে মেয়েরা অ্যাসিসটেন্ট ও ফোর্ড অফিশিয়াল হিসেবে কাজ করতে শুরু করল। বর্তমানে মেয়েদের খেলায় মেয়েরাই পুরো ম্যাচ পরিচালনা করছে। ম্যাচ রেফারি, অ্যাসিসটেন্ট, ফোর্ড অফিশিয়াল এবং ম্যাচ কমিশনার– সব কাজই এখন নারীরা করছেন।

'রেফারি' বিষয়টা রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। খেলা পরিচালনার জন্য হোক কিংবা সময় কাটানোর জন্যই– মাঠের সবুজ ঘাসের কাছাকাছি গেলে উদ্যম ফিরে পাই।

নিরীক্ষা: সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

জলি আক্তার বাঁধন: নিরীক্ষাকেও ধন্যবাদ।

বাংলার দুই পথিকৃৎ ক্রীড়াবিদ

বিনয় দত্ত

> মাইকেল ফেল্পস, জনি ওয়াইজমুলার, ক্যালেব ড্রেসেল, অ্যাডাম পিয়েটি, ফ্রাঙ্ক বেকেনবাউয়ার, ... এ অঞ্চলে ফুটবল এবং সাঁতারে এমন দুইজন গুণী মানুষ ছিলেন তাঁদের কথা আমাদের বারবার স্মরণ করা উচিত

শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, বিনোদন, খেলাধুলায় এখন বাংলাদেশের নামটি বেশ ভালোভাবেই সবাই চেনে ও জানে। কিন্তু এই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির জন্মের আগে আমাদের এই অঞ্চলে এমন সব গুণী মানুষের জন্ম হয়েছিল, যারা এখন আমাদের কাছে অতীত। শুধু স্বাধীন রাষ্ট্র না হওয়ায় তাঁদের অবহেলায় হারিয়ে যেতে হয়েছে। মাইকেল ফেল্পস, জনি ওয়াইজমুলার, ক্যালেব ড্রেসেল, অ্যাডাম পিয়েটি, ফ্রাঙ্ক বেকেনবাউয়ার, জোহান ক্রুইফ– এ নামগুলো যেমন পৃথিবীর মানুষ জানে, তেমনি জানে তাঁদের কৃতিত্ব। এ অঞ্চলে ফুটবল এবং সাঁতারে এমন দুইজন গুণী মানুষ ছিলেন তাঁদের কথা আমাদের বারবার স্মরণ করা উচিত। প্রথমজন জলের রাজা ব্রজেন দাশ এবং দ্বিতীয়জন ফুটবল জাদুকর সৈয়দ আবদুস সামাদ।

জলরাজ ব্রজেন দাশ

'জলের সঙ্গে প্রেম' কথাটি রূপক মনে হলেও সত্যিকার অর্থে অনেকেই জলের সঙ্গে ঠিকই প্রেম ঘটিয়েছেন। শুধু প্রেমই নয় বরং জলেই নিজের আবাস, অবস্থান এবং অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিলেন অনেকেই। সেসব জলপ্রেমীর কথা কমবেশি সবাই না জানলেও আমাদের এ অঞ্চলে একজন জলের রাজা ছিলেন। তার কথা অনেকেরই হয়তো অজানা। তিনি এমন একজন জলের রাজা ছিলেন, যিনি একাধিকবার ইংলিশ চ্যানেলের মতো মহাসংকটপূর্ণ চ্যানেলটি পাড়ি দিয়েছেন। তাঁর নাম ব্রজেন দাশ। তাঁকে 'কিং অব দ্য চ্যানেল' অর্থাৎ ইংলিশ চ্যানেলের রাজা নামেও ডাকা হয়।

মহান এ মানুষটির জন্ম ১৯২৭ সালের ৯ ডিসেম্বর তৎকালীন পাকিস্তানের মুন্সীগঞ্জের কুচিয়ামোড়া গ্রামে। ব্রজেনের বাবা হরেন্দ্র দাশ খুব সাধ করে সন্তানের নাম রেখেছিলেন ব্রজেন। ব্রজেন শব্দের অর্থ 'স্বর্গের রাজা'। বাস্তবে ব্রজেন দাশ স্বর্গের রাজা না হলেও হলেন 'ইংলিশ চ্যানেলের রাজা'।

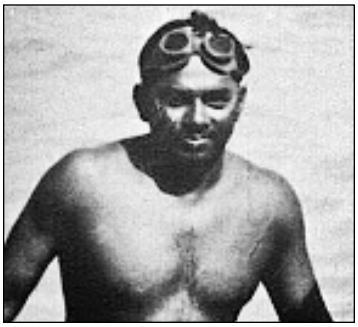

ব্রজেন দাশের সঙ্গে জলের প্রেম ঘটে ছোটবেলায়। তার ছেলেবেলা কেটেছে ধলেশ্বরী নদীতে। কলাগাছ নামিয়ে সাঁতার কাটতেন। ঢাকার ফরাশগঞ্জে চলে আসার পর ব্রজেনের সঙ্গী হয় বুড়িগঙ্গা। স্কুলে পড়ার সময় বুড়িগঙ্গা নদীতে দীর্ঘ সময় পার করেছেন। বুড়িগঙ্গায় এত দীর্ঘ সময় পার করেছেন যে, বলার অপেক্ষা রাখে না। একরকম বলা যায়, বুড়িগঙ্গার বদৌলতে ব্রজেন দাশ এত বড়ো সাঁতারু বনেছেন

এ সময়টাতে ব্রজেনের সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন তাঁর বাল্যবন্ধু দিব্যেন্দু গুহ। দিব্যেন্দু গুহ ১৯৯২ সালে কলকাতার 'আলোকপাত বিশেষ' কাগজে লিখেছিলেন, 'শ্রাবণের ভরা বর্ষায় ছুটির দিনে আমরা দলবেঁধে বুড়িগঙ্গায় সাঁতার কাটতে এসেছি। বুড়িগঙ্গার উথাল-পাথাল ঢেউ দেখে আমরা পাঁচ-ছয়জন হয়তো আধঘণ্টা পরই উঠে এসেছি। কিন্তু ব্রজেন সেই ভরা নদীতে ততক্ষণে ওপার পাওয়ার পথে! আমরা ওর কাণ্ড দেখে চিৎকার করে ডেকেছি, 'লাড্ডু ফিরা আয়, আইজ ওপারে যাইস না। নদীর অবস্থা আজ ভালো না। লা-ড্ডু ফিরা আয়।' কিন্তু লাড্ডু মানে আমাদের ব্রজেন ফেরেনি। সে ওপারে উঠেই ছেড়েছে। মাঝেমধ্যে আমরাও ওর সঙ্গে সাঁতরে ওপারে গিয়ে ফেরিতে ফিরে এসেছি। ব্রজেন ওপারে দু-চার মিনিট দম নিয়ে সাঁতরেই এপারে ফিরেছে।'

১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের আগে তিনি কলকাতায় যান। সেখানে বিদ্যাসাগর কলেজে পড়াশোনা শুরু করেন। তখন প্রফুল্ল ঘোষের সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে নিয়মিত অনুশীলন করতেন ব্রজেন। এ ক্লাবের হয়ে তিনি ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জেতেন।

১৯৫২ সালে গোটা পশ্চিমবঙ্গে ১০০ মিটার সাঁতার প্রতিযোগিতা জেতার পর ব্রজেনের নাম ছড়িয়ে পড়ে সবদিকে। দেশে ফিরে ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১০০, ২০০, ৪০০ ও ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে তাকে কেউ হারাতে পারেনি। সেই সময় পাকিস্তান অলিম্পিকে সাঁতার প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম হন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান অলিম্পিকের জাতীয় অ্যাথলেটিকস আসরে ১০০ ও ৪০০ মিটার সাঁতার জেতার পর ব্রজেনের মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মায়। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১০০, ২০০, ৪০০ এবং ১৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে ব্রজেন দাশ ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি নিশ্চিত ছিলেন তাকে মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিকে পাঠানো হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলেও সত্যি, ব্রজেন দাশকে সেই প্রতিযোগিতায় পাঠানোই হয়নি। সেনাবাহিনীর চার সাঁতারুকে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাঠানো হয়েছিল মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিকে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী ছিলেন বলে তাকে উপেক্ষা করা হয়।

নব্বইয়ের দশকের নামিদামি সাময়িকী 'ক্রীড়া জগত'-এ 'আমার কথা'তে ব্রজেন দাশ আক্ষেপ করে বলেন, 'পুরো পাকিস্তান সাঁতারে আমি 'একমেবাদ্বিতীয়ম'। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আমাকে দলভুক্ত করা হলো না। এর পরিবর্তে পশ্চিম পাকিস্তান সাঁতারুদের নেওয়া হলো। আমার মন ভেঙে যায়। তথাপি কিছু করার বা বলার নেই। কিন্তু আমার মনে দারুণ জেদ চাপল। কিছু একটা করার প্রবল ইচ্ছা হলো। সাঁতারে চমকপ্রদ এমন কিছু করতে হবে, যেন পশ্চিম পাকিস্তানের টনক নড়ে।'

এই অপমান, অবহেলা, তাচ্ছিল্যে ব্রজেন দাশ দমে যাননি বরং নিজের দক্ষতা, যোগ্যতা প্রমাণে তিনি সর্বোচ্চ সচেষ্ট হয়ে উঠেন। তিনি যে দমে যাওয়ার মানুষ নন, তা তাঁর সেই সময়ের কথা শুনলেই বোঝা যায়। তিনি বলেন, 'একদিন রোজকার মতোই খবরের কাগজ পড়ছিলাম। কলকাতার কোনো এক পত্রিকা। পড়তে পড়তে হঠাৎ এক জায়গায় চোখ আটকে গেল। কোনো এক সাঁতারু চারবার চেষ্টা করেও চ্যানেল অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ তাকে নিয়ে ঢালাওভাবে লেখা হয়েছে। ঘটনাটি আমার মনে দাগ কাটে। তাছাড়া চ্যানেলের কথা আগে কখনো শুনিনি। ভাবলাম, চ্যানেল অতিক্রম করতে পারলে বোধহয় কিছু একটা করা যাবে। তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাকে চ্যানেল অতিক্রম করতেই হবে।'

শুরু হয় তার প্রস্তুতি পর্ব। এ প্রস্তুতিতে তিনি হার মানার নন। পশ্চিম পাকিস্তানকে তিনি দেখিয়ে দিতে চান, তাঁর মধ্যে সর্বোচ্চ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাকে অবহেলা করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যেখানে একটি শোল মাছ তাকে হারাতে পারেনি, সেখানে পাকিস্তান সরকার তো কিছুই নয়। ব্রজেন দাশের জীবনী থেকে জানা যায়, সেই সময় তার বাবা হরেন্দ্র দাশ থাকতেন ঢাকা শহরে। ব্রজেন আর তাঁর মা থাকতেন দেশের বাড়িতে। বাড়িতে যে কাজের ছেলেটি ছিল, সে প্রতিদিনই কাজের ফাঁকে সামনের পুকুরে বড়শি ফেলত মাছ ধরার আশায়। একদিন কাজের ছেলেটি খেতে গিয়েছিল, এই ফাঁকে ব্রজেন নিজেই চুপি চুপি গিয়ে বড়শি ফেলেন। কিছুটা সময় যাওয়ার পর হঠাৎ বড়শি টেনে নিয়ে যাচ্ছে এক মাছ। ব্রজেন একদিকে বড়শি ধরে টানছেন, অন্যদিকে মাছ তার শক্তি দিয়ে টানছে। টানাটানিতে ব্রজেন পানিতে পড়ে যান। পানিতে পড়ে ছোট্ট ব্রজেন চিৎকার করায় তাঁর মা ছুটে এসে তাকে পানি থেকে তুলে আনেন। তখন পর্যন্ত ব্রজেন বড়শি ছাড়েননি। শক্ত হাতে ধরে রেখেছিলেন। ব্রজেন তখন আবিষ্কার করেন, বড়শির সুতায় বড়ো এক শোল। পানিতে পড়ে ব্রজেন অনুধাবন করলেন, পানিতে পড়লে নিজেরই পানি থেকে উদ্ধার পেতে হবে, অতএব সাঁতার শেখা আবশ্যক। সেই শোলই ব্রজেন দাশকে সাঁতারের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিকে যখন ব্রজেন দাশকে পাঠানো হলো না, তখন তিনি নিজেকে প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করা শুরু করেন।

১৯৫৭ সালে একনাগাড়ে ১২ ঘণ্টা সাঁতার কাটলেন ব্রজেন। ধাপে ধাপে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে লাগলেন। এরপর টানা ২৬ মাইল সাঁতার কাটলেন। তারপর একনাগাড়ে ৪৮ ঘণ্টা। এ সময় তিনি ঢাকা-চাঁদপুর দূরপাল্লার সাঁতারেও অংশ নিয়েছিলেন। ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারে অংশ নেওয়ার মাসখানেক আগে ইতালির কাপরি দ্বীপ থেকে নেপলস পর্যন্ত সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে দ্বিতীয় হন তিনি।

১৯৫৮ সালে প্রথম চেষ্টাতেই এশিয়ার প্রথম সাঁতারু হিসেবে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন ব্রজেন দাশ। প্রথম বাঙালি হিসেবে ব্রজেন দাশ ইতিহাসে নিজের নাম যুক্ত করেন। 'বিলি বুলেটিন চ্যানেল ক্রসিং' নামের এ প্রতিযোগিতায় ২৩টি দেশের মোট ৩৯ জন সাঁতারু অংশ নিয়েছিলেন।

পরবর্তী তিন বছরে ব্রজেন টানা পাঁচবার ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন। এর আগে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়ার রেকর্ড ছিল ১০ ঘণ্টা ৫০ মিনিট। ১৯৬১ সালে শেষবার পাড়ি দেন ব্রজেন। সেই সময় তিনি দীর্ঘ ১১ বছরের পুরোনো বিশ্বরেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়েন। তার নতুন রেকর্ড ১০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট। সর্বোচ্চ ছয়বার ও সবচেয়ে কম সময়ে পাড়ি দেওয়ার দুটি কীর্তি জায়গা পেয়েছিল গিনেস বুকে। রানী এলিজাবেথ ব্রজেন দাশের মহান কীর্তিতে শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়ে বলেন, 'চমৎকার কৃতিত্ব। মি. দাশ, আপনি তো ইংলিশ চ্যানেলকে নিজের স্নানঘরে পরিণত করেছেন।'

এরপর ইংল্যান্ডের চ্যানেল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে 'কিং অব দ্য চ্যানেল' তকমা দেয়। পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পদক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়।

১৯৬৮ সালের ৬ মে প্রকাশিত বিশ্বের খ্যাতনামা ক্রীড়া সাময়িকী 'স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেড'কে ইংলিশ চ্যানেল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের রিটায়ার্ড অনারারি সেক্রেটারি জন উড বলেছিলেন, 'চ্যানেল আপনার ইচ্ছাশক্তি আর সহ্যক্ষমতা কেড়ে নেবে। যেসব সাঁতারু ভুগতে ভালোবাসেন, শান্তির লোভে তারা চলে যান চ্যানেলে। বরফশীতল ঠাণ্ডা পানি আর বিরতিহীন ঢেউয়ের সঙ্গে কমপক্ষে ২০ ঘণ্টা যুদ্ধ করতে হয় সাঁতারুদের। সেটা গ্রিসের জিরাগানোস, যুক্তরাষ্ট্রের চ্যাডউইক কিংবা পাকিস্তানের ব্রজেন দাশের পক্ষে সম্ভব।'

ব্রজেনের কাছে ইংলিশ চ্যানেলে সাঁতার স্রেফ প্রতিযোগিতা হয়েই থাকেনি। ওই ঠান্ডা জল তাঁর জীবনতৃষ্ণা মেটাত। ১৯৮৪ সালে কলকাতার 'দৈনিক বর্তমান' এর প্রতিবেদক হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপচারিতায় ব্রজেন দাশ বলেন, 'আমার যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী, ইহকাল, পরকালকে ইংলিশ চ্যানেল আজও হাতছানি দিয়ে ডাকে। মনে মনে ছুটে যাই চ্যানেলের কালো মিশমিশে জলের রাজপ্রাসাদে, যেখানে সদাসর্বদা বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে অগুনতি জেলি ফিশ আর নাম না জানা সামুদ্রিক প্রাণীরা।'

১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র অলিম্পিক সুইমিং দলের অ্যাডভাইজার হিসেবে দেশটির সরকারি সফরে গিয়েছিলেন ব্রজেন দাশ। সেখানে তিনি মাসব্যাপী সফরে ২৫টিরও বেশি অঙ্গরাজ্য সফর করেন। তার প্রশিক্ষণ নিয়ে মার্কিন সাঁতারু দল টোকিও অলিম্পিকের প্রস্তুতি নিয়েছিল। ব্রজেন দাশ নিজেও বেশ ভালো সাড়া ফেলেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে।

ব্রজেন দাশ শুধু একজন কিংবদন্তি সাঁতারু ছিলেনই না, একজন চলচ্চিত্রপ্রেমিকও ছিলেন তিনি। রুপালি পর্দা, সেলুলয়েড ফিতার প্রতি প্রেম ছিল তার বেশ। সেই সময় তিনি কয়েকটি চলচ্চিত্র প্রযোজনার পাশাপাশি 'গোপাল ভাঁড়' সিনেমায় অভিনয়ও করেছিলেন। তাঁর প্রযোজিত উত্তম-সুপ্রিয়া জুটির 'স্ত্রী' সিনেমাটি সেই সময়ে সুপারহিট হয় এবং সিনেমাটির আবেদন আজ পর্যন্ত একই রকম থাকে দর্শকের কাছে।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী এই সাঁতার শিল্পী রাষ্ট্রের কাছে ছিলেন অবহেলিত। তাই নিজের ছেলেমেয়েদের সাঁতারে আগ্রহের ব্যাপারে জানতে চাইলে 'আমাদের বিক্রমপুর' দৈনিকের এক সাক্ষাৎকারে ব্রজেন দাশের স্ত্রী মধু ছন্দা দাশ বলেন, 'জানেন তো, ময়রার ছেলে সন্দেশ খায় না।' অভিমানী এই উত্তর থেকে খুঁজে পাওয়া যায় তারা কেউই চাননি, ছেলেমেয়েরা এই পথে হাঁটুক। পূর্ব পাকিস্তান থেকে শুরু করে স্বাধীন জন্ম নেওয়া রাষ্ট্র বাংলাদেশে ব্রজেন সম্মান রক্ষার্থে এমন কিছুই করা হয়নি, যার জন্য তার ছেলেমেয়েরা সাঁতারকে ভালোবাসবেন।

মধু ছন্দা আরো বলেন, 'তিনি আসলে চারপাশের মানুষের মধ্যে থেকেও একা ছিলেন। বড় নিঃসঙ্গ। শোষণ-বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। মুখ ফুটে বলতে পারেননি।'

কথিত আছে, ব্রজেন দাশকে জহরলাল নেহরু প্রস্তাব দিয়েছিলে– সুইমিংপুল আর বাড়িগাড়ি করে দেবেন। বিনিময়ে সেইখানে তরুণ সাঁতারুদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। বেশ লোভনীয় ছিল সেই প্রস্তাব। কিন্তু দেশের প্রতি ভালোবাসার কারণে তিনি সেই লোভনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করেননি।

মধু ছন্দার কাছ থেকে আরো জানা যায়, 'একই ধরনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও। রাওয়ালপিন্ডিতে রাখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সুইমিংপুল, বাড়ি-গাড়ি সব দিবেন। কিন্তু তিনি মাটি কামড়ে পড়ে থাকলেন দেশে।'

১৯৮৫ সালে দ্য গ্রেটেস্ট মোহাম্মদ আলী বলেছিলেন, 'তুমি চ্যানেলের রাজা, আমি বক্সিংয়ের। কিন্তু আমার কাছে তোমার অর্জনই সেরা।'

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ সরকার মতিঝিলে আট কাঠা জায়গা বরাদ্দ দিয়েছিল ব্রজেন দাশকে। পাশে অন্য একজনের জায়গা ছিল। তিনি প্রস্তাব করলেন, বেশি জায়গা পেলে একটা সিনেমা হল বানাবেন। চাপের মুখে ব্রজেন দাশ পানির দামে সেই জমি বিক্রি করে দেন। আজ সেই সিনেমা হলের নাম 'মধুমিতা'।

মহান এই সাঁতারশিল্পী ১৯৯৮ সালের ১ জুন কলকাতায় দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর আগে তার একটাই অপূর্ণ ইচ্ছা ছিল, যা আর পূরণ হলো না। তিনি বলতেন, 'ষাটের পর আরেকবার চ্যানেল পার হতে পারলে ভালোই লাগত।' ইংলিশ চ্যানেলের প্রতি তাঁর প্রেম ছিল প্রকট, সেই প্রেম নিয়েই ব্রজেন দাশ হয়তো অন্য কোনো গ্রহে দিব্যি সাঁতার কাটছেন। তার স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের সবারই উচিত সরকারি-বেসরকারি পর্যায় থেকে শুরু করে পাঠ্যপুস্তকেও মহান এই সাঁতারশিল্পীর সব অবদান অন্তর্ভুক্ত করা।

ফুটবল জাদুকর সামাদ

ফুটবল ইতিহাসে পেলে, ডিয়াগো ম্যারাডোনা, জিনেদিন জিদান, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, লিওনেল মেসি, নেইমার বা অন্য অনেক ফুটবল তারকার নাম এখন আমাদের মুখে মুখে। খেলার মাঠে তাদের ফুটবল জাদু দেখার জন্য আমাদের আগ্রহের কমতি নেই। নব্বই মিনিট খেলার প্রতিটা মুহূর্ত, প্রতিটা ক্ষণ তারা আমাদের অস্থির করে রাখেন দুই পায়ের জাদুতে। একটি বল ছুটছে, তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে হাজারও চোখ। ফুটবলাররা তাদের মেধা, দক্ষতা আর জাদুকরী খেলার নৈপুণ্যে দর্শকদের বিনোদিত করেন।

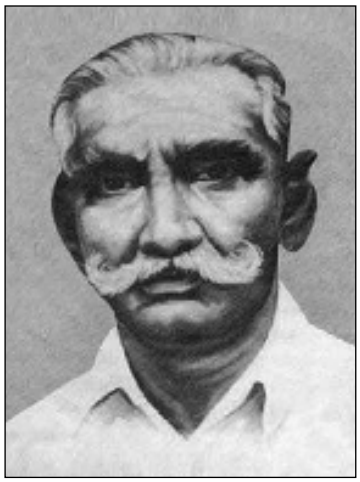

ফুটবলের এসব তারকা-মহাতারকারও আগে আমাদের এই উপমহাদেশে একজন মহান ফুটবল কিংবদন্তির জন্ম হয়েছিল। সৈয়দ আবদুস সামাদ তাঁর নাম। তাঁকে বলা হতো উপমহাদেশের ফুটবলবিস্ময়। আমাদের সবারই দুর্ভাগ্য তিনি এমন একসময়ে, এমন এক জায়গায় জন্মেছেন, এই সময়ের ফুটবলপ্রেমীদের অনেকেরই তার কথা অজানা। তার দুর্ভাগ্য, তার জন্ম হয়েছিল পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে অনগ্রসর এক ভূখণ্ডে। সেই সময় এই উপমহাদেশ এতটাই অনগ্রসর ছিল, তখন টিকে থাকার দায় ছিল সবার। তখন খেলাধুলার প্রতি কারো তেমন আগ্রহ ছিল না। নয়তো, ফুটবল ইতিহাসের এক অনন্য নাম হিসেবে আজ সবাই সৈয়দ আবদুস সামাদকে স্মরণ করত।

১৮৯৫ সালের ৬ ডিসেম্বর ব্রিটিশ-ভারতের বিহারের পূর্ণিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন সৈয়দ আবদুস সামাদ। তার বাবা সৈয়দ ফজলুল বারী সরকারি চাকরি করতেন। চাকরি সূত্রে তিনি থাকতেন বিহারের পূর্ণিয়া জেলায়। সামাদ নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাকে সবাই ডাকত 'জাদুকর সামাদ' নামে।

ছেলেবেলা থেকেই তার ফুটবলপ্রীতি ছিল ভয়ানক। যেই সময়টাতে শিশুদের পড়াশোনায় মনোযোগী হওয়ার কথা, সেই সময় সামাদ ফুটবলের প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়েন। ফুটবলের প্রতি আসক্তি এবং ফুটবল প্রতিভা মিলে সামাদের জয়জয়কার সবদিকে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে তিনি আর আগাননি। এ সময়ই ফুটবল খেলার প্রতি পুরোপুরিই মনোযোগী হয়ে উঠেন। সারা দিন তিনি বাসায় কম, মাঠেই পড়ে থাকতেন বেশি।

ইতিহাস বলে, তাঁর গতি ছিল চিতা বাঘের মতো। ১৯১২ সালে তিনি কলকাতা মেইন টাউন ক্লাবে যোগদান করেন। পূর্ণিয়ার জুনিয়র একাদশে তিনি ফুটবল খেলা শুরু করেছিলেন। সেইখানেই তিনি সবাইকে মাত করে দেন। খুব অল্প বয়সেই কলকাতার বড়ো বড়ো ক্লাবের কোচ-ম্যানেজাররা তাঁর বাড়িতে ভিড় জমাতে থাকেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই তিনি ফুটবল খেলতে পাড়ি জমান সে সময়ের সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও খেলাধুলা চর্চার পীঠস্থান কলকাতা মহানগরে।

১৯২৪ সালে সামাদ ভারতের জাতীয় ফুটবল দলে নির্বাচিত হন এবং ১৯২৬ সালে তাকে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সবচেয়ে বড়ো কথা, তিনি সেই সময় অবিভক্ত ভারতবর্ষের জাতীয় দলের অধিনায়ক। তিনি সে সময় ভারতের হয়ে মিয়ানমার, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, চীন ও ইংল্যান্ড সফর করেন।

সামাদের বিশেষত্ব ছিল স্প্রিন্ট, ড্রিবলিং, শুট মেজারমেন্ট, পাওয়ার শুট। তার ড্রিবলিং ছিল মনোমুগ্ধকর। এর মধ্যে তার শুট মেজারমেন্ট এবং ফিল্ড মেজারমেন্ট ছিল অনন্য ও নির্ভুল। সামাদ যদি এই সময়ে জন্মাতেন, তাহলে তার শুট মেজারমেন্ট এবং ফিল্ড মেজারমেন্ট নিয়ে আলাদা করে গবেষণা করা হতো এবং সেই গবেষণাপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হতো। শুধু তা-ই নয়, তার শুট মেজারমেন্ট এবং ফিল্ড মেজারমেন্ট নিয়ে তিনি নিজেই অসংখ্য ঘটনার জন্ম দিয়েছিলেন সেই সময়।

জাতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ একটি ম্যাচ। প্রতিপক্ষ চীন। সামাদও খেলছেন এই ম্যাচে। খেলার পরিস্থিতি চীনের অনুকূলে। সর্বভারতীয় দলের সবাই চিন্তিত। চীনের খেলোয়াড়রা খুব ভালো খেলছিল। তারা পরপর তিনটা গোল দিয়ে দেয়। ৩-০ গোলে এগিয়ে আছে চীন ভারতবর্ষের বিপক্ষে। ভারতবর্ষের সবাই খুব বিপাকে আছেন। সবাই নিশ্চিত এই ম্যাচে ভারতবর্ষ হারছে। ম্যাচটা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতি ঘুরিয়ে রূপকথার মতো ইতিহাস তৈরি করলেন ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান খেলোয়াড় সামাদ। ৩-০ গোলে পিছিয়ে পড়া ম্যাচটার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন তিনি একাই। একাই চারটি গোল দিলেন। এ যেন রূপকথা। সামাদ যেন রূপকথার নায়ক। তিনি সেদিন মাঠে নতুন করে রূপকথার সৃষ্টি করলেন। ভারতবর্ষ জিতে গেল ৪-৩ গোলে। সামাদ ছিলেন অসম্ভবকে সম্ভব করার সেই কারিগর।

এই ধরনের অসম্ভব ঘটনা সামাদের জন্য ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। তখন ব্রিটিশদের শাসনকাল। সর্বভারতীয় ফুটবল দল গেল লন্ডনে। গ্রেটব্রিটেন ফুটবল দলের বিরুদ্ধে ফুটবল ম্যাচ। গ্রেটব্রিটেনের সবাই ভারতবর্ষের ফুটবলারদের খুবই খাটো করে দেখছে। তাদের আচার-আচরণে কেমন তাচ্ছিল্যের ভাব স্পষ্ট। কারণ যেই ভারতবর্ষকে তারা শাসন করে, সেই ভারতবর্ষ এসেছে তাদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে। বিষয়টি কোনোভাবেই মানা যায় না। গ্রেটব্রিটেনের খেলোয়াড়রা ভারতবর্ষের খেলোয়াড়দের সঙ্গে ফুটবল খেলার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করছিল না। কিন্তু সর্বভারতীয় ফুটবল দলের এই সফরে সামাদ নামে একজন কিংবদন্তি ফুটবলার ছিলেন, যার কথা তারা জানে না।

গ্রেটব্রিটেন ফুটবল দলকে গুনে গুনে এক হালি গোল দেবেন বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বসলেন সামাদ। গ্রেটব্রিটেন তখন অনেক শক্তিশালী ফুটবল দল। সামাদের কথা শুনে পুরো লন্ডন নড়েচড়ে বসল। এমন ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি। যেখানে গ্রেটব্রিটেনের সঙ্গে খেলতে বড়ো বড়ো শক্তিশালী দলগুলো কয়েকবার ভেবেছে, সেখানে ভারতবর্ষের মতো নগণ্য একটি দেশের খেলোয়াড় তাদের চ্যালেঞ্জ করল। গ্রেটব্রিটেন দল এবার খেলতে রাজি হয়ে গেল। তাদের পরিকল্পনা খেলায় জিতেই তারা সামাদকে ইচ্ছামতো নাস্তানাবুদ করবে।

খেলা শুরু হলো। বিপুল পরিমাণ দর্শক গ্যালারিতে উৎসাহ নিয়ে বসে আছে। লন্ডনের সাহেবরা তো বটেই, তাদের বিলেতি ম্যামরাও মাঠে উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে বসে আছেন। সামাদকে কীভাবে নাস্তানাবুদ করা হবে, সেটাই তাদের আগ্রহ। খেলা শুরুর পর পুরো দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়ে গেল। সামাদের ফুটবল নৈপুণ্য দেখে ব্রিটিশদের চোখমুখ শক্ত হয়ে গিয়েছে। তাদের মুখ লাল হয়ে গিয়েছে। সামাদ সেই খেলায় গুনে গুনে চারটি গোলই করলেন। সর্বভারতীয় ফুটবল দল গ্রেটব্রিটেনকে ৪-১ গোলে পরাজিত করল।

এই খেলার পর গোটা ইউরোপ হতভম্ব হয়ে গেল। সামাদের খেলা দেখে তারা সামাদকে 'ফুটবল জাদুকর' উপাধি দিল। সেই সময় স্কটিশ এক ফুটবলবোদ্ধা মন্তব্য করেছেন, 'সামাদ ইউরোপে জন্মগ্রহণ করলে বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার হিসেবে স্বীকৃতি পেত।'

সামাদ এতটাই অসাধারণ ছিলেন তার ক্যারিয়ারজুড়ে। সর্বভারতীয় ফুটবল দলের ইন্দোনেশিয়া সফর। তারা গিয়েছে ইন্দোনেশিয়ার জাভায়। খেলা শুরু হলো। সামাদ স্বভাবসুলভভাবে খেলা শুরু করলেন। সামাদের খেলা দেখে সবাই তার কাছ থেকে বল নেওয়ার চেষ্টা করছে। চার-পাঁচজন খেলোয়াড়কে কাটিয়ে ড্রিবলিং করে জোরে একটি শট নিলেন প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের দিকে। বল গিয়ে লাগলো গোলপোস্টের ওপরের ক্রসবারে।

বল ক্রসবারে লাগার সঙ্গে সঙ্গে সামাদ খুবই বিস্মিত হলেন। কারণ তার শুট মেজারমেন্ট দুর্দান্ত। সেই সময় এ ধরনের শুট মেজারমেন্ট কারোই ছিল না। মাপা শটে গোল না হওয়ায় তিনি কিছুটা বিচলিত হলেন ঠিকই; কিন্তু তা প্রকাশ করলেন না। কিছুক্ষণ পর আবার সামাদ বল কাটিয়ে জোরে শট করলেন। এবারও একই ঘটনা। পর পর দুইবার একই ঘটনা। সামাদের আত্মবিশ্বাস এবার বেড়ে গেল। সামাদ এবার চ্যালেঞ্জ করলেন রেফারিকে। তিনি অভিযোগ করলেন, 'গোলপোস্টের উচ্চতা কম। তা না হলে আমার দুটি শটই গোল হতো।'

সামাদের চ্যালেঞ্জের মুখে ফিতা দিয়ে মাপা হলো গোলপোস্ট। দেখা গেল সত্যিই প্রতিপক্ষ দলের গোলপোস্টের উচ্চতা স্ট্যান্ডার্ড মাপের চেয়ে চার ইঞ্চি কম রয়েছে। এসব ঘটনা এখন শুধু বিস্ময়ই নয়, বড়ো ধরনের রূপকথার মতো মনে হতে পারে। কিন্তু আদতে সামাদ ছিলেন এই মাপের ফুটবল তারকা।

ফুটবল নিয়ে সেই কিশোর বয়স থেকে অনুশীলন করতে করতে সামাদ পরিণত হয়েছিলেন ফুটবলের এক মহান শিল্পীতে। ফুটবলের প্রতি অগাধ প্রেম সামাদকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। সামাদ ছিলেন একজন পরিপূর্ণ ফুটবলশিল্পী। যে শিল্পীর ফুটবলের প্রতি অগাধ ভালোবাসা, প্রেম এবং বন্ধুত্ব। ফুটবল খেলা এবং ফুটবল মাঠের সঙ্গে সামাদের ছিল অদ্ভুত বোঝাপড়া।

তার ফিল্ড মেজারমেন্ট ছিল অসাধারণ। ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রতিপক্ষের একটি দলের খেলা। খেলা শুরুর আগে সামাদ কী মনে মাঠে পায়চারি করলেন। পায়চারি শেষে সামাদ বললেন, 'এই মাঠে আমার দল খেলবে না।' ক্রীড়া কমিটি কারণ জানতে চাইল। সামাদ তখন জানালেন, 'এই মাঠ আন্তর্জাতিক মাপের তুলনায় ছোট। তাই এ মাঠে আমার দল খেলবে না।'

সামাদের কথা শুনে ক্রীড়া কমিটি পরে মাঠ পরিমাপ করে দেখল। আসলেই তাই। দীর্ঘদিন ধরে এই মাঠে ফুটবল খেলা হয়েছে; কিন্তু কেউই বিষয়টা ধরতে পারল না। মাঠ যে আসলেই আন্তর্জাতিক মাপের চেয়ে ছোট, তা কারো চোখে ধরা পড়ল না আর সামাদ মাঠে পায়চারি করেই তা ধরে ফেলতে পারলেন।

এই ফুটবল জাদুকর ১৯৩৩ সালে ক্যারিয়ারের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে মোহামেডানে যোগদান করেন। সে সময় মোহামেডান পর পর পাঁচবার আইএফএ শিল্ড ও লিগ জয় করে। কথিত, ফুটবলে যখন সিজন ব্রেক চলত, তখন সামাদ বাইরে বিভিন্ন জায়গায় খেলতে যেতেন। সেইখানেও মজার সব ঘটনার জন্ম দিতেন। তৎকালীন জমিদাররা সামাদকে তাদের দলে নিয়ে খেলাত। সামাদ ম্যাচ শুরুর আগে জিজ্ঞেস করতেন, 'কত গোল দেব?'

জমিদাররা ৫ অথবা ৬ গোলের কথা বলত। এখানে সামাদ করতেন মজা। পুরো ম্যাচে সামাদ কোনো গোল দিতেন না। বল নিয়ে সারা মাঠ ঘুরতেন। কেউ তার কাছ থেকে বল নিতে পারত না, কিন্তু তিনি গোল দিতেন না। নব্বই মিনিট খেলার শেষের ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে ৫ অথবা ৬ গোল দিয়ে জমিদারদের শান্ত করে চুক্তি মিটিয়ে নিতেন।

সামাদের খেলা দেখে ইংল্যান্ডের কৃতী ফুটবলার এলেক হোসি বলেছিলেন, 'বিশ্বমানের যে কোনো ফুটবল দলে খেলার যোগ্যতা সামাদের রয়েছে।'

যেই সময় সামাদ ফুটবল খেলেছেন, তার গোটা সময়টাই তিনি ফুটবল রাজ্যে একক অধিপতি ছিলেন। শুধু ভারতবর্ষই নয়, যেখানে সামাদ গিয়েছেন, সেইখানেই তিনি তার খেলার দ্যুতি ছড়িয়েছেন। ১৯৩৬ সালে স্বতন্ত্র ফুটবলের এই জাদুকর জীবনের শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন। সেই খেলায় তিনি বেশ গুরুতরভাবে আহত হন। আহত হওয়ার পর তিনি সব ধরনের প্রতিযোগিতামূলক খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশ যখন বিভক্ত হয়ে 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামক দুটি আলাদা দেশ জন্ম নিল, তখন সামাদ চলে আসেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম বৃহৎ রেলওয়ে শহর পার্বতীপুরে। এরপর পুরো জীবনটাই তিনি এই পার্বতীপুরে কাটিয়ে দেন। পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ে পার্বতীপুর জংশনে সামাদ 'প্লাটফর্ম ইন্সপেক্টর' হিসেবে যোগ দেন। যদিও রেলওয়ে বিভাগে প্লাটফর্ম ইন্সপেক্টর নামে কোনো পদ নেই, তবুও ফুটবল জাদুকর সামাদের সম্মানে রেল কর্তৃপক্ষ পার্বতীপুরে এই পদ সৃষ্টি করেছিলেন।

ফুটবলের প্রতি আকর্ষণটা তিনি কখনোই হারাননি। পার্বতীপুরে এসে তিনি যুক্ত হন ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে। ১৯৫৭ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বেতনভুক্ত ফুটবল কোচ হিসেবে চাকরি শুরু করেন। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান সরকার তাকে রাষ্ট্রপতি পদক দেন।

তিনি তাঁর জীবদ্দশায় স্বাধীন বাংলাদেশ দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু তিনি ছিলেন বাঙালি ফুটবলারদের আইকন। স্বাধীন দেশের ফুটবল যদি সামাদের হাতে পড়ত, যদি সামাদ বাংলাদেশের কোনো সন্তানকে তার দীক্ষায় দীক্ষিত করতে পারতেন, তাহলে হয়তো এ দেশের ফুটবল ইতিহাস অন্যভাবেই লেখা হতো। চলমান সময়ের স্রোতে আমরা এই ফুটবল জাদুকরকে সেভাবে মনে রাখিনি। কিন্তু তার কীর্তিগুলো সামনে নিয়ে এলে এই প্রজন্ম অন্তত তাঁর স্মৃতি বুকে নিয়েই এগিয়ে যেতে পারবে বহু দূরে।

১৯৬৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি দারিদ্র্যের পীড়নে একরকম বিনা চিকিৎসায় এই ফুটবল জাদুকর মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি একবার বলেছিলেন, 'আমি তো নিঃশেষ হয়ে গেছি। আমার প্রাপ্য মর্যাদা আমি পেলাম না। আমি ধুঁকে ধুঁকে মরে যাব, সেটাই ভালো। কারো করুণা এবং অনুগ্রহের প্রত্যাশী আমি নই।'

ফুটবল জাদুকর সামাদের স্মরণে পার্বতীপুর রেলওয়ে এলাকায় 'রেলওয়ে সামাদ ইনস্টিটিউট' এখনো রয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর জন্য নির্ধারিত রেলওয়ে কোয়ার্টারটিতেও তার অনেক স্মৃতি রয়েছে। মারা যাওয়ার পর সামাদকে পার্বতীপুর শহরের ইসলামপুর কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

দীর্ঘ ২৫ বছর অবহেলিত ও অরক্ষিত থাকার পর ১৯৮৯ সালে ৫২ হাজার টাকা ব্যয়ে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। তার স্মরণে একটি স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকার। পার্বতীপুরে রেলওয়ে এলাকায় নির্মিত 'সামাদ মিলনায়তন' নামে একটি মিলনায়তনও আছে।

ফুটবল জাদুকর সৈয়দ আবদুস সামাদ হয়তো পেলে হতে পারতেন, হয়তোবা ডিয়াগো ম্যারাডোনাও হতে পারতেন; কিন্তু তিনি তার ফুটবল জাদুতে চিরবিস্ময় হয়ে রইলেন। এই প্রজন্ম হয়তো সামাদকে চেনে না বা জানে না। তবে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে এই ফুটবল জাদুকরের ইতিহাস আমাদের সবারই ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম সামাদকে চিনবে, জানবে এবং সামাদের আদর্শে নিজেদের গড়ে তুলবে।

লেখক: সাংবাদিক

বাংলাদেশের ক্রীড়া সংগঠন

এফ রহমান রূপক

বাংলাদেশের ক্রীড়া আয়োজন ও উন্নয়নে বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ সংগঠনগুলোর কারণে বাংলাদেশে ক্রীড়াক্ষেত্র সচল থাকছে এবং দেশের ভালো ভালো ক্রীড়াবিদ তৈরিতেও অবদান রাখছে

শারীরিক ও দৈহিক সুস্থতার দ্বারাই মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবনে শৃঙ্খলা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, পরিশ্রম, চিন্তাধারা ও সৌহার্দের মাঝে গড়ে তোলে নিজের এবং জাতীয় জীবনের একটি সমৃদ্ধশালী জীবনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। একটি সমৃদ্ধশালী জাতির জীবন এককভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিকাশে কখনোই পূর্ণতা লাভ করে না। যতক্ষণ না তার সাংস্কৃতিক জীবনধারা ব্যাপকভাবে সংযোজিত না হয়। একটি জাতির সত্যিকারের পরিচায়ক তার সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা, তার শিল্প-সাহিত্য, ক্রীড়ার আত্মপ্রকাশ এ সমৃদ্ধির ঐশ্বর্যে। আজকের সভ্য জগতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গে জাতীয় চরিত্র বিকাশে প্রত্যেকটি দেশে খেলাধুলা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশেও খেলাধুলা জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্রিটিশ ভারত ও বিগত পাকিস্তানি আমল থেকে আমাদের দেশে বিভিন্ন খেলাধুলা প্রচলন এবং দেশীয় খেলার সঙ্গে অনেক বিদেশি খেলারও বিস্তার লাভ করে। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বিভিন্ন খেলায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করে। পাকিস্তান আমলে দেশের খেলাধুলা পাকিস্তান স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হতো। পরবর্তী সময়ে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের খেলাধুলা প্রচার-প্রসার ও উন্নয়নকল্পে বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা বর্তমানে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ গঠন করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে অদ্যাবধি অনেক চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ওপর দেওয়া বাংলাদেশ সরকারের খেলাধুলা উন্নয়নের দায়িত্ব সুদৃঢ়ভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে এবং তা সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের ক্রীড়া আয়োজন ও উন্নয়নে বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠন নিরলস-ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ সংগঠনগুলোর কারণে বাংলাদেশে ক্রীড়াক্ষেত্র সচল থাকছে এবং দেশের ভালো ভালো ক্রীড়াবিদ তৈরিতেও অবদান রাখছে। এরকম কিছু ক্রীড়া সংগঠনের পরিচিতি তুলে ধরা হলো– যারা নিজ নিজ ক্রীড়াক্ষেত্রগুলোকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের ১৫ জুলাই।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ইউসুফ আলী
সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসেম
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের বর্তমানে সভাপতি কাজী মো. সালাহউদ্দিন
সাধারণ সম্পাদক আবু নাঈম সোহাগ

বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন
বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ইউসুফ আলী
সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান মোমিন
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
এয়ার চিফ মার্শাল আবু এসরার বিবিপ, এনডিসি, এসিএসসি (সভাপতি)
জনাব আবদুস সাদেক (সাধারণ সম্পাদক)

বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন
বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের ১৭ জুলাই।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ইউসুফ আলী
সাধারণ সম্পাদক ব্রজেন দাশ
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
অ্যাডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ, ওএসপি, বিসিজএম, এনডিসি, পিএসসি (সভাপতি)
এম বি সাইফ (সাধারণ সম্পাদক)

বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন
বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ইউসুফ আলী
সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাইদুল ইসলাম
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
এএসএম আলী কবীর (সভাপতি)
অ্যাডভোকেট আবদুর রকিব মন্টু (সাধারণ সম্পাদক)

বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন
বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ইউসুফ আলী
সাধারণ সম্পাদক শহিদুর রহমান কচি
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
আবদুল মালেক (সভাপতি)
আমির হোসেন বাহার (সাধারণ সম্পাদক)

বাংলাদেশ অ্যামেচার বাস্কেটবল ফেডারেশন
বাংলাদেশ অ্যামেচার বাস্কেটবল ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ইউসুফ আলী
সাধারণ সম্পাদক রিয়াজউদ্দিন আহমেদ মানু
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, সাবেক এমপি (সভাপতি)
লে. কমান্ডার (অব.) এ কে সরকার

বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিক্স ফেডারেশন
বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিক্স ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ইউসুফ আলী
সাধারণ সম্পাদক এ বি এম ফজলে এলাহী
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
শেখ বশির আহমেদ (সভাপতি)
মো. আহমেদুর রহমান (সাধারণ সম্পাদক)

> ব্রিটিশ ভারত ও বিগত পাকিস্তানি আমল থেকে আমাদের দেশে বিভিন্ন খেলাধুলা প্রচলন এবং দেশীয় খেলার সঙ্গে অনেক বিদেশি খেলারও বিস্তার লাভ করে

বাংলাদেশ শুটিং ফেডারেশন
বাংলাদেশ শুটিং ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে।
প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি লে. কর্নেল (অব.) হেসামউদ্দিন আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক এ বি এম আশ্রাফউদ্দিন
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
নাজিমউদ্দিন চৌধুরী (সভাপতি)
ইস্তেখাবুল হামিদ (সাধারণ সম্পাদক)

বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন
বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ইউসুফ আলী
সাধারণ সম্পাদক মো. খবির উদ্দিন
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
আতিকুল ইসলাম (সভাপতি)
আশিকুর রহমান মিকু (সাধারণ সম্পাদক)

বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশন
বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কফিল উদ্দিন মাহমুদ
সাধারণ সম্পাদক ওয়াহেদুল করিম
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
হেদায়েতুল্লাহ আল-মামুন, এনডিসি (সভাপতি)
খোন্দকার হাসান মনির সুমন (সাধারণ সম্পাদক)

বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশন
বাংলাদেশ শরীরগঠন ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক আবুল ফজল
সাধারণ সম্পাদক মেজবাহউদ্দিন
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ সুবেদ আলী ভূঁইয়া, পিএসসি এমপি (সভাপতি)
মো. নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশ অ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশন
বাংলাদেশ অ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের ৯ জুলাই।

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ইউসুফ আলী
সাধারণ সম্পাদক কাসেম সুফী
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
লে. জে. আজিজ আহমেদ, বিজিবিএম, পিজিবিএম, পিএসসি,জি (সভাপতি)
এম এ কুদ্দুস খান (সাধারণ সম্পাদক)

বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন
বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ড. কাজী মোতাহার হোসেন
সাধারণ সম্পাদক শরফুদ্দিন মো. রেজা হাই
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
বেনজীর আহমেদ, বিপিএম (বার) (সভাপতি)
সৈয়দ শাহবুদ্দিন শামীম (সাধারণ সম্পাদক)

বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন
বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ইউসুফ আলী
সাধারণ সম্পাদক গোলাম রহমান
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
মিজানুর রহমান মানু (সভাপতি)
মো. পারভেজ হাসান (সাধারণ সম্পাদক)

বাংলাদেশ জুডো ও কারাতে ফেডারেশন
বাংলাদেশ জুডো ও কারাতে ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ইউসুফ আলী
সাধারণ সম্পাদক আওলাদ হোসেন
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এস কে আবু বারেক, এমপি (সভাপতি)
এ কে এম সেলিম (সাধারণ সম্পাদক)

বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন
বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ইউসুফ আলী
সাধারণ সম্পাদক মওদুদ আলী
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
মো. শাহরিয়ার আলম, এমপি (সভাপতি)
গোলাম মোর্শেদ (সাধারণ সম্পাদক)

বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন
বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালের ২৭ নভেম্বর।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ইউসুফ আলী
সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
অ্যাডভোকেট মোল্লা মোহাম্মদ আবু কাওছার (সভাপতি)
হাজী মো. খোরশেদ আলম (সাধারণ সম্পাদক)

বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশন
বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ইউসুফ আলী
সাধারণ সম্পাদক মমতাজউদ্দিন আহম্মদ
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
মেজর জেনারেল আবুল হোসেন, এনডিপিসি, পিএসসি (সভাপতি)
নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ (সাধারণ সম্পাদক)

বাংলাদেশ অ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশন
বাংলাদেশ অ্যামেচার রেসলিং ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ইউসুফ আলী
সাধারণ সম্পাদক জাহেদ করিম
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
শাহজাহান খান, এমপি, নৌপরিবহনমন্ত্রী (সভাপতি)
তাবিউর রহমান (সাধারণ সম্পাদক)

বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড
বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ইউসুফ আলী
সাধারণ সম্পাদক মোজাফ্ফর হোসেন খান
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
নাজমুল হাসান পাপন, এমপি (সভাপতি)
নিজামউদ্দিন চৌধুরী সুজন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)

বাংলাদেশ অ্যামেচার কাবাডি ফেডারেশন
বাংলাদেশ অ্যামেচার কাবাডি ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ইউসুফ আলী
সাধারণ সম্পাদক এমএ হামজা
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
কে এম শহিদুল হক, বিপিএম, পিপিএম, মহাপুলিশ পরিদর্শক (সভাপতি)
হাবিবুর রহমান, বিপিএম (বার), পিপিএম (সাধারণ সম্পাদক)

বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন
বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ১৯ আগস্ট।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বেগম লুৎফুননেছা হক
সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
মো. আবদুল করিম (সভাপতি)
ফিরোজ আহমেদ (সাধারণ সম্পাদক)

বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা
বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে।
সভানেত্রী মিসেস রাবেয়া খাতুন তালুকদার
সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস লুৎফুন নেসা হক বকুল
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
মাহবুবা আরা বেগম গিনি (সভানেত্রী)
হামিদা বেগম (সাধারণ সম্পাদিকা)

বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন
বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮২ সালে।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি লে. কর্নেল (অব.) এম এ হামিদ, পিএসপি
সাধারণ সম্পাদক এম আকবর আলী
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
এ কে এম নুরুল ফজল বুলবুল (সভাপতি)
আসাদুজ্জামান কোহিনূর (সাধারণ সম্পাদক)

বাংলাদেশ স্কোয়াশ ফেডারেশন
বাংলাদেশ স্কোয়াশ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৮ সালের ৮ নভেম্বর।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি গ্রুপ ক্যাপ্টেন তাহের কুদ্দুস
সাধারণ সম্পাদক কাজী শামসুদ্দিন বাচ্চু
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
কর্নেল (অব.) ফারুক খান, এমপি (সভাপতি)
জাহাঙ্গীর হামিদ সোহেল (সাধারণ সম্পাদক)

বাংলাদেশ বিলিয়ার্ড ও স্নুকার ফেডারেশন
বাংলাদেশ বিলিয়ার্ড ও স্নুকার ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৯ সালের ৫ নভেম্বর।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এ এইচ মাহমুদ
সাধারণ সম্পাদক মোবারক হোসেন
বর্তমান কমিটি (২০১৭-২০১৮)
আফজালুর রহমান সিনহা (সভাপতি)
সৈয়দ মাহবুব (সাধারণ সম্পাদক)

লেখক: সাংবাদিক

ক্রীড়া সাংবাদিক জীবন বোস

অধ্যাপক মো. মসিউল আযম

জীবন বোসের জীবনাবসান হয় ২০১৬ সালের ৮ মে। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন না-ফেরার দেশে।

৫০ বছর ধরে জীবনদার সঙ্গে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। ২০১৫ সালের মাঝামাঝিতে যশোর শহরের বড়বাজারে বাজার করার ফাঁকে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখে তিনি ছোট শিশুর মতো আবেগাপ্লুত হয়ে উঠলেন। তাঁর চোখ বেয়ে কয়েক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল।

> জীবনদা আমাকে বললেন, 'ঢাকায় গেলে পত্রিকা অফিসে আমার বিলের অবস্থাটা একটু জেনে আসবেন।' ... আমি পত্রিকা অফিসে গিয়ে বিষয়টি জানানোর পর কর্তৃপক্ষ বিনা বাক্যব্যয়ে আমার হাতে তাঁর পাওনা সম্মানী ৮০০ টাকা তুলে দেন

জীবন বোসের পূর্বপুরুষরা থাকতেন বর্তমান মাগুরা জেলার শালিখা থানার ধনেশ্বরগাতী গ্রামে। সেখানেই তাঁর জন্ম। পাকিস্তান আমলে তাঁরা সেখান থেকে যশোরে স্থায়ী বাসিন্দা হন। প্রথমে বাগমারা এলাকায়, পরে চুড়িপট্টিতে বাসা নেন। যশোর সম্মিলিনী ইনস্টিটিউট থেকে মাধ্যমিক পাস করে যশোর এমএম কলেজে লেখাপড়া করেন।

এদিকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ভারতে যান প্রশিক্ষণ নিতে। ফিরে এসে যশোরের সাধারণ মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তিনি যশোরের হাশিমপুর স্কুলে বাংলার শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন।

ক্রীড়ালেখক হিসেবে দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক আজাদ, দৈনিক বাংলা, ইত্তেফাক, সংবাদ ও পাক্ষিক ক্রীড়া জগতে লেখালেখি করেন। যশোরের দৈনিক ঠিকানা, দৈনিক কল্যাণ ও দৈনিক রানার পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বেতারে নিয়মিত ধারাভাষ্য দিয়েছেন। ছিলেন বাংলাদেশ ক্রীড়ালেখক সমিতির সদস্য। বাংলাদেশ ক্রীড়ালেখক সমিতি যশোর শাখারও সদস্য ছিলেন তিনি। ২০০৮ সালে বাংলাদেশ ক্রীড়ালেখক সমিতি কর্তৃক পেয়েছেন ক্রীড়ালেখক সংবর্ধনা। এর আগে ১৯৫৯-'৬৬ সাল পর্যন্ত যশোর প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে খেলেছেন ইস্টবেঙ্গল, এভারগ্রিন ও ইস্টার্ন ক্লাবে। ক্রিকেটার হিসেবে ১৯৬২-'৬৮ সাল পর্যন্ত খেলেছেন ইস্টার্ন ক্লাবে। দীর্ঘ ৩৭ বছর যশোরের হাশিমপুর স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

জীবন বোস ও আমার জন্ম একই বছর, ১৯৪৩ সালে। তাঁর সঙ্গে আমার আবার পেশাগত মিল ছিল। শিক্ষকতা ও শখের নেশা সাংবাদিকতা। পত্রিকায় দু'জনই লেখালেখি শুরু করি ষাটের দশক থেকে। দু'জনের মধ্যে শুধু একটিই পার্থক্য ছিল– আমি ছিলাম সংসারী আর তিনি চিরকুমার। তাঁর বড়দা বিভূতি বোস দীর্ঘকাল ছিলেন যশোর এম কে রোডস্থ তোফাজ্জেল হোসেনের মালিকানাধীন পেট্রল পাম্পের ম্যানেজার। বিভূতি বোসের স্ত্রী অর্থাৎ তার বড়ো বৌদির হাতের রান্না খেয়েই তিনি সারা জীবন পার করে দেন।

আমার সত্তরোর্ধ্ব বয়স। এই জীবনে কর্মসুবাদে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে মেশার ও দেখার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু জীবনদার মতো একজন সাদাসিধে, সহজ-সরল, নম্র, বিনয়ী, এমন সজ্জন, অমায়িক, নিরহংকার, নির্মোহ মানুষ আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি।

এমন মানুষ লাখে মেলা ভার। তিনি হাসতেন প্রাণ খুলে। তাঁর কথা বলার মধ্যে ছিল এক অদ্ভুত ঢং। যে কেউ তাঁর সাহচার্যে এলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তারা তাঁর ভক্ত ও গুণমুগ্ধ হয়ে যেতেন।

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর যশোর প্রেস ক্লাবের পুরোনো ভবন থেকে আবুল হোসেন মীর সম্পাদিত দৈনিক ঠিকানা পত্রিকা বের হতো। যশোরে এখনকার যারা প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক– একরামউদ্দৌলা ছিলেন ওই পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক, রুকুনউদ্দৌলা বার্তা সম্পাদক, শাহাদত হোসেন কাবিল মফস্বল বার্তা সম্পাদক। আমি ছিলাম ফিচার এডিটর এবং ক্রীড়া সম্পাদক ছিলেন জীবন বোস। আমার ও জীবনদার টেবিল ছিল পাশাপাশি। লেখার জন্য আমি বড়ো সাইজের প্যাডের কাগজ ব্যবহার করতাম। জীবনদা সবার উদ্দেশে বলতেন, আমাকে একটা 'আযম ভাই' সাইজের প্যাড দিন। পত্রিকা অফিসে সবার মুখে মুখে ফিরত এ কথা।

দৈনিক ঠিকানা প্রকাশনা বন্ধ হওয়ার পর তিনি দৈনিক রানার পত্রিকায় ক্রীড়া সম্পাদক পদে যোগ দেন। সন্ধ্যার পর আমি মাঝেমধ্যে আড্ডা দিতে যেতাম সেখানে। সত্যিকার বলতে গেলে, জীবনদার টানেই ছুটে যেতাম পত্রিকা অফিসে।

হাশিমপুর হাইস্কুল থেকে তাঁর অবসর গ্রহণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য বিদায় অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আমি উপস্থিত ছিলাম। অনুষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ও বিশিষ্টজনরা তাঁর গুণাবলি নিয়ে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, এতে আমি খুবই মুগ্ধ ও অভিভূত।

কখনো পথেঘাটে দেখা হলে তিনি জনসমক্ষে আমার প্রশংসায় মুখর হয়ে যেতেন। এতে আমি অনেক সময় বিব্রতবোধ করতাম। কারো সামনে বা পেছনে প্রশংসা করতে কার্পণ্য করেননি। আবার অসাক্ষাতে কারো নিন্দা-মন্দ করতে শুনিনি কখনো। তাঁর কাছে মনে হতো, এ জগতে সবাই ভালো। মন্দ হয়ে কেউ জন্মেনি। তাঁর এসব গুণাবলির কারণেই তিনি হতে পেরেছিলেন যশোরে সব মহলের কাছে একজন জনপ্রিয় শ্রদ্ধেয় মানুষ, গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

তাঁর একটি নিয়মিত অভ্যাস ছিল সন্ধ্যার পর থানার সামনে মধুর ক্যান্টিনে কিছু সময় কাটানো। যশোর শহরের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, গুণিজনের অনেকেই আড্ডা দিতে আসতেন সেখানে। জীবনদা টেবিলের এক কোণে চুপ করে বসে সবার আলাপ-আলোচনার সমঝদার একজন শ্রোতা হয়ে শুনতেন।

আশির দশকের কথা। একটি প্রসঙ্গ আমাকে উল্লেখ করতে হচ্ছে। ঢাকায় দৈনিক বাংলার পাশেই ছিল বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অফিস। সেখান থেকে প্রকাশিত হতো 'ক্রীড়া জগত'। ওই পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখতেন। পত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত লেখার সম্মানীর টাকা পাওনা হয়েছিল। জীবনদা আমাকে বললেন, 'ঢাকায় গেলে পত্রিকা অফিসে আমার বিলের অবস্থাটা একটু জেনে আসবেন।' আমি ঢাকায় আসার আগে তিনি আমাকে কোনো ক্ষমতা অর্পণপত্র দেননি। আমি পত্রিকা অফিসে গিয়ে বিষয়টি জানানোর পর কর্তৃপক্ষ বিনা বাক্যব্যয়ে আমার হাতে তাঁর পাওনা সম্মানী ৮০০ টাকা তুলে দেন। আমি যশোরে ফিরে এসে তাঁর হাতে দিলে তিনি যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত হন এই ভেবে যে, আমাকে কীভাবে ক্ষমতা অর্পণপত্র ছাড়াই টাকাটি তাঁরা দিলেন। আমার এ কথা তিনি বাজারে বিভিন্ন মহলে ছড়িয়ে দিয়ে আত্মতৃপ্তিবোধ করতেন।

আমার মনে পড়ে, কয়েক বছর আগে 'বেলা শেষে' নামে যশোরের একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন যশোর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে ক্রীড়া লেখক হিসেবে তাঁর অনন্য অবদানের জন্য তাঁকে সংবর্ধনা ও সম্মাননা দেয়। অথচ যশোরের অনেক সংগঠন তাঁকে সম্মাননা দেয়নি। অনেকেই তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতেও যাননি তাঁর বাসভবনে। শেষ জীবনে এসে এটাই হয় এই সমাজের কাছে তাঁদের প্রাপ্য পাওনা। এটাই নিয়ম, এটাই রীতি।

আমাদের সমাজে এখন একটি কালচার তৈরি হয়ে গেছে। জীবিতদের সম্মান জানানোর পরিবর্তে তাঁর মরদেহ কফিনে ফুল দিয়ে সম্মান জানানোর জন্য হইহুল্লোড় সৃষ্টি করি। আমাদের দরদ, ভক্তি, শ্রদ্ধা তখন উছলে পড়ে।

ক্রীড়া সাংবাদিক জীবনদা আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবে। কবির ভাষায় বলতে হয়– 'মরমিয়া তুমি চলে গেলে/দরদি আমি কোথা যাব/কারে আমি এ ব্যথা জানাব।'

লেখক: সাংবাদিক, শিক্ষক, যশোর

বাংলাদেশের জাতীয় খেলা হাডুডু

আলী মুবিন

একসময় গ্রামীণ জনপদে হাডুডু, দাঁড়িয়াবান্ধা, মোরগের লড়াই, গোল্লাছুটের মতো খেলাগুলো ছিল বিনোদন ও আনন্দ-উৎসবের অন্যতম বড়ো উপাদান। পড়াশোনা ও কাজের বাইরে এসব খেলায় মেতে থেকে শিশু-কিশোর-যুবারা সময় কাটাত পরম আনন্দে

বাংলাদেশের জাতীয় খেলার নাম যে হাডুডু, এটা আমাদের সবারই জানা। কিন্তু এ প্রজন্মের অনেকেই খেলাটি দেখেনি। বিশেষ করে যাদের জন্ম শহরে এবং সেখানেই বেড়ে উঠেছে, গ্রামের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ নেই, তাদের ক্ষেত্রে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। টিভিতে খেলার খবরে একঝলক দেখেছ হয়তো। হাডুডু জাতীয় খেলা হলেও সেটি দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি। ক্রিকেট, ফুটবল, হকির মতো ভিনদেশি খেলার দাপটে এখন হাডুডু খুবই কোণঠাসায়।

একসময় গ্রামীণ জনপদে হাডুডু, দাঁড়িয়াবান্ধা, মোরগ লড়াই, গোল্লাছুটের মতো খেলাগুলো ছিল বিনোদন ও আনন্দ-উৎসবের অন্যতম বড়ো উপাদান। পড়াশোনা ও কাজের বাইরে এসব খেলায় মেতে থেকে শিশু-কিশোর-যুবারা সময় কাটাত পরম আনন্দে। এখন গ্রামেও বিনোদন ও সময় কাটানোর প্রধান সম্বল হয়ে উঠেছে টেলিভিশন, মোবাইল ফোন ইত্যাদি। শারীরিক শ্রমের

খেলা তাদের আর টানে না। অন্যদিকে শহরের পরিবেশই হাডুডুকে পরদেশি করে রেখেছে।

বইপুস্তক পড়ে অনেকেই আমাদের জাতীয় খেলা কোনটি, তা নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। কোনো বইয়ে লেখা হাডুডু। আবার কোনো বইয়ে লেখা কাবাডি। মজার বিষয় হচ্ছে– দুটি তথ্যই ঠিক। একটিও ভুল নয়। কারণ দুটিই যে একই খেলার ভিন্নতর নাম। তবে হাডুডু এবং কাবাডির মধ্যে কিছু পার্থক্যও আছে। কাবাডি হচ্ছে হাডুডুর একটু পরিমার্জিত রূপ। কাবাডি খেলার কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে, যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু হাডুডু একেক অঞ্চলে একেক নিয়মে খেলা হয়। হাডুডু খেলা এই অঞ্চলে কবে থেকে শুরু হয়েছে, তার কোনো দালিলিক প্রমাণ নেই। তবে হাজার বছরের বেশি সময় ধরে এ ধরনের খেলা চলে আসছে এই বাংলায় এবং ভারতীয় উপমহাদেশে।

হাডুডু থেকে কাবাডি: জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়ার তথ্য অনুসারে, ১৯৭২ সালে হাডুডু খেলাকে কাবাডি নামকরণ করা হয়। একই সময়ে এ খেলাকে জাতীয় খেলার মর্যাদা দেওয়া হয়। কাবাডির জন্য চূড়ান্ত করা হয় কিছু নিয়মকানুন।

হাডুডু বা কাবাডি খেলার ধরন: সাধারণত হাডুডু খেলার মাঠের কোনো সুনির্দিষ্ট মাপ থাকে না। খেলায় অংশগ্রহণকারীরা যে জায়গায় খেলা হবে তার আকার বিবেচনায় নিয়ে নিজেরা আলোচনা করে চারদিকে দাগ দিয়ে খেলার মাঠের সীমানা ঠিক করে নেয়। তবে পরিমাণের দিক থেকে মাঠ যত বড়ো-ছোটই হোক না কেন, এর আকৃতি হয় আয়তাকার। মাঝখানে দাগ দিয়ে মাঠকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। প্রতিভাগে একেকটি দল অবস্থান নেয়। অন্যদিকে কাবাডি মাঠের আকার হয় দৈর্ঘ্যে ১২.৫০ মিটার, প্রস্থে ১০ মিটার।

গ্রামের কিশোরদের হাডুডু খেলা: নিয়ম অনুসারে, এক পক্ষের একজন খেলোয়াড় অপর পক্ষের কোর্টে হানা দেয়। এ সময় সে শ্রুতিগোচরভাবে হাডুডু, হাডুডু বা কাবাডি কাবাডি কাবাডি শব্দ করতে করতে অন্য ওই পক্ষের যে কোনো একজন খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে ফিরে আসার চেষ্টা করে। ওই পক্ষের চেষ্টা থাকে সবাই মিলে তাকে জাপটে ধরে আটকে রাখা। যদি ওই খেলোয়াড় দম ধরে রেখে নিজ কোর্টে ফিরে আসতে পারে, তাহলে তার দল পয়েন্ট পায়। আর যদি আটকে থাকা সময়ের মধ্যে খেলোয়াড়টির দম ফুরিয়ে যায়, তাহলে বিপক্ষ দল পয়েন্ট পায়।

কেন হাডুডু-কাবাডির প্রচলন: কেন বা কীভাবে খেলা হিসেবে হাডুডু বা কাবাডির প্রচলন হয়েছিল, তার কোনো ব্যাখ্যা কোথাও পাওয়া যায় না। নৃবিজ্ঞানীরাও এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো মতামত দেননি। তবে ধারণা করা হয়, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এক গোত্রের মানুষ অন্য গোত্রের আস্তানায় হানা দিয়ে ধনসম্পদ, গবাদিপশু, এমনকি নারী ও শিশুকে লুট করে আনত। শত্রুর আস্তানায় হানা দিয়ে নিরাপদে ফিরে আসার কৌশলের চর্চা ও নিজেদের ফিট রাখার তাগিদ থেকে এমন খেলার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল ওই যুগের মানুষ।

ব্যক্তি ও দলগতভাবে শত্রুপক্ষের আক্রমণ ঠেকিয়ে দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গেই পাল্টা আক্রমণের কৌশল চর্চা করতে গিয়েই সম্ভবত এ খেলার উদ্ভব। এ খেলায় সফলতার শর্ত হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক ক্ষিপ্রতা, পেশির ক্ষিপ্রতা, ফুসফুসের শক্তি ও সহনশীলতা, দ্রুত চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও তা প্রয়োগের সামর্থ্য। সেই সঙ্গে প্রতিপক্ষের কৌশল ও মনোভাব অনুধাবনের যোগ্যতাও গুরুত্বপূর্ণ।

হাডুডু কেন জাতীয় খেলা: হাডুডু বা কাবাডিকে কেন জাতীয় খেলার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, সরকারি কোনো দলিলে এর ব্যাখ্যা নেই। এমনকি এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়ায়ও এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে দুটি বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে এ খেলাকে জাতীয় খেলার মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকতে পারে।

গ্রামনির্ভর এই দেশে একসময় ব্যাপকভাবে হাডুডুর প্রচলন ছিল। গ্রামাঞ্চলে এটিই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় দলগত খেলা। শুধু স্বীকৃত খেলার মাঠ নয়, গ্রামের পাশের পতিত জমি, বালুচরসহ যে কোনো সুবিধাজনক জায়গায় দাগ দিয়ে কোর্ট বানিয়ে তরুণরা এই খেলা শুরু করে দিত। তরুণরা তখন খেলার পাশাপাশি এটিকে একধরনের শরীরচর্চা ও শক্তিমত্তার পরীক্ষা হিসেবে নিত। অন্যদিকে গ্রামবাসী দলবেঁধে এই খেলা উপভোগ করত। দেশজুড়ে খেলাটির এ জনপ্রিয়তার কারণে এটিকে জাতীয় খেলার মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকতে পারে।

অন্যদিকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গেও এর মিল রয়েছে। পাকিস্তানিরা আমাদের আক্রমণ করে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু বাঙালি জাতি পাল্টা আক্রমণ করে তাদের কবল থেকে মুক্ত হয়েছে। জয় ছিনিয়ে নিয়েছে। হাডুডু বা কাবাডি খেলার স্পিরিটের সঙ্গে এর একটি দারুণ সামঞ্জস্য আছে। এটিও খেলাটিকে জাতীয় খেলার মর্যাদায় অভিষিক্ত করার বিষয়ে ভূমিকা রেখে থাকতে পারে।

১৯৩২ সালে হাডুডু খেলার আইন প্রণীত হয়। ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্রথম ভারতীয় অলিম্পিক গেমস প্রতিযোগিতায় এ খেলাটি অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯২৩ সালে কলকাতার একজন খ্যাতনামা সমাজসেবী ও শিক্ষক ছাত্রচার্য নারায়ণ চন্দ্র ছাত্র সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং খেলাধুলা পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে কলকাতা ও বাংলায় হাডুডু খেলার প্রচলন করেন। নারায়ণ চন্দ্রের উদ্যোগে কাবাডি খেলার মাধ্যমে দেশের তরুণদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার সুনজরে দেখেনি। তাই ১৯৩১ সালে কাবাডি বন্ধ এবং ছাত্র সমিতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তখন ভারত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করা হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এ আন্দোলনকে সমর্থন করেন। জেমস বুকাননও এ আদেশ প্রত্যাহারের ব্যাপারে ছাত্র সমিতির সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

১৯৫০ সালে ভারতীয় জাতীয় কাবাডি ফেডারেশন গঠিত হয়। এরপর থেকে কাবাডি খেলার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। ১৯৫৩ সালে কাবাডি খেলার আইনকানুন প্রণীত এবং ১৯৬০ ও ১৯৬৬ সালে কাবাডি খেলার আইন সংশোধিত হয়। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের দুজন কর্মকর্তা বাংলার আসানসোলে ভারতীয় জাতীয় কাবাডি প্রতিযোগিতা দেখতে যান। দেশে ফিরে কাবাডি ফেডারেশন গঠন করেন। ১৯৭৪ সালে এশিয়ান অ্যামেচার কাবাডি ফেডারেশন গঠিত হয়। ১৯৭৪ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কাবাডি টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯০ সালে চীনের বেইজিং এশিয়াডে কাবাডি অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শুরু হয় এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে কাবাডি খেলা। কাবাডি ফেডারেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রিমিয়ার কাবাডি লিগ, প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, আন্তঃজেলা, জাতীয় যুব ও জাতীয় স্কুল কাবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

কাবাডি মহিলা ও পুরুষ উভয়ই খেলে থাকে। দুই গ্রুপের মাঠ ভিন্ন ধরনের। পুরুষ মাঠের দৈর্ঘ্য ১০×১২.৪ মিটার, মহিলা ৮×১১ মিটার। খেলার সময় দুই অর্ধে পুরুষ ৪০ মিনিট এবং মহিলা ৩০ মিনিট। প্রতি দলে ৭ জন কোর্ট খেলোয়াড় হিসেবে খেলে থাকেন। বাংলাদেশ ১৯৯০ বেইজিংয়ে সিলভার, ১৯৯৪ হিরোশিমা গেমসে সিলভার ও ১৯৯৮ সালে ব্যাংককে ব্রোঞ্জপদক লাভ করেন।

জাতীয় কাবাডি দল: বাংলাদেশ কাবাডি দল আন্তর্জাতিক কাবাডি খেলায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকারী দল। কাবাডি বাংলাদেশের জাতীয় খেলা। বাংলাদেশ কাবাডি দল ২০০৬ এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জপদক পায়। ১৯৮০ সালে প্রথম এশিয়ান কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ রানার্সআপ হয়। পরের এশিয়ান কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ আবারো রানার্সআপ হয়।

বর্তমান জাতীয় হাডুডু দল

কাজী ইউনুস আহমেদ, রাজু আহমেদ, মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক, কামাল হোসেন, মোশাররফ হোসেন, আবুল কালাম, শামীম খালেদ, মোহাম্মদ বাদশাহ মিয়া, আবু সালেহ মুসা, মো. মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ বজলুর রশিদ, মো. আবদুর রউফ ও জিয়াউর রহমান। কোচ আবদুল জলিল।

লেখক: সাংবাদিক

ফুটবলের সাতকাহন

ইরানী বিশ্বাস

ফুটবল অনেক প্রাচীন খেলা। ধারণা করা হয়, বিশ্বের এই জনপ্রিয় খেলাটি শত বছরেরও পুরোনো ... ফুটবল হচ্ছে শহর থেকে গ্রাম সব ধরনের মানুষের প্রাণের প্রিয় খেলা। গ্রামের এমন কোনো ছেলে বলতে পারবে না যারা বৃষ্টির মধ্যে খড় বা জাম্বুরা দিয়ে বল খেলেনি

তখন আমি প্রাইমারি স্কুলে পড়ি। বছরের এই গ্রীষ্ম মৌসুমে ধানকাটা শেষ হলে ফুটবলের মৌসুম শুরু হতো। প্রতিবছরের মতো সে বছরও আমাদের গ্রামে স্কুলমাঠে ফাইনাল ফুটবল খেলা হবে। দুই পক্ষই বিভিন্ন জেলা থেকে প্লেয়ার নিয়ে এসেছে। পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে দেওয়াল ঘড়ি ও কালো রঙের কাঠের ওপর দস্তায় বাঁধানো শিল্ড। সে সময় এটাই ছিল দামি পুরস্কার। খেলা শেষে সবাই বাড়িতে এসে খেলা প্রসঙ্গে তর্কবিতর্কের ঝড় উঠেছে। এ সময় সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এক বৃদ্ধ ঠাকুরমা। তিনিও সেদিন মাঠে উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেছেন। তাকে আমার এক ভাই জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন খেলা দেখলে ঠাকুরমা? উত্তরে তিনি বললেন, খেলা তো ভালোই দেখলাম, তবে বেনু মজুমদারের জন্য কষ্ট লাগতেছে। ভাই বললেন, কেন? উত্তরে ঠাকুরমা বললেন, বেনু মজুমদার এই রোদের মধ্যে পুরা খেলার সময় বলের পেছনে দৌড়াল, কিন্তু একবারও বলে লাথি দিতে পারল না। বেনু মজুমদার ছিলেন সেই খেলার রেফারি।

গল্পটা বলার কারণ হলো, ফুটবল আমাদের দেশের আপামর জনগণের বিনোদনের এক বড়ো অংশ। সব ফুটবলবোদ্ধাই যে মাঠে খেলা দেখতে যায়, তা কিন্তু নয়। আমাদের দেশে এমন খেলা না বোঝা মানুষও সরাসরি মাঠে অথবা আজকাল রেডিও-টিভির সামনে বসে ফুটবল উপোভোগ করেন। এতেই বোঝা যায়, ফুটবল এদেশে কতটা জনপ্রিয় খেলা।

ফুটবল অনেক প্রাচীন খেলা। ধারণা করা হয়, বিশ্বের এই জনপ্রিয় খেলাটি শত বছরেরও পুরোনো ঐতিহ্য বহন করে চলছে। ১৮৬৩ সালে ইংল্যান্ডে ফুটবল খেলার প্রচলন হয়েছিল এবং এখানেই প্রথম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন গঠন করা হয়। এভাবেই ফুটবল ক্রমে বিশ্বের জনপ্রিয় খেলার মধ্যে অন্যতম স্থান দখল করে নেয়। এককথায় বলা যায়, ফুটবল হচ্ছে শহর থেকে গ্রাম সব ধরনের মানুষের প্রাণের প্রিয় খেলা। গ্রামের এমন কোনো ছেলে বলতে পারবে না যারা বৃষ্টির মধ্যে খড় বা জাম্বুরা দিয়ে বল খেলেনি। পরিবারে ছেলে জন্মালে তাকে খেলার উপকরণ হিসেবে একটা বল উপহার দেওয়া যেন বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়।

তবে গ্রাম্য ফুটবল বিশ্বফুটবল হয়ে উঠেছে প্রধানত ফিফা বিশ্বকাপের মাধ্যমে। প্রতি চার বছর পর ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল বিশ্বমানুষের মনে দোলা দিতে আসে। এক বছর খেলা শেষ হলে মানুষ অপেক্ষা করে চার বছর ঘুরে কখন আসবে বিশ্বকাপ ফুটবল। যখন গ্রামে টেলিভিশন ছিল না, তখন কারো বাড়িতে রেডিও থাকলে তা শুনতে আসত পুরো গ্রামের মানুষ। ক্রমে শহর থেকে গ্রামে সবখানে টেলিভিশনের আধিক্য হয়েছে। তাই এখন আর রেডিওতে খেলা বন্দি নেই। বাংলাদেশ উন্নয়নের আরেক ধাপ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। এরই ধারাবাহিকতায় গ্রাম্য জনপদের ঘরে ঘরে টেলিভিশন পৌঁছে গেছে। মানুষ এখন আর খেলা দেখতে অন্যের বাড়িতে ভিড় জমায় না। নিজের ঘরে খেলা দেখার পাশাপাশি কর্মজীবী মানুষ চলাচলের পথে রাস্তার পাশে খেলা দেখছে। এখন সারা দেশে সারা বিশ্বে রাস্তাঘাটে, ঘরেবাইরে, অফিস-আদালতে সবখানে চলছে ফুটবল খেলা নিয়ে উন্মাদনা। তবে মনে অবশ্যই প্রশ্ন জাগে বিশ্বকাপ ফুটবলের জন্ম হয়েছে কীভাবে?

১৮৭২ সালে প্রথম আনুষ্ঠানিক আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় গ্লাসগোয়। গ্রেট ব্রিটেনের বাইরে এই প্রথম মুখোমুখি হয়েছিল স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ড। ১৯১৪ সালে ফিফা অলিম্পিকের জন্য 'বিশ্ব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ' হিসেবে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপকে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হয় এবং এই অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯২০ সালে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে বেলজিয়াম বিজয়ী হয় এবং পরবর্তী ১৯২৪ ও ১৯২৮ সালে বিজয়ী হয় উরুগুয়ে।

১৯২৮ সালে ফিফা তাদের নিজস্ব আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে খেলার সিদ্ধান্ত নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৩০ সালে তৎকালীন ফিফা প্রেসিডেন্ট জুলিস রিমেট একটি আন্তর্জাতিক পুরুষ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করেন। এটি বিশ্বকাপ ফুটবলের উদ্বোধন হিসেবে ধরে নেওয়া হয় বিশ্বের মানচিত্রে। সেই বছর ছিল উরুগুয়ের স্বাধীনতার শতবছর উদযাপন। ফিফা বিশ্বকাপের হোস্ট দেশ হিসেবে উরুগুয়ে নির্বাচন করে। কিন্তু উরুগুয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের পারে অবস্থিত বলে ইউরোপিয়ানদের জন্য সেটি ছিল দীর্ঘসময় এবং ব্যয়বহুল। তথাপি দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সাতটি, ইউরোপ থেকে চারটি ও উত্তর আমেরিকা থেকে দুটি– এ ১৩টি দেশ নিয়ে শুরু হয় ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল।

প্রথম দুটি বিশ্বকাপ একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বছর ফ্রান্স ও মেক্সিকো প্রতিযোগিতায় ৪-১ গোলে ফ্রান্স বিজয়ী হয়। পরেরটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়ামের মধ্যে ৩-০ গোলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিজয়ী হয়। বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম গোলটি ফ্রান্সের লুসিয়েন লরেন্টে করেছিলেন। এর চার দিন পর প্রথম বিশ্বকাপ হ্যাটট্রিকটি করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্ট প্র্যাটেনডেজ। ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনা। ৪-২ গোলে আর্জেন্টিনাকে পরাজিত করে উরুগুয়ে বিশ্বকাপ জয় করেছিল।

১৯৩২ সালে লসএঞ্জেলেসে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকসে নিম্ন জনপ্রিয়তার কারণে ফুটবল অন্তর্ভুক্ত না করার সিদ্ধান্ত হয়। কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়– তৎকালীন এটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়াগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম জনপ্রিয় খেলা।

১৯৫৪ সালে সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ খেলাটি সর্বপ্রথম টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছিল। ১৯৫২ সালে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে অসাধারণ পারফরম্যান্সের কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন এ বছর বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করেনি। এ টুর্নামেন্টে স্কটল্যান্ড নিজেদের প্রথম প্রদর্শনী করে। তবে গ্রুপ পর্যায়ে যাওয়ার পর তারা জয়লাভ করতে ব্যর্থ হয়। এ টুর্নামেন্টে বেশ কয়েকটি সর্বোচ্চ গোল এবং সর্বোচ্চ স্কোরের রেকর্ড স্থাপন করেছিল হাঙ্গেরি। তবে ফাইনালে সর্বোচ্চ রেকর্ডকৃত হাঙ্গেরিকে হারিয়ে জার্মানির বিশ্বকাপ জয় এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

১৯৬২ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজন করা হয়েছিল চিলিতে। খেলা শুরু হওয়ার আগে দেশটিতে সর্বোপরি ৯.৫ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। বিশেষ ক্ষয়ক্ষতির কারণে কর্তৃপক্ষ অবকাঠামো পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নেয় এবং খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর চেকোস্লোভাকিয়াকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ব্রাজিল তাদের দ্বিতীয় বিশ্বকাপ ঘরে তোলে।

দেশে চলছে বিশ্বকাপ ফুটবলের মৌসুম। রাশিয়ায় বসছে বিশ্বকাপ ফুটবলের ২১তম আসর। তার উচ্ছ্বাস ছাপিয়ে এসেছে আমাদের দেশেও। খেলার শুরুতে দেশের আনাচে কানাচে দেখা মিলেছে ভিনদেশীয় পতাকা বাহার। ছাদে ছাদে ওড়ে প্রিয় পতাকা, গায়ে জড়ানো হয় প্রিয় খেলোয়াড়ের জার্সি। খেলা শেষে হার-জিত নিয়ে চলে ফেসবুকে টিপ্পনী। পথে নামে আনন্দ মিছিল। রাস্তার মোড়ে দুই দল নিয়ে তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। যাই হোক, এবার ৩২টি দল নিয়ে শুরু হয়েছে বিশ্বকাপ। পরবর্তী বিশ্বকাপ ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত হবে মরুর দেশ কাতারে।

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব নেই। তাই বলে আশাহত হওয়ার কোনো কারণ নেই। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক সচেতনতা তৈরির পথ ছিল ফুটবল। এ সময় যারা ফুটবল খেলেছেন, তাদের নিয়ে তৈরি হয়েছে স্বাধীন বাংলা ফুটবল টিম। এটি ২০০৯ সালে বিএফএফ (বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন) দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তারা ভারতের সঙ্গে ১৬টি ম্যাচ খেলেছে।

নব্বইয়ের দশকের আগে লীগ ফুটবলের জাতীয় ফুটবলে জয় দেখা যায়। বিশেষ করে ঢাকা লীগে, যেখানে ঘরোয়া এবং বিদেশে উভয়ই বিখ্যাত ক্লাব দল ছিল। ১৯৪০ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের অধীনে লীগ ফুটবল জনপ্রিয় ছিল। ঢাকার বেশ কয়েকটি প্রধান ফুটবল ক্লাব ছিল। ১৯৪০-এর দশকে ঢাকা ওয়েন্ডার্স, ভিক্টোরিয়া এসসি, ওয়ারী ক্লাব, মোহামেডান এসসি, ইপি জিমখানা, রেলওয়ে এবং ফায়ার সার্ভিস সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষা আন্দোলনের তিন বছর আগে পাকিস্তান শাসনের অধীনে প্রথমবারের মতো ঢাকা লীগ বাংলাদেশি ভিক্টোরিয়া এসসির মাধ্যমে জয় লাভ করে। তখন দক্ষিণ এশিয়া ও এশিয়ায় ঢাকা লীগ খুবই মর্যাদাপূর্ণ ছিল। ঢাকা লীগের অনেক দল এশিয়া মহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে সফল দলগুলোর অন্যতম হিসেবে পরিণত হয়েছিল। ঢাকা লীগ ইউরোপিয়ানদের শীর্ষ দলগুলোর সঙ্গে খেলেছে। ঢাকা লীগ আন্তঃদেশ এবং বিদেশে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশি ক্লাব যেমন বিকেএসপি এবং বাংলাদেশ লাল সাফল্য অর্জন করেছে আগা খান গোল্ডকাপ, প্রেসিডেন্ট গোল্ডকাপ, ডানা কাপ এবং গোথিয়া কাপ।

বাংলাদেশি ক্লাবগুলো তিনটি শীর্ষ শিরোপা জিতেছিল, ১৯৮৫ সালে পাকিস্তানের কায়েদ-ই-আজম ট্রফি, ১৯৯৫ সালে মিয়ানমারের চার জাতি রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতা এবং ২০০৩ সালে ভুটানের জিগমে ডোরজি ওয়াংচুক মেমোরিয়াল ফুটবল।

১৯৭২ সালে বিএফএফ (বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন) প্রতিষ্ঠার পর মালয়েশিয়ায় ১৯৭৩ সালে মরডেকা টুর্নামেন্টে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিল বাংলাদেশ। ১৯৭৪ সালে ফিফা এবং এশীয় ফুটবল কনফেডারেশনের সদস্যপদ লাভের পর জাতীয় দল ১৯৮০ সালে এএফসি এশিয়া কাপ এবং ১৯৮৬ সালে ফিফা বিশ্বকাপ কুইকাইফায়ারস অংশগ্রহণ করেছিল।

২০১১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ফুটবলের জন্য সবচেয়ে অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। লিওনেল মেসি এসেছিলেন বাংলাদেশে। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনার জাতীয় দল ও নাইজেরিয়া একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলেছিল। এ সময় বাংলাদেশি ফুটবলাররা আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের অনুশীলন দেখার অনুমতি পেয়েছিল। এ সময় মেসি ও আর্জেন্টিনার অন্য ফুটবলাররা বাংলাদেশি ফুটবলারদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। আর্জেন্টিনা দল বলেছিল, ফুটবল ব্যবস্থাপনায় বিশ্বমানের সুবিধা প্রদান করলে বাংলাদেশ ফুটবলও একদিন বিশ্বমানের দল হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে পারে।

ফুটবলের স্বপ্ন দেখতেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একজন জাত ফুটবলার ছিলেন বঙ্গবন্ধুপুত্র শেখ কামাল। তবে মনে মনে প্রশ্ন জাগে, সেই জনপ্রিয় ফুটবল কেন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। বিশ্বদরবারে কেন যেতে পারছে না গ্রামবাংলার জনপ্রিয় ফুটবল খেলা। অতীতের তুলনায় বাংলাদেশের ফুটবলের মান খারাপ, এর মূল কারণ হতে পারে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। টেস্ট ক্রিকেটে সাফল্যের ফলে এবং ক্রিকেট বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের ফলে ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহের কারণে দেশের ফুটবলের অতিত খ্যাতি চাপা পড়ে যায়। এটি নিশ্চয়ই কোনো গর্বের বা সাফল্যের খবর নয়। ফুটবল কম সময়ে বেশি উত্তেজকপূর্ণ বিনোদন দেয়। এমনকি এ খেলা বুঝতে হয় না, উপোভোগ করাটাই আসল বিষয়। আশা করি, এ দেশের ফুটবলবোদ্ধা এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকরা এ দিকে সুনজর দেবেন। ফেডারেশনের কর্মকর্তা এবং বিশেষজ্ঞরা অর্থিক বাধা ও পেশাদারিত্বের অভাব সত্ত্বেও আগামী দশ বছরে বাংলাদেশের ফুটবল উন্নয়ন করবে। আমরা আবার একটি সুন্দর পরিবেশ পাব, মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলা উপভোগ করব– এ আশা ব্যক্ত করি।

লেখক: *সাংবাদিক, নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক*

বাংলাদেশের নারী ফুটবলার সম্ভাবনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

তৌহিদা শিরোপা

ফিফা র‍্যাংকিংয়ে দ্রুতই এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। সাম্প্রতিক সময়ে কৃষ্ণা-মারিয়া-সাবিনাদের সাফল্যে র‍্যাংকিংয়ের ১০০তে উঠে এসেছে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে নারী ফুটবলে বাংলাদেশই এগিয়ে। শেষ সিনিয়র সাফেও রানার্সআপ বাংলাদেশের মেয়েরা। যেখানে যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে লিগ হয়, ভারত, মালদ্বীপ ও নেপালে মেয়েদের লিগ নিয়মিত, সেখানে বাংলাদেশে লিগ না হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না বলেই মনে করেন ফুটবলসংশ্লিষ্টরা। ফিফা র‍্যাংকিংয়ে দ্রুতই এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। সাম্প্রতিক সময়ে কৃষ্ণা-মারিয়া-সাবিনাদের সাফল্যে র‍্যাংকিংয়ের ১০০তে উঠে এসেছে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল।

সাবিনা, মারিয়া ও কৃষ্ণাদের গল্প শুনে আসি। মেয়েদের জাতীয় ফুটবল দলের সাবিনা খাতুন ও কৃষ্ণা রানি সরকারেরই আছে লিগ খেলার অভিজ্ঞতা। বর্তমান দলে সাবিনাই একমাত্র ফুটবলার, যিনি ২০১৩ সালে শেখ জামালের হয়ে শেষ বাংলাদেশ লিগ খেলেছিলেন। এরপর তার ভান্ডারে জমা হয়েছে মালদ্বীপ ও ভারতীয় লিগে

খেলার অভিজ্ঞতা। অন্যদিকে কৃষ্ণা এবারই প্রথম সাবিনার সঙ্গে ভারতীয় ক্লাব সিথু এফসিতে খেলে এসেছেন।

কৃষ্ণা রানী সরকার

টাঙ্গাইল থেকে ভোরে বাসে উঠেছিলেন। সম্প্রতি হোটেল সোনারগাঁওয়ের বলরুমে যখন বাবা বাসুদেব সরকারের হাত ধরে ঢুকলেন, ক্লান্ত লাগছিল কৃষ্ণা রানী সরকারকে। সেই মুখেই যেন চাঁদের হাসি ঝরল প্রথম আলোর বর্ষসেরা নারী ক্রীড়াবিদের পুরস্কার পেয়ে। কিন্তু এর আগের ১২ বছরে তিনজন মাত্র ফুটবলার জিতেছেন প্রথম আলোর পুরস্কার। ২০০৫ সালে বর্ষসেরা রানারআপ মোহাম্মদ সুজন, ওই বছরই সেরা উদীয়মান পুরস্কার পান জাহিদ হাসান এমিলি। এরপর ২০১৪ সালের বর্ষসেরা রানারআপ মামুনুল ইসলাম। কৃষ্ণা যেন ফুটবলের প্রতীক হয়েই এবার জিতলেন পুরস্কার। ১২তম এসএ গেমসে শ্রীলংকার বিপক্ষে ২-১ গোলে জেতা ম্যাচে দুটি গোলই ছিল কৃষ্ণার। ঢাকায় এএফসি অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়েদের ফুটবলের আঞ্চলিক বাছাইপর্বে বাংলাদেশকে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন করতে বড়ো অবদান ছিল কৃষ্ণার। চার ম্যাচে করেন ১১ গোল। এখন জাতীয় দলেরও গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় কৃষ্ণা।

ছোটবেলায় চাচাতো ভাইদের সঙ্গে সারাক্ষণ ফুটবল খেলতেন কৃষ্ণা। মা কতবার যে বল হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বঁটি দিয়ে কুচি কুচি করেছেন! মা সব সময় বলতেন, মেয়ের খেলাধুলা ভালো লাগে না। একটা মেয়ে আমার। হাত-পা ভাঙলে বিয়ে দিতে পারব না। কৃষ্ণার বাবা অভাবের মধ্যেও মেয়েকে উৎসাহ দিতেন। দরজি বাবাকে নিজের সব পুরস্কার দিয়ে দেন কৃষ্ণা। তিনি বলেন, মা-বাবা খুব উৎসাহ দেন আমাকে। সামনে আরও ভালো করতে চেষ্টা করব। সবার দুঃখ যেন দূর করতে পারি।

সাবিনা খাতুন

সাবিনা খাতুন সুযোগ পেলেই গোলের আনন্দে মেতে উঠেন। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ফুটবল দলের বর্তমান অধিনায়ক এবং স্ট্রাইকার। ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে সাবিনার অভিষেক ঘটে জাতীয় দলে। নিজের জন্মস্থান সাতক্ষীরায় বিভিন্ন টুর্নামেন্টে খেলেছেন। শুরুতে শখের বশে খেলতেন ক্রিকেট। এছাড়া অন্যান্য খেলায় অংশ নিতেন নিয়মিত। কিন্তু সাতক্ষীরা জেলা কোচ মো. আকবরের মাধ্যমেই ফুটবলে হাতেখড়ি। বর্তমান ক্লাব মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। তার বাবা মো. সৈয়দ গাজী ও মা মমতাজ বেগম। পাঁচ বোনের মধ্যে সাবিনা চতুর্থ। বড়োবোনের কাছ থেকে পেয়েছেন সবচেয়ে বেশি সমর্থন। তিনি সেখানে পাশের দেশ নেপাল ও ভারতের উদাহরণ দেন। তিনি বলেন, সেখানে একেক জন খেলোয়াড়ের বয়স ও অভিজ্ঞতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। কারণ তাদের

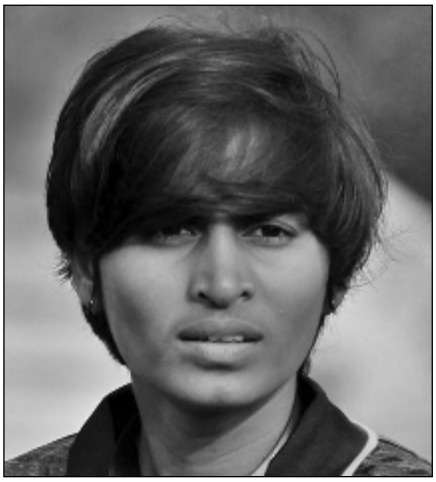

মেয়েদের ফুটবলের ইতিহাস ৩০-৪০ বছর পুরোনো। আরও বলেন, মাঠে যখন খেলতে যান, তখন তাদের পোশাক থাকে হাফপ্যান্ট ও জার্সি। ঢাকার বাইরে খেলতে গিয়ে দর্শকদের কাছ থেকে কটু মন্তব্য শুনতে হয়। এতে করে জুনিয়র মেয়েরা মন খারাপ করে। আমি তাদের সাহস দিই, ফুটবল খেলতে এসেছ, এসব মাথায় নিলে চলবে না। অধিনায়কের দায়িত্ব অনেক কঠিন বলেই তার মনে হয়। তিনি বলেন, টিমের সবার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখা, কোচের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখা– এসব কিছু করতে হয়। মেয়েদের ফুটবল নিয়ে ব্যাপক আশাবাদী সাবিনা। ছেলেদের ফুটবলের চেয়ে মেয়েদের ফুটবল অনেকটা এগিয়ে রয়েছে, সেটা তাদের পারফরম্যান্স ও খেলার মানই বলে।

সুযোগ হয়েছিল মেসির খেলা দেখার। মেসির খেলা অনুপ্রেরণা সাবিনার। তিনি বলেন, সুযোগ পেলে তো আর ছেড়ে দেব না। আমি অন্যদের কথা জানি না। তবে যদি বল পাই এবং সুযোগ পেয়ে গোল করতে পারি, তাহলে সেটা অবশ্যই আমার ক্রেডিট। আমার কাজই হচ্ছে গোল করা। মাঠে মেসির খেলা দেখে আমি ওকে ফলো করার চেষ্টা করছি। বিশেষ করে ওর পাস, রানিং স্টাইল খুবই সুন্দর। জানি না মাঠে সেটা কতটুকু করতে পারব। মেসিকে দেখার পর ভাবছি, এত সুন্দর ফুটবল খেলেন কীভাবে?

নারীদের এই ফুটবল দলে 'মেসি' আছে। মেসির দুই বন্ধুও আছে। অষ্টম শ্রেণিতে পড়া তহুরা শুধু ময়মনসিংহ নয়, ঢাকার মাঠেও 'ছোটদের মেসি' হিসেবে পরিচিত।

মারিয়া মান্দা

মা এনতা মান্দার জীবন-লড়াইটা মনের ভেতরে পুষে রাখেন মারিয়া মান্দা। বাবার চেহারা কেমন

ছিল, মনে নেই। বাবার একটা ছবিও নেই যে দেখব। কখনো বাবাকে দেখতে ইচ্ছে করলে মায়ের মুখটা সবার আগে মনে পড়ে। বাবা বীরেন্দ্র মান্দা যখন মারা যান, তখন মারিয়া তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। ছোট ভাই দানিয়েল মান্দা ছিল মায়ের গর্ভে। মারিয়া বলেন, সেই থেকে আমাদের চার ভাইবোনকে নিয়ে মা এনতা মান্দার লড়াইটা শুরু। আমাদের নিয়ে এখনো লড়ে যাচ্ছেন মা। ময়মনসিংহের মন্দিরগোনা গ্রামে তার বাড়ি। যখন কলসিন্দুর স্কুলে মফিজ স্যারের কাছে আমরা ফুটবলের অনুশীলন করতাম, গ্রামের অন্যরা নানা সমালোচনা করত। অনেক বাবা-মা পড়াশোনার ক্ষতি হওয়ার ভয়ে মেয়েদের খেলতে পাঠাতে চাইতেন না। কিন্তু আমার মা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কখনো যদি অনুশীলনে যেতে দেরি হতো, বকাবকি শুরু করে দিতেন। মা অন্যের জমিতে কাজ করেন। ধানের মৌসুমে ধান লাগান, মৌসুম শেষে ধান কাটার কাজ করেন। এজন্য দিনে ২০০ টাকা পারিশ্রমিক পান। শত অভাবেও আমার কোনো চাওয়া কখনো অপূর্ণ রাখেননি। আমার এখনো মনে পড়ে, ছোটবেলায় বুট কিনতে চাইলে চাল বিক্রি করে সেটা কিনে আনতেন মা। খেলার অন্য সরঞ্জামও কতবার কিনে দিয়েছেন এভাবে! ফুটবল খেলে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে দুই দফা এক লাখ করে টাকা পেয়েছেন মারিয়া। ওই টাকা দিয়ে মা কিছু জমি বন্ধক রেখেছেন। কিছু ঋণ শোধ দিয়েছেন। বিদেশে খেলতে যাওয়ার সময় মারিয়া ভাবেন, আহা, একবার যদি মাকে নিয়ে অন্তত উড়োজাহাজে চড়তে পারতাম।

গ্রামে যখন ফুটবল খেলতেন, মায়ের চিন্তা থাকত মেয়ের যাতায়াত নিয়ে। আগে তাদের গ্রামের নেতাই নদীতে সেতু ছিল না। ভোরে নদীতে নৌকা পাওয়া যেত না। কীভাবে আমাকে ওপারে পৌঁছে দেওয়া যায়, সেটাই ছিল মায়ের একমাত্র চিন্তা। এমনও হয়েছে, মাঝিকে ফোন করে আগেই বলে রাখতেন আমি খেলতে যাব। কোনো কোনো দিন মাঝি না থাকলে মা নৌকা বেয়ে আমাকে পার করে দিয়ে আসতেন। আমাদের কোনো খেলা যদি টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হতো, সেটা যেভাবেই হোক মায়ের দেখতেই হবে। অনেক সময় সব খেলা বিটিভিতে দেখায় না। কিন্তু খেলা দেখার জন্য অনেক দূরের গ্রামে গিয়ে বসে থাকেন মা।

মার্জিয়া

এই দলের আরেকজন মার্জিয়া। খুব লাজুক স্বভাবের। কিন্তু খেলার মাঠে উধাও হয়ে যায় এসব লজ্জা। বল যেন মার্জিয়ার কথা শুনে।

সানজিদা

বয়সভিত্তিক ফুটবলে সানজিদা এশিয়ার সেরাদের একজন। বললেন, ২০১১ সালে প্রথম ঢাকায় এসেছিলাম। রাস্তা পার হতে খুব ভয় লাগত। এখন লাগে না।'

গ্রামের সহজ-সরল এই মেয়েরা মাঠে কতটা অপ্রতিরোধ্য, তা ইতোমধ্যে টের পেয়েছে অনেক দল। নেপালের এএফসি অনূর্ধ্ব-১৪ টুর্নামেন্টের আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়নশিপে ১৮ সদস্যের বাংলাদেশ দলে ছিল এই মেয়েরা। তবে এই মেয়েরা সুযোগ-সুবিধা চায় শুধু তাদের ভালো খেলা, সেরা নৈপুণ্য দেখানোর জন্য। তারাও মেসি, রোনাল্ডো, নেইমারদের মতো হতে চায়। আন্তর্জাতিক আরও খেলা জিতে দেশের নাম তুলে ধরতে চায়। কে জানে, তহুরা একদিন সত্যিই মেসি হয়ে উঠল।

লেখক: সাংবাদিক, দৈনিক প্রথম আলো

বাংলাদেশের নারী খেলোয়াড়দের সাফল্যগাথা

কমল চৌধুরী

বাংলার নারীরা ক্রীড়াঙ্গনেও সুনিপুণভাবে ক্রীড়া প্রদর্শন করে প্রতিভা বিকাশের চেষ্টা করছেন। নারীরা ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, কারাতে, জুডো, ভলিবল, দাবা, ব্যাডমিন্টনসহ বিভিন্ন খেলাধুলার ক্ষেত্রে হাঁটি হাঁটি পা পা করে সফলতার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন

বাস্তবিকই সত্য যে, এ পৃথিবীতে পুরুষের সব কল্যাণ কাজের একান্ত সহযোগী হচ্ছেন নারী। তাই নারীদের অবদানকে কোনোক্রমেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, কৃষিমন্ত্রী, হাইকোর্টের বিচারপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদান রেখে যাচ্ছেন। সংগত কারণে বাংলার নারীরা ক্রীড়াঙ্গনেও সুনিপুণভাবে ক্রীড়া প্রদর্শন করে প্রতিভা বিকাশের চেষ্টা করছেন। নারীরা ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, কারাতে, জুডো, ভলিবল, দাবা, ব্যাডমিন্টনসহ বিভিন্ন খেলাধুলার ক্ষেত্রে হাঁটি হাঁটি পা পা করে সফলতার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। দেশীয় ক্ষেত্র ছাড়া আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও নারীরা ক্রীড়াক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের নারীরা দেশের সুনাম বৃদ্ধি করতে পেরেছেন।

ক্রিকেট বাংলাদেশকে অনেক কিছুই দিয়েছে– বিশ্বব্যাপী পরিচয়, এশিয়ান গেমসের সোনা। কিন্তু সাকিব আল হাসান, মাশরাফি বিন মুর্তজারাও একটি অতৃপ্তি রেখে যাচ্ছিলেন বারবার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোনো শিরোপা জিতে উৎসবের সুযোগ করে দিতে পারেননি তারা। কিন্তু ছেলেদের অতৃপ্তি ঘোচালেন মেয়েরা। রুমানা-আয়েশাদের হাত ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম শিরোপা পেল বাংলাদেশ। আইসিসি ও এসিসি ট্রফি নামে দুটি শিরোপা ছেলেরা এনে দিয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু সেগুলো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অর্জন নয়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশ কোনো শিরোপা জয়ের কাছাকাছি গিয়েছে দুবার। ২০১২ সালের এশিয়া কাপ আর ২০১৮ সালের নিদাহাস ট্রফি, দুবারই শিরোপার গন্ধ পেতে পেতেও শেষ বলে এসে দীর্ঘশ্বাস সঙ্গী হয়েছে বাংলাদেশের। ২০১৬ সালের এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টিতে ফাইনালে গিয়েও হারতে হয়েছে। এবারও ২০১২ সালের স্মৃতিটা ফিরে এসেছিল। শেষ ওভারে ৯ রান দরকার। পাকিস্তানের বিপক্ষে সে ফাইনালই কি ফিরে এলো! প্রথম ৩ বলে ৬ রান তুলে রুমানা আহমেদ আশা জাগালেন। কিন্তু পরপর দুই বলে উইকেটে থাকা দুই ব্যাটার সানজিদা ও রুমানা আউট হয়ে গেলেন। শেষ বলে দরকার দুই রান। আবারও আরেকটি হতাশার গল্প লিখতে হবে? লিখতে হবে আরেকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলার কথা? কিন্তু জাহানারা সে কষ্ট দিতে রাজি হলেন না। ভারত অধিনায়ক হারমানপ্রীত কাউরের বল মিড উইকেট দিয়ে পাঠিয়েই ভোঁদৌড়। ছুট ছুট ছুট। বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে এশিয়ার ক্রিকেটের হিমালয় সমদূরত্বে থাকা ভারতকে স্তব্ধ করে দিয়ে দৌড়াতেই থাকলেন জাহানারা, অন্যপ্রান্তে সালমা। সে দৌড়টা যখন থামল, ততক্ষণে ইতিহাস হয়ে গেছে। মাঠে ঢুকে গেছেন রুমানা-সানজিদারা। বাংলাদেশের দুঃখের অবসান ঘটল। একটি আন্তর্জাতিক ট্রফি উঁচিয়ে ধরার দৃশ্য দেখালেন মেয়েরা। টানা ছয়বারের চ্যাম্পিয়নদের হারিয়েই বাংলাদেশকে অমৃত স্বাদ এনে দিলেন রুমানা-সানজিদা-আয়েশারা।

২০০৪ সালে দেশে নারী ফুটবল চর্চা আবার শুরু হয়েছে। মাত্র ১৪ বছরে এশিয়ার পরাশক্তিদের তালিকায়, হোক সেটা বয়সভিত্তিক পর্যায়ে। ২০১৬ সালে শিলিগুড়িতে বড়োদের সাফে রানার্সআপ, গত ডিসেম্বরে অনূর্ধ্ব-১৫ সাফে ও এএফসি অনূর্ধ্ব-১৪ আঞ্চলিক টুর্নামেন্টে টানা দুবার আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন, অনূর্ধ্ব-১৬ পর্যায়ে এশিয়ায় সাত নম্বরে বাংলাদেশ। মূলত মেয়েদের দীর্ঘদিন ক্যাম্পে রাখার সুফল পাচ্ছে বাংলাদেশ। হংকংয়ের সিও সাই ওয়ান স্পোর্টস গ্রাউন্ডে স্বাগতিকদের হাফ ডজন গোল দিয়ে জকি ক্লাব অনূর্ধ্ব-১৫ গার্লস আমন্ত্রণমূলক আন্তর্জাতিক ফুটবলে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন মারিয়া, নীলা, মনিকারা। ১ এপ্রিল সিও সাই ওয়ান স্পোর্টস গ্রাউন্ডে হাজারতিনেক প্রবাসী বাঙালি যেভাবে দেড় ঘণ্টা গলা ফাটিয়ে 'বাংলাদেশ-বাংলাদেশ' চিৎকার করেছে, দেখে বোঝার উপায় ছিল না স্বাগতিকদের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ।

শেষ ম্যাচে হংকংকে ৬-০ গোলে হারিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রশংসায় ভেসেছে বাংলার কিশোরীরা। স্বাধীনতার মাসে জেতা ট্রফিটা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে। প্রবাসীদের উৎসাহে উজ্জীবিত ছিল মারিয়া, সাজেদা, তহুরা, আনাই, শামসুন্নাহার, মাহমুদা, আনুচিং, মনিকা, আঁখি, নীলা, সোহাগী, লাবণী, দীপা, রুমি, রুপা, মুন্নিরা। টুর্নামেন্টে মালয়েশিয়া (১০-১) ও ইরানের (৮-১) বিপক্ষে আগের দুটি ম্যাচের নৈপুণ্যে স্বাগতিকদের বিপক্ষে ফেভারিট হয়ে মাঠে নেমেছিল মারিয়ারা। ছোটনের দল হাফ ডজন গোল দিয়ে টুর্নামেন্টে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন। প্রতিটি ম্যাচ থেকে শুরু করে যেভাবে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে অজপাড়াগাঁর মেয়েরা, তাদের খেলা দেখে আশ্চর্য খোদ কোচ গোলাম রব্বানী ছোটনই। বলেন, 'মেয়েদের খেলায় যে উন্নতি হয়েছে, সে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পেরেছি। গত সাফে চারটি ম্যাচ যেভাবে খেলেছে মেয়েরা, হংকংয়েও সেই ছন্দ ছিল; আমাদের নৈপুণ্যে উত্থানপতন হয়নি। সব ম্যাচে একই রকম ফুটবল খেলেছে, এটা আমার কাছে আশ্চর্যজনক মনে হয়েছে।' দেশসেরা নারী ফুটবল কোচের দৃষ্টিতে দলের সাফল্যের নেপথ্য কারণ মেয়েদের একাগ্রতা, কঠোর অনুশীলন। কয়েক মাস মেয়েরা টেকনিক্যালি, শারীরিক, মানসিক সবদিকে উন্নতি করেছে। অদম্য কিশোরীদের ফুটবলশৈলীতে ভেসে গেছে প্রতিপক্ষরা, তাদের জালে ২৪ বার বল ফেলেছে তারা। আট গোল করে টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ গোলদাতা তহুরা খাতুন; তবে ৫ গোল করে টুর্নামেন্টসেরা হয়েছে ফরোয়ার্ড শামসুন্নাহার (ছোট)। ২০১৬ সালে তাজিকিস্তানে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৪ আঞ্চলিক টুর্নামেন্টের মতো হংকংয়েও দুটি হ্যাটট্রিক তহুরার। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এটি তার পঞ্চম হ্যাটট্রিক। ইরানের বিপক্ষে মাত্র ২৫ সেকেন্ডে জাল খুঁজে পেয়েছিল কলসিন্দুরের মেয়েটি। আগের তিনটি হ্যাটট্রিক হচ্ছে গত বছর ঢাকায় অনূর্ধ্ব-১৫ সাফে নেপাল, ২০১৬ সালে তাজিকিস্তানে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৪ আঞ্চলিক টুর্নামেন্টে ভারত এবং স্বাগতিকদের বিপক্ষে। নারী ফুটবলারদের ব্যস্ততা শুরু হয়েছে হংকংয়ে চার জাতি জকি ক্লাব যুব (অনূর্ধ্ব-১৫) আমন্ত্রণমূলক আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট দিয়ে। হংকং থেকে ফিরে দেশসেরা কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন শুরু করবেন থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় এএফসি ফুটবলের প্রস্তুতি, খেলবে জাতীয় দল। ২ থেকে ২২ মে ব্যাংককে হবে ১৫ জাতির ফাইভ-এ-সাইড টুর্নামেন্টটি। স্ট্রাইকার সাবিনা খাতুন ও কৃষ্ণা রানী খেলেছেন ভারতের মহিলা লিগে। এই দুজন ছাড়া থাকছেন সানজিদা, মৌসুমী, মাহমুদা ও মারিয়া। এরপর আগস্টে হবে সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ ও অনূর্ধ্ব-১৮ চ্যাম্পিয়নশিপ। সেপ্টেম্বরে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৬ বাছাই পর্ব, অক্টোবরে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৯ বাছাই পর্ব, ডিসেম্বরে ঢাকায় জাতীয় দলের নারী সাফ। তবে এত খেলার ভিড়ে বড়ো আকর্ষণ কনকাকাফ অনূর্ধ্ব-১৫ মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নেয়ার সম্ভাবনা। ৬ থেকে ১১ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় হবে ৩২ দেশের টুর্নামেন্টটি। বিশ্বমানের টুর্নামেন্টে খেলতে চায় বাংলাদেশ। ফিফা নির্বাহী সদস্য ও বাফুফে মহিলা কমিটির চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার কিরণ বলেন, আমরা কনকাকাফে খেলতে আগ্রহী। তাই টুর্নামেন্টে নাম নিবন্ধন করতে চাই। তবে এশিয়া অঞ্চল থেকে মাত্র একটি দেশ সুযোগ পায় এখানে খেলার। যে সুযোগটা করে দেবে এএফসি। প্রতি দুই বছর পর হওয়া টুর্নামেন্টটি সর্বশেষ হয়েছে ২০১৬ সালে ওরল্যান্ডো সিটিতে। ক্যারিবিয়ান, মধ্য ও উত্তর আমেরিকা এবং কনমেবল অঞ্চলের দেশগুলো খেলে টুর্নামেন্টে। এশিয়া থেকে খেলবে একটি দেশ। বাংলাদেশ সুযোগ পাবে কি না, তা নির্ভর করবে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (এএফসি) ওপর। মাহফুজা আক্তার কিরণ জানান, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের মেয়েদের অনেক সাফল্য-সুযোগ আসতে পারে। একই সময়ে সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ টুর্নামেন্টও হবে। সাফের খেলাটাও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেখতে হবে। অবশ্য ইতোমধ্যে সাফের টুর্নামেন্ট পেছানোর অনুরোধ করেছি কর্মকর্তাদের কাছে। হংকংয়ের টুর্নামেন্টে সাফল্য প্রসঙ্গে বাফুফে মহিলা উইং চেয়ারম্যান জানান, প্রথমে ধন্যবাদ জানাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। বড়ো অনুপ্রেরণা গত ডিসেম্বরে ভারতকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৫ সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী দলকে গণভবনে ডেকে নিয়ে যে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়ার পর আরো ভালো খেলার প্রেরণা পেয়েছে মেয়েরা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট নিয়মিত হচ্ছে। এ টুর্নামেন্টের মাধ্যমে মেয়েদের ফুটবল দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে। মেয়েরা ফুটবলে আগ্রহী হচ্ছে। নেপাল থেকে তাজিকিস্তান, বাংলাদেশ হয়ে হংকং– দিন দিন অপ্রতিরোধ্য লাল-সবুজ বয়সভিত্তিক নারী দল। তহুরা, আনুচিং, শামসুন্নাহার, সাজেদারা গাইছেন দিনবদলের গান। সাফল্যের শুরুটা ২০১৫ সালে নেপালে এএফসি কাপ অনূর্ধ্ব-১৪ শিরোপা দিয়ে। এরপর তিন বছরে তাজিকিস্তানে এএফসি অনূর্ধ্ব-১৪, ঢাকায় অনূর্ধ্ব-১৬ বাছাই পর্বে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে চূড়ান্ত পর্ব খেলা, অনূর্ধ্ব-১৫ সাফে চ্যাম্পিয়ন ছোটনের শিষ্যরা। সবশেষে জকি কাপে এশিয়ার তিন পরাশক্তি মালয়েশিয়া, ইরান ও হংকং নাস্তানাবুদ বাংলাদেশি কিশোরীদের পায়ের জাদুতে। ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সম্পর্কে কিরণ বলেন, আমাদের চোখ মেয়েদের বিশ্বকাপ খেলা। আমরা বয়সভিত্তিক তিনটি দলকেই আমাদের চেয়ে সুপিরিয়র ভেবে খেলিয়েছি, ফলে এমন ফল। আগের দলের সাবিনা ছাড়া কেউ নেই। তাই এই টিম থেকেই ভালো ফল করতে চাই। এমন প্রত্যাশা গোটা দেশেরই। মেয়েদের স্কুল ফুটবল চালু হওয়ার পর অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধা বেড়েছে। দীর্ঘদিন ক্যাম্প, একসঙ্গে খেলা, লাল-সবুজ মেয়েদের নজরকাড়া নৈপুণ্য– সাম্প্রতিক সাফল্যের পেছনে প্রধান উপাদান। এমনকি বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ফিফার ভাষ্য, বাংলাদেশের মেয়েদের উত্থান সবার জন্য দৃষ্টান্ত। বিশ্বে মেয়েদের ফুটবলের উন্নতির পথে রোল মডেল তারা। পাঁচ বছর আগেও বাংলাদেশ নারী ফুটবলে প্রভাব বিস্তার করেছেন শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মেয়েরা। সরকার প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ের প্রতিযোগিতা শুরু করার পর দেশের সব জেলা থেকে কমবেশি খেলোয়াড় তৈরি হতে থাকে। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, সিলেট, গাজীপুর, সিরাজগঞ্জ ও কক্সবাজারের মেয়েরা অবদান রাখতে শুরু করেছেন জাতীয় পর্যায়ের বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে। কোনো সন্দেহ নেই, জাতীয় যুব মহিলা দলের ধারাবাহিক সাফল্যের গল্প দেশের মেয়েদের অন্যান্য খেলায় অনুপ্রেরণা জোগাবে। সেটা শুধু ফুটবলে নয়, বরং অন্য খেলায়ও।

লেখক: সাংবাদিক

খেলার নাম দাবা

সজীব চন্দ্র মণ্ডল

দাবা মূলত একটি বুদ্ধির খেলা। তাই অনেকে বলে থাকেন, যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভের চেয়ে দাবায় মাত করা কঠিন। এ খেলায় প্রয়োজন তুখোড় চিন্তাশক্তি, সূক্ষ্ম পরিকল্পনা এবং অসীম ধৈর্য

বিশ্বের জনপ্রিয় খেলাগুলোর মধ্যে দাবা একটি অতিপরিচিত খেলা। এটি একটি বোর্ডের উপর খেলা হয়। যিনি দাবা খেলেন, তিনি দাবাড়ু হিসেবে আখ্যায়িত। দাবায় দুজন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন। দাবায় জিততে হলে বোর্ডের উপর ঘুঁটি সরিয়ে বা চাল দিয়ে বিপক্ষের রাজাকে ফাঁদে ফেলে 'খেতে' বা নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়। দাবার পরিভাষায় একে বলে 'কিস্তিমাত'। দাবা মূলত একটি বুদ্ধির খেলা। তাই অনেকে বলে থাকেন, যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভের চেয়ে দাবায় মাত করা কঠিন। এ খেলায় প্রয়োজন তুখোড় চিন্তাশক্তি, সূক্ষ্ম পরিকল্পনা এবং অসীম ধৈর্য। আমাদের দেশে দাবা খেলা এখনো উল্লেখযোগ্য স্থানে না পৌঁছলেও প্রায় সব শ্রেণির মানুষের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

প্রচলিত মতবাদ অনুসারে দাবা খেলার জন্ম প্রাচীন ভারতবর্ষে। এছাড়া পারস্যে (বর্তমান ইরান) তৃতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত শতরঞ্জ

এবং চীনে দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত শিয়াংছি নামক খেলাকে দাবার পূর্বসূরি হিসেবে গণ্য করার পক্ষেও মতামত আছে। কথিত আছে, রাবণের স্ত্রী চিত্রাঙ্গদা যুদ্ধে নিবৃত করার জন্য রাবণের সঙ্গে দাবা খেলতেন। প্রাচীন ভারতীয় খেলা হিসেবে দাবার সংস্কৃত শব্দ শতরঞ্জ খেলাটি পরিবর্তিত রূপে পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে পরিমার্জিত হয়ে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে ক্রীড়াবিদরা দাবার কৌশল এবং বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগে খেলাটির ধারাই পরিবর্তন করে দিয়েছেন। অনেক বছর ধরে দাবা খেলার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে কম্পিউটারের সহযোগিতা নিচ্ছেন ব্যবহারকারীরা। তেমনি একটি হলো ডিপ ব্লু। এটিই প্রথম যন্ত্রচালিত প্রোগ্রাম। ১৯৯৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ফিলাডেলফিয়া, পেনসিলভানিয়ায় শুরু হওয়া যন্ত্র বনাম মানুষের মধ্যকার আনুষ্ঠানিক খেলায় তৎকালীন বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন রাশিয়ান দাবা গ্র্যান্ডমাস্টার গ্যারি কাসপারভ এই ডিপ ব্লুর কাছে পরাভূত হন।

বিশ্ব দাবা ফেডারেশন বা ফিদে কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মকানুন দাবা খেলায় প্রয়োগ করা হয়। স্বীকৃত দাবা প্রতিযোগিতাগুলো ফিদে হ্যান্ডবুকে বর্ণিত নিয়মে পরিচালিত হয়। একটি দাবা বোর্ডে বর্গাকৃতি ৬৪টি সাদা-কালো ঘর থাকে। ঘরগুলোতে প্রতিটি খেলোয়াড়ের একটি করে রাজা বা কিং, মন্ত্রী বা কুইন, দুটি করে নৌকা বা রুক, ঘোড়া বা নাইট ও গজ বা বিশপ এবং ৮টি করে সৈন্যসহ ১৬টি ঘুঁটি থাকে। অর্থাৎ, দুজন খেলোয়াড়ের সর্বমোট ৩২টি ঘুঁটি থাকে। র‍্যাংক বা সারিগুলোকে ইংরেজি 'ওয়ান' (1) থেকে 'এইট' (8) সংখ্যা দিয়ে এবং ফাইল বা স্তম্ভগুলোকে ইংরেজি 'এ' (a) থেকে 'এইচ' (h) বর্ণ দিয়ে নির্দেশ করা হয়। ফলে দাবার ছকের প্রতিটি ঘরকেই একটি অনন্য বর্ণ-সংখ্যা প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা যায়। এ ঘরগুলো দুই ধরনের হয়। একটি হালকা এবং অন্যটি গাঢ় কিংবা একটি সাদা এবং অন্যটি কালো। সাধারণত ঘরগুলোর সঙ্গে মিল রেখে ঘরগুলোর রং হয়। তবে দুদলের মন্ত্রী বা কুইনের রং হবে নিজ ঘরের রঙে। ঘুঁটিগুলো দুই অংশে বিভক্ত। তা হলো সাদা এবং কালো সেট। খেলোয়াড়দের পরিচিতি হয়– সাদা এবং কালো।

প্রতিটি দাবার ঘুঁটিরই নিজস্ব চলাচলের শর্ত রয়েছে। যেমন রাজা বা কিং শুধু তার ঘরের সঙ্গে সংযুক্ত যে কোনো একটি ঘরে যেতে পারে। তবে বিশেষ শর্তে নৌকা বা রুকের সঙ্গে ঘর পরিবর্তন করতে পারে যা ক্যাসলিং নামে পরিচিত। গজ বাবিশপ যে কোনো অন্য ঘুঁটিকে অতিক্রম না করে আড়াআড়ি ঘরে যেতে পারে। মন্ত্রী বা কুইন নৌকা এবং হাতির সমন্বিত শক্তি হিসেবে অন্য ঘুঁটিকে অতিক্রম না করে সোজাসুজি কিংবা আড়াআড়ি যে কোনো ঘরে যেতে পারে। ঘোড়া বা নাইট কাছাকাছি দুই ঘর গিয়ে ডানে কিংবা বামের অন্য ঘরে যেতে পারে। ঘোড়ার চলন ইংরেজি এল অক্ষরের মতো। ঘোড়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– একমাত্র এ ঘুঁটিই যে কোনো ঘুঁটিকে অতিক্রম করে অন্য ঘরে যেতে পারে। সৈন্য (পন বা বোড়ে) নিজস্ব ফাইলে এক ঘর করে অগ্রসর হয়। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে নিজস্ব ঘর থেকে ইচ্ছে করলে দুই ঘর সামনে যেতে পারে, যদি ঘরগুলো খালি থাকে কিংবা প্রতিপক্ষের ঘুঁটিকে কেটে আড়াআড়ি অন্য ঘরে যেতে পারে। তবে সামনে যদি প্রতিপক্ষের সৈন্য থাকে, তবে আর অগ্রসর হতে পারবে না। সৈন্যর এন পাসেন্ট (En Passant) ও উত্তরণনামে দুটি বিশেষ পরিচালনা পদ্ধতি আছে। সাদা ঘুঁটি সর্বদা প্রথম চালানো হয়। এরপর থেকেই একটি ঘুঁটির পর অন্য দলের ঘুঁটি চালানো হয়। ব্যতিক্রম হিসেবে ক্যাসলিংয়ের সময় দুটি ঘুঁটি পরিচালিত হয়। খালি জায়গায় ঘুঁটি চালাতে হয় অথবা প্রতিপক্ষের ঘুঁটি দখল করে ঘর থেকে বাইরে উচ্ছেদ করা হয়। একমাত্র এন পাসন্ট নিয়ম ছাড়া, বাকি সবক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের ঘুঁটিকে উচ্ছেদ করতে ঘুঁটিটির অধিকৃত ঘর দখল করা হয়। যদি কোনো কারণে ঘুঁটি পরিচালনা করা না যায়, তাহলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ হয়। প্রতিপক্ষের রাজা আক্রান্ত হয়ে কোনো ঘরে যাওয়ার সুযোগ না থাকলে কিস্তিমাত বা চেকমেটের সাহায্যে খেলা শেষ করা হয়।

দাবা খেলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে– প্রতিপক্ষের ঘুঁটি আয়ত্তে আনার মাধ্যমে নতি স্বীকারে বাধ্য করা। তাই যুদ্ধংদেহী বোর্ড ক্রীড়া হিসেবে দাবা খেলার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। দাবা মূলত রাজার খেলা বা রাজায় রাজায় যুদ্ধের খেলা। এ খেলা হয়ে থাকে দুই দলের রাজার মধ্যে। এক রাজাকে কিস্তি দেওয়া বা আক্রমণ করাই অন্য রাজার উদ্দেশ্য। অনেক স্থানে এ খেলাকে কিস্তিমাত খেলাও বলা হয়। যে কোনো উপায়ে রাজাকে বন্দি করাই হলো দাবা খেলার মূল লক্ষ্য। খেলতে খেলতে যে দলের রাজা কিস্তির ফাঁদে আটকা পড়ে বা বন্দি হয়ে যায়, সেই রাজার দল পরাজিত হয়।

বাংলাদেশে দাবার ইতিহাসে পথিকৃৎ হিসেবে যিনি অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন, তিনি জ্ঞানতাপস ড. কাজী মোতাহার হোসেন। জাতীয় অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনের জ্ঞানচর্চার বাইরেও বাংলাদেশজুড়ে স্পোর্টসম্যান হিসেবে খ্যাতি ছিল। ১৯২৫ সালে নিখিল ভারত দাবা প্রতিযোগিতা আয়োজনের ব্যাপারে কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে তিনি ১৯২৯ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত দাবা জগতে একাধিপত্য বজায় রাখেন। দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার আয়োজনে ১৯২৫ সালের All India Chess Brilliancy Competition-এ তিনি ১০৩ পয়েন্টের মধ্যে ১০১ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত All Pakistan National Chess Federation-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ দাবা সংঘ যা পরবর্তী সময়ে (১৯৭৪ সালে) বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনরূপে পরিচিত হয়। তারও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন তিনি। তার স্মরণে ১৯৮৫ সাল থেকে বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন ড. কাজী মোতাহার হোসেন আন্তর্জাতিক মাস্টার্স চেস টুর্নামেন্ট আয়োজন করে আসছে।

বাংলাদেশের প্রথমদিকের অন্যান্য কৃতী দাবাড়ুর মধ্যে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, আকমল হোসাইন, মিঞা আবদুস সালেক প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৪ সাল থেকে প্রতিবছর জাতীয় দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২– এ চার বছর একটানা চ্যাম্পিয়ন হন নিয়াজ মোর্শেদ। ১৯৭৯ সাল থেকে আয়োজিত জাতীয় মহিলা দাবা প্রতিযোগিতায় ১২ বার চ্যাম্পিয়ন হন বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক মহিলা মাস্টার রানী হামিদ। আর ১৯৮৬ সালে এশীয় জোন ৩.১-এ ১৭টি দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত গ্র্যান্ডমাস্টার্স চ্যাম্পিয়নশিপে নিয়াজ মোর্শেদ চ্যাম্পিয়ন হয়ে বাংলাদেশের একমাত্র গ্র্যান্ডমাস্টারে পরিণত হন। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো থেকে প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার খেতাবধারী হওয়ার বিরল কৃতিত্বেরও দাবিদার। ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখায় ১৯৮৯ সালে নিয়াজ মোর্শেদ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে ভূষিত হন।

দেশের অন্য কৃতী দাবাড়ুদের মধ্যে ৫ জন আন্তর্জাতিক মাস্টার হলেন জিয়াউর রহমান, রিফাত-বিন সাত্তার, আবদুল্লাহ আল রাফী, জিল্লুর রহমান ও শামিমা আক্তার লিজা।

বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন ১৯৭৯ সালে আন্তর্জাতিক দাবা ফেডারেশনের সদস্যপদ লাভ করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিবছর ১৫-২০টি টুর্নামেন্টের আয়োজন করে। এ টুর্নামেন্টগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতীয়, মহিলা জুনিয়র, সাব-জুনিয়র, দ্বিতীয় বিভাগ, আন্তর্জাতিক মাস্টার্স ও গ্র্যান্ডমাস্টার্স দাবা টুর্নামেন্ট। স্থানীয় ক্লাবগুলোর মধ্যে ১ম বিভাগে ২৬টি রেজিস্টার্ড ক্লাব রয়েছে। আর দ্বিতীয় বিভাগে রয়েছে ৩০-৩৫টি ক্লাব। জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে জেলা চ্যাম্পিয়ন, বিভিন্ন সংস্থা ও মহানগরীর ১৬ জন নিয়ে জাতীয় বি-গ্রুপ তৈরি করা হয়। এদের মধ্য থেকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উত্তীর্ণ ১৪ জন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন শিপ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন।

লেখক: সাংবাদিক, দ্য এশিয়ান এজ

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বাংলা ভাষায় খেলার ধারাবিবরণীর প্রবর্তক আবদুল হামিদ

মাহফুজ সিদ্দিকী

জনপ্রিয় ক্রীড়া ধারাভাষ্যকার আবদুল হামিদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৪ আগস্ট ২০১২ সালে। সেদিনকার বিডিনিয়োজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের খবরটা ছিল এ রকম:

'ধারাভাষ্যকার আবদুল হামিদের মৃত্যুবরণ। জনপ্রিয় ক্রীড়া ভাষ্যকার, বিশেষভাবে পরিচিত 'হামিদ ভাই' ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন। তিনি ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। অবস্থার অবনতি হওয়ায় নিবিড় পরিচর্যার জন্যে তাঁকে আইসিইউতে রাখা হয়। একপর্যায়ে লাইফ সাপোর্টও দেওয়া হয়। তিনি শনিবার ভোরে ইন্তেকাল করেন। তাঁর স্বজন ইসরাত কাইউম বিডিনিয়োজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, কয়েক মাস আগে তাঁর দেহ থেকে একটি টিউমার অপসারণ করা হয়। তারপর থেকেই তাঁকে এ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য রাখা হয়। শুক্রবার বিকেল থেকে তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটে

> 'ধারাভাষ্যকার হিসেবে হামিদ ভাই ছিলেন আনপ্যারালাল'। তাঁর সবচেয়ে বড়ো গুণ ছিল ধারাভাষ্যের সময় এক্সপার্টদের কাছে ... গোলটা কেমন করে হলো, কেন হলো, এক্সপার্টদের কাছে শুনে তিনি নিখুঁতভাবে তা সাবলীল ভাষায় ব্যক্ত করতেন

এবং শনিবার সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বাংলাদেশের ক্রীড়া ভাষ্যকার একজন প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব, 'হামিদ ভাই' হিসেবে সকলের ভালোবাসা অর্জন করেন। সকলের অতি আপনজনে পরিণত হন। একজন 'একুশে পদক' বিজয়ী হামিদ ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। সর্বশেষ তিনি দৈনিক 'আমাদের সময়' পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক ছিলেন।

তিনি ভলিবল খেলোয়াড় ছিলেন এবং বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মহাব্যবস্থাপক ছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আতিয়ার রহমান তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাবলিক রিলেশন ডিভিশনের কর্মকর্তা ছিলেন।

তাঁর প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয় গুলশানস্থ নিকেতন মসজিদে। দ্বিতীয় জানাজা গেন্ডারিয়ার ইস্ট এন্ড ক্লাবে– যেখানে তিনি খেলতেন। তৃতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে। হামিদের চতুর্থ জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে। এরপর তাঁকে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয়।'

আবদুল হামিদ ফুটবল খেলায় ফার্স্ট ডিভিশনের ইস্ট এন্ড ক্লাবের গোলরক্ষক ছিলেন। ফার্স্ট ডিভিশনের ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের গোলরক্ষক ছিলেন। ক্রিকেট খেলায় জগন্নাথ কলেজের ক্যাপ্টেন ছিলেন। তিনি ভলিবল খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি বাস্কেটবল প্লেয়ার ছিলেন। রেজিস্ট্রার্ড রেফারি ও বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মহাব্যবস্থাপক ছিলেন। ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক বাংলারবাণী, দৈনিক জনতা ও দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকায় কাজ করেছেন। তিনি ক্রীড়া সাংবাদিক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। এদেশে সর্বপ্রথম খেলার বাংলা ভাষায় ধারাবর্ণনার প্রবর্তক।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আবদুল হামিদের জীবন কেটেছে ক্রীড়া জগৎ নিয়ে। তবে ক্রীড়া সম্পর্কিত অন্যসব কাজকে ছাপিয়ে তাঁর বাংলায় ধারাভাষ্য তাঁকে সকল শ্রেণি-মানুষের কাছে নিয়ে যায়। ধারাভাষ্য দিয়ে যে মানুষের হৃদয় জয় করা যায়, এই অভিনব-অভূতপূর্ব বিষয় সর্বপ্রথম আবদুল হামিদই দেখালেন। আর কিছু না হোক অন্তত এই ধারাভাষ্যের প্রবর্তক হিসেবে আবদুল হামিদ বাঙালি জাতির কাছে চিরানুভব হয়ে থাকবেন। ধারাভাষ্য দিয়ে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেওয়া যায়– সকল শ্রেণির-মানুষের প্রাণের 'ভাই' হওয়া যায়, ধারাভাষ্যে একুশে পদকের মতো গৌরবজনক পদক অর্জনে সিংহভাগ অবদান রাখতে পারে। তাই-ই করে দেখিয়েছেন 'হামিদ ভাই'– আবদুল হামিদ ধারাভাষ্যকার। অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক প্রদান ক্রীড়া জগতের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আন্তরিক সহযোগিতার প্রমাণ অনন্য-অসাধারণ।

আবদুল হামিদ সম্পর্কে মন্তব্য

জাকারিয়া পিন্টু (৭৮)

স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের ক্রীড়া সংগঠক, সিনিয়র ক্রীড়াবিদ, ইস্টার্ন, ওয়ান্ডারার্স ও মোহামেডান ক্লাবের সাবেক উচ্চ প্রশংসিত স্ট্রাইকার জাকারিয়া পিন্টু বলেন, 'ধারাভাষ্যকার হিসেবে হামিদ ভাই ছিলেন আনপ্যারালাল'। তাঁর সবচেয়ে বড়ো গুণ ছিল ধারাভাষ্যের সময় এক্সপার্টদের কাছে নেওয়া এবং তাদের সাথে কনসাল্ট করা। গোলটা কেমন করে হলো, কেন হলো, এক্সপার্টদের কাছে শুনে তিনি নিখুঁতভাবে তা সাবলীল ভাষায় ব্যক্ত করতেন। আর এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল– তিনি নিজে খেলোয়াড় ছিলেন বলে। আজকাল যারা ধারাভাষ্য দেন তারা নিজেরা না খেলোয়াড় ছিলেন, না এক্সপার্টদের সঙ্গে আলোচনা করেন, যে কারণে তাদের ভাষ্য প্রাণহীন ও মেকি হয়ে দাঁড়ায়।

ইস্টার্ন ক্লাব থেকে হামিদ ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে। তিনি গোলরক্ষক ছিলেন, আমি ফরওয়ার্ডে। সেখান থেকে তিনি ওয়ান্ডারার্স ক্লাবে চলে যান। কিছুদিন পর আমাকেও ওয়ান্ডারার্স ক্লাবে নিয়ে আসেন। গোলে তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে আমি মোহামেডান ক্লাবে যোগ দিই। আর হামিদ ভাই দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন। দেখা হতো, আলাপ হতো। ধারাভাষ্য নিয়ে কথা হতো। তাঁর ধারাভাষ্য খুব ভালো হচ্ছে, ভালো লাগে বলতাম, তিনি লজ্জা পেতেন শুনে। আরো ভালো করা যায় কী করলে, তা জানতে চাইতেন। মাত্র ৬টি বছর চলছে হামিদ ভাই পরপারে চলে গেছেন; কিন্তু স্মৃতি হয়ে আজও জাগরুক আমার হৃদয়ে– আরো কোটি মানুষের মতো।

মুহাম্মদ কামরুজ্জামান (৭৫)

[ক্রীড়া সাংবাদিক। ম্যাট্রিক পাস করেছেন কলিজিয়েট স্কুল থেকে। ইন্টারমিডিয়েট জগন্নাথ কলেজ থেকে। এমএ, এলএলবি ডিগ্রি নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনি ১৯৬৭ সালে তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকায় স্পোর্টস রিপোর্টার হিসেবে প্রবেশ করেন। পরবর্তীকালে দৈনিক বাংলা হয়ে ১৯৯৭ সালে সেখান থেকে চলে আসেন। দীর্ঘ ৩০ বছর তিনি একই পত্রিকায় একই পেশায় নিয়োজিত থেকে সে পেশায় বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। এরপর তিনি কিছু সময় বাংলাভিশন টেলিভিশনে ক্রীড়া উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।]

হামিদ ভাই খেলোয়াড়ি জীবন শুরু করেন ফার্স্ট ডিভিশন ক্লাব দিয়ে। ইস্ট এন্ড ক্লাব ছিল ফার্স্ট ডিভিশনের; তিনি সে ক্লাবের গোলরক্ষক ছিলেন। সেখান থেকে ফার্স্ট ডিভিশনের আরেক ক্লাব ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব। সে ক্লাবে চলে যান। ক্লাবটি তখন খুবই নামকরা। একমাত্র মোহামেডান ক্লাবের সঙ্গে এ ক্লাবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো। হামিদ ভাই সেই ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের গোলরক্ষক ছিলেন এবং প্রশংসিত হন। তিনি ক্রিকেট, বাস্কেটবল, হকি ও ভলিবল খেলেছেন। ক্রিকেটে তিনি জগন্নাথ কলেজের ক্যাপ্টেন ছিলেন। হকিতে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ছিলেন। ভলিবল ফেডারেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। ছিলেন একজন ক্রীড়া সাংবাদিক। চাকরি করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংক ও আল-আরাকা ব্যাংকে। এসব দায়িত্ব তিনি সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। তবে তিনি খেলায় বাংলা ভাষায় ধারাবর্ণনায় বিশেষ পারদর্শী ও প্রশংসিত হয়েছিলেন। তাঁর ধারাবর্ণনা এমন সাবলীল, সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী ছিল যে, সহজেই হৃদয় ছুঁয়ে যেত। বলাবাহুল্য, বাংলা ভাষায় খেলার ধারাবর্ণনার তিনিই প্রবর্তক ছিলেন। বিশেষ করে এদেশের জন্য। আমার মনে হয়, এজন্যই তিনি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন এবং একুশে পদকে সম্মানিত হয়েছেন। খেলায় বাংলা ভাষায় ধারাভাষ্যের ওপর তিনি একটি বইও লিখেছেন 'বাংলায় ধারাবিবরণী ধারা বিবরণীতে বাংলা।' ব্যক্তিগত জীবনে আবদুল হামিদ ছিলেন মিষ্টভাষী, বন্ধুবৎসল, পরোপকারী। লোকজনকে খাওয়াতে ভালোবাসতেন। কাউকে মন্দ বলা বা কারো ক্ষতি করা তাঁর জীবন ও কর্মে কখনো দেখিনি। তিনি ছিলেন অজাতশত্রু। মৃত্যুকালে তাঁর পাশে ছিলাম। তাঁর জানাজায়ও গিয়েছিলাম। তাঁর মৃত্যুর দুই মাসের মধ্যে স্ত্রীও মারা যান।

বুলবুল আহমদ (৬৭)

[সিনিয়র ফটো সাংবাদিক। ১৯৮২-'৮৩ সালে ছবি তুলেছিলেন আবদুল হামিদের। ইত্তেফাক গ্রুপের পত্রিকা সাপ্তাহিক রোববার ও আরেক পত্রিকা দৈনিক সচিত্র স্বদেশ-এর জন্য। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন সেলিম নজরুল হক।] আবদুল হামিদ ছিলেন হাসিখুশি ও প্রাণখোলা মানুষ। অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও ছবি তোলার পর্ব শেষ হয়। আবদুল হামিদকে আমি আগে থেকেই চিনতাম ক্রীড়া সাংবাদিকের চেয়ে বেশি ধারাভাষ্যকার হিসেবে। রেডিও-টিভিতে তাঁর ধারাভাষ্য মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম– খেলার গতির সঙ্গে আমিও উত্তেজিত-উল্লসিত ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠতাম। সময়ে সময়ে ঊর্ধ্বে লাফিয়ে উঠে, ঊর্ধ্ববাহু নৃত্য করতে থাকতাম। তাঁর ধারাভাষ্য এতটাই প্রাণ ছুঁয়ে যেত যে, তাঁর ধারাভাষ্য না থাকলে সে পানসে খেলাই দেখতাম না। তাঁর জাতীয় পুরস্কার ও একুশে পদকপ্রাপ্তি আমরা লাখো বাংলাভাষী গর্বিত-আনন্দিত। খেলাধুলায় অগ্রগতি-উৎকর্ষের জন্য বিদেশি উন্নত দেশগুলোর মতো, আমাদের দেশেও মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলায় ধারাবিবরণী কী কারণে হলো, কেমন করে হলো, কত প্রতিবন্ধকতা, কত জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য করে নিষ্ঠা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে অবশেষে বাংলা ভাষায় খেলায় ধারাবিবরণী প্রথা চালু হলো; তা তাঁর লেখা বই থেকেই শোনা যাক।

বাংলায় ধারাবিবরণী
ধারাবিবরণীতে বাংলা
– আবদুল হামিদ

প্রকাশ	:	১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮
প্রকাশক	:	সাহেরা হামিদ, ১৬, রজনী চৌধুরী রোড, ঢাকা-১২০৪।
প্রচ্ছদ	:	পংকজ পাঠক
কম্পিউটার	:	প্রি-প্রেস সিস্টেম
কম্পোজ	:	৭, অভয়দাস লেন, টিকাটুলি, ঢাকা-১২০৩।
মুদ্রণে	:	কাদেরিয়া পাবলিকেশনস অ্যান্ড প্রোডাক্টস লি. ২/১, আর কে, মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩।
ফোন	:	৯৫৬৩১৬২

'সবার নিবিড় ভালোবাসা ও সুভাশীষ আমার একান্ত ইচ্ছা মায়ের ভাষা বাংলা ভাষায় খেলার চলতি বিবরণী রেডিও-টিভিতে প্রচারের সেই পঞ্জীভূত আশা আল্লাহতায়ালা পূরণ করায় আমি মহান আল্লাহতায়ালার শুকরিয়া জানাই এবং তাঁর অপার করুণা লাভের জন্য দোয়া কামনা করি।

এই লেখাটি আমার অগণিত শ্রোতাবন্ধুদের জন্য উৎসর্গ করছি'

– আবদুল হামিদ

'১৯৬২-'৬৩ সালের দিকে খেলার মাঠ থেকে সরাসরি রেডিও'তে বাংলায় খেলার চলতি বিবরণী প্রচার একথা যেন ভাবাই যেত না। খেলার মাঠে দেশি-বিদেশি দলের খেলা হতো। ইংরেজিতে চলতি বিবরণী প্রচার ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার।

দেশের এ অঞ্চলে বাংলাভাষী লোকসংখ্যা অধিক হলেও খেলার চলতি বিবরণী বাংলায় প্রচারের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়নি নানা কারণে। বাংলা ভাষায় খেলার চলতি বিবরণী প্রচার যে সম্ভবপর, এ ভাবনা তখন আদৌ কারো মনে আসেনি–আর ঠিক একই সঙ্গে এ ব্যাপারে উদ্যোগও নেওয়া হয়নি।

বাংলা ভাষাকে ব্যাপকভাবে সবার মাঝে সবার মনের গহিনে প্রবেশ করানোর প্রচেষ্টা চলছে তখন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে খেলার চলতি বিবরণী সরাসরি মাঠ থেকে প্রচারের কথা মনে দারুণভাবে আন্দোলিত করে। কিন্তু বাস্তবে কিভাবে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা যায়, এ নিয়ে রেডিও কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু করতে থাকি।

আমি খেলাধুলা করতাম জেনে, একই সঙ্গে রেডিও'তে নাটক/ফিচারে অভিনয় করতাম জেনে ও আমার খেলা সম্পর্কে বলার উৎসাহ লক্ষ্য করে রেডিও কর্তৃপক্ষ আমাকে খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রচারের আমন্ত্রণ জানান ও যা আমি সানন্দে গ্রহণ করি।

আমার ধারণা, খেলার বিশেষ জ্ঞান ছাড়া রিলে করা যায় না। আর বাচনভঙ্গিসহ শব্দ সম্ভারের প্রাচুর্য যত বেশি থাকবে এবং উপস্থিত জ্ঞানের প্রয়োগের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত যিনি ত্বরিত নিতে পারবেন তিনি একজন সুন্দর ভাষ্যকার হতে পারবেন।

অবশেষে প্রতীক্ষিত দিনটি এলো ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসের শেষের দিকের একটি দিন। ঢাকা স্টেডিয়াম থেকে বাংলায় ফুটবল খেলার সরাসরি চলতি বিবরণী প্রচারের ব্যবস্থা চূড়ান্ত হয়েছে।

খেলা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে থেকেই আমরা বাংলায় ফুটবল খেলার চলতি বিবরণী দেওয়া শুরু করলাম। আমার সঙ্গে শাহজাহান ভাই ছিলেন ঐদিন। তিনি সবসময় আমাকে প্রচুর উৎসাহ জুগিয়ে চললেন। উৎসাহ দিলেন রেডিও'র অফিসার ও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ার এবং কর্মীরা। আল্লাহতায়ালার মেহেরবাণীতে খেলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন সময়ই আমি বিচলিত হইনি। সেদিনের সেই সময়গুলো এদেশের বাংলায় খেলার চলতি বিবরণী প্রচারের পথদর্শক। অতএব সেই কথা চিন্তা করেই আমি ভেবেছিলাম এর সার্থকতার ওপরই নির্ভর করছে এদেশের বাংলায় চলতি বিবরণী প্রচারের ভবিষ্যৎ। যা হোক, যথাসময়ে খেলা শেষ হলো। অনেকেই ছুটে এসে আমাকে আলিঙ্গন করলেন। রেডিও কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট ছিলেন। তখন থেকে সব লেখার চলতি বিবরণীর জন্য দুটি চ্যানেলে দুই ভাষায় (ইংরেজি ও বাংলা) চলতি বিবরণী প্রচার করার ব্যবস্থা হলো ঢাকায়। ক্রীড়া ভাষ্যকার হিসেবে শাহজাহান ভাই ছাড়া জনাব ফরিদ আহমেদ বাংলায় চলতি বিবরণী প্রচার করতেন এবং পরে জনাব তওফিক আজিজ খান, জনাব ফজলুল করিম, জনাব ফখরুল আলম প্রমুখ এ দায়িত্বে নিজেদের সম্পৃক্ত করেন। খেলার মাঠ থেকে রিলে করা এবং সুন্দর-সাবলীল ও শ্রুতিমধুর করার জন্য আমার মনে হয় খেলা সম্পর্কে কেবলমাত্র বলাই সামগ্রিকভাবে শ্রোতাদের কাছে শ্রুতিমধুর হয় না, সেই বলার মধ্যে সুন্দর শব্দের সংযোজন, মাঠের পরিবেশ সম্পর্কে বর্ণনা এবং বলার ভঙ্গিমা–এসব কিছুর চমৎকার সমন্বয়ে ভালো ভাষ্যকার হওয়া সম্ভবপর বলে ক্রমে ক্রমে আমার ধারণা বদ্ধমূল হলো।

যাই বলি না কেন, সুন্দর করে বলা এক, নাটকের ভাষায় মডুলেশন বা স্বরের ওঠানামা যদি টিকমতো করানো যায় তাহলে চলতি বিবরণী শ্রুতিমধুর হতে পারে বলে আমার ধারণা।

চলতি বিবরণী প্রচারের সময় মাঝেমধ্যে খেলা সম্পর্কীয় হালকা আলাপ, মাঠের বর্ণনা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিচ্ছন্ন পরিস্ফুটন, প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণনা এবং খেলা অনুষ্ঠানের স্থানটির ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বর্ণনা প্রচার খেলার চলতি বিবরণী প্রচারের মানকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করতে সাহায্য করে।

একজন পাস করা ফুটবল রেফারি।

খেলোয়াড় সঠিকভাবে চেনা সম্ভব হলে এক, খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত ক্রীড়া পরিচয় জেনে নিলে সুন্দর ও সাবলীলভাবে, ধীরস্থিরচিত্তে ক্রিকেট খেলার চলতি বিবরণী প্রচার যে সহজেই করা যেতে পারে তা আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি।

১৯৬৬ সালের ফুটবল লিগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খেলার সরাসরি চলতি বিবরণী একসঙ্গে রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। টেলিভিশনের মাইক্রোফোন আমাদের সামনে রাখা হয় এবং একই সঙ্গে রেডিও এবং টেলিভিশনে খেলার রিলে শুরু করা হয়। আমি, জনাব শাহজাহান, জনাব তওফিক আজিজ খান সেইসব খেলার চলতি বিবরণী প্রচার করি।

খেলার চলতি বিবরণী সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গা থেকে রেডিও অফিসে এবং আমার কাছে ঐবছর বেশকিছু উৎসাহজনক চিঠি আসে। এ মুহূর্তে একটি চিঠি আমার হাতে, যা আমি অতিযত্নে আমার কাছে রেখে দিয়েছি। লিখেছিলেন– ২৬/জি, আজিমপুর কলোনী, ঢাকা-২ থেকে। পত্র প্রেরক জনাব আমিন, ১৯৬৭ সালের ২রা ডিসেম্বর চিঠিটি লেখেন আমার নামে। ঢাকা বেতারের আঞ্চলিক পরিচালকের কেয়ারে। চিঠিটার অংশবিশেষে তিনি লিখেছিলেন–'আর সিডি ফুটবল টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত দিনের খেলার ধারাবিবরণী শুনছিলাম। খেলার বর্ণনা শুনে যতটা না ভালো লাগলো তার থেকে ভালো লাগলো আপনার ধারাবিবরণী দেওয়ার রীতি শুনে। সুললিত কণ্ঠের প্রাঞ্জল ভাষায় খেলার চলতি বর্ণনা দেওয়ার ফাঁকে-ফাঁকে খেলোয়াড়দের নিয়ে মূল্যবান মন্তব্যের ছিটেফোঁটা, আর সেই সাথে প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে মাঠের পরিবেশের ছবি শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরা আমাকে সত্যিই মুগ্ধ করেছে। কলিকাতার সঞ্জয়কে কেন, আমরা আপনাকে নিয়ে গর্ব করতে পারি।'

১৯ ডিসেম্বর ১৯৭০ সাল। ব্যাংককে এশিয়ান গেমসের ফাইনাল হকি খেলায় পাকিস্তান এবং ভারত দল মোকাবিলা করে। ফাইনাল হকি খেলার উর্দুতে রিলে করার জন্য ফারুক মাজহার এবং এসএম বাকী ব্যাংককে অবস্থান করছিলেন। সেদিন সকালে আমি যে হোটেলে ছিলাম সেখানে পাকিস্তান বাস্কেট বল দলের অন্যতম প্রতিনিধি জনাব শামসুল আলম এবং পাকিস্তানি

দূতাবাসের কয়েকজন কর্মকর্তা আমাকে প্রস্তাব দিলেন বাংলায় ফাইনাল হকি খেলার চলতি বিবরণী সরাসরি প্রচার করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে কিনা? আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এ প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে আমি গ্রহণ করি।

আমরা পর্যায়ক্রমে খেলার চলতি বিবরণী প্রচার শুরু করলাম। সে এক স্মরণীয় মুহূর্ত। বিদেশের মাটি থেকে বাংলায় কোনো খেলার সরাসরি চলতি বিবরণী প্রচার বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান– উপমহাদেশে সেই প্রথম।

খেলা শেষ হলে উর্দু ভাষ্যকারদ্বয়সহ মাঠে উপস্থিত সবাই দৌড়ে এসে আমাকে কাঁধে তুলে লাফাতে থাকেন। আনন্দের আতিশয্যে তখন তারা উদ্বেলিত। পাকিস্তানি খেলোয়াড়রা যখন সেজদায় রয়েছেন আমি তখন রাব্বুল আল-আমীনের দরগাহতে অজ্ঞাতে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। সেই দিনের বৈকালের ঐ খেলা রাত্রে ফ্ল্যাড লাইটে শেষ হয়েছিল। দেশে সবাই সেই কমেন্ট্রির প্রশংসা করতে থাকেন। রেডিও'র প্রাক্তন আঞ্চলিক পরিচালক বিশিষ্ট সংস্কৃতিসেবী শামসুল হুদা চৌধুরী সাহেব আমার চলতি বিবরণী প্রচারে সন্তুষ্ট হয়ে এক খ্যাতনামা রেস্তোরাঁতে এক চা-চক্রের আয়োজন করেন। সেদিনের ব্যাংকক থেকে চলতি বিবরণী প্রচারের কথা রেডিও'র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ অনেকেই বলেছিলেন।

খেলা, খেলার মানোন্নয়ন, খেলাধুলা সম্পর্কিত লেখার মাধ্যমে খেলাকে প্রচার মাধ্যমগুলোতে যথাযথভাবে স্থান করে নেয়ার ব্যাপারে ক্রীড়া সাংবাদিক ও ক্রীড়া লেখকদের এক বিশেষ ভূমিকা থাকতে পারে, বিবেচনা করে বিভিন্ন পত্রিকার ক্রীড়া সাংবাদিক ও ক্রীড়া লেখকদের নিয়ে সেসময় বাংলাদেশে ক্রীড়া লেখক সমিতি প্রতিষ্ঠার চিন্তা করা হয়।

জাতীয় প্রেস ক্লাবে ১৯৭২ সালের ৪ আগস্ট ক্রীড়া লেখক ও ক্রীড়া সাংবাদিকরা এক আলোচনাচক্রে মিলিত হয়ে দেশের খেলাধুলার সার্বিক উন্নতিতে সর্বতোভাবে সহায়তা করার কথা চিন্তা করে বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতি গঠন করা হয়।

আমাকে সভাপতি এবং দৈনিক বাংলার জনাব কামরুজ্জামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্যের অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়।

১৯৯৮'র শেষান্তে রেডিও-টিভির ধারাভাষ্য প্রদানের ব্যাপারে আমার সম্পৃক্ততাকে সক্রিয় রাখতে পেরেছি ভেবে আল্লাহতায়ালার দরবারে শুকরিয়া জানাচ্ছি। এর মধ্যে দৈনিক ইনকিলাবের স্পোর্টস বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার কারণে খেলাধুলার চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে ওয়াশিংটন থেকে প্রচারিত ভয়েস অব আমেরিকার ক্রীড়া জগৎ অনুষ্ঠানে নিয়মিত দেশের খেলাধুলার ওপর মন্তব্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে তাদের আমন্ত্রণ আমাকে উৎসাহিত করেছে। বিশেষ করে ১৯৯৪ সালে কানাডার ভিক্টোরিয়া থেকে কমনওয়েলথ গেমসে বাংলাদেশ দলের জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে আমার ভাষ্য নিয়মিত প্রচারের ক্ষেত্রে ভিওএ'র উৎসাহের কথা স্মরণ করতে হয়। ধারাভাষ্য এখন একটি অন্যতম শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করায়ই মনে হয়, এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভাবতে ভালো লাগে, বাংলাদেশে ক্রীড়া ধারাভাষ্য প্রদানের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও ফুটবল অঙ্গন থেকে সরাসরি বাংলায় এখন ধারাভাষ্য প্রচারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এটি শুভ উদ্যোগ।

দেখতে দেখতে ৩৬টি বছর অতিক্রান্ত হতে চলল– এদেশে এখন রেডিও-টিভিতে খেলার চলতি বিবরণী মায়ের ভাষা বাংলায় নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে। সকলে তা শুনছেন, উপভোগ করছেন– এ আনন্দ অপরিসীম। এ কথা ভাবতে সত্যিই ভালো লাগ–অনেক ভালো লাগে।'

পরিচিতি

আবদুল হামিদ

জন্মস্থান	:	নবদ্বীপ, নদীয়া
জন্মতারিখ	:	২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫ খ্রি.
পিতা	:	মরহুম আবদুর রব
মাতা	:	মরহুম মোসাম্মত বেলেজান বিবি
স্ত্রী	:	সাহেরা হামিদ
পুত্র	:	আবদুল কাইয়ুম
কন্যা	:	নাসিমা শাহরীন
জামাতা	:	মহিবুর রব
ভাইবোন	:	৫ ভাই, ৪ ভগ্নি

* ঢাকার প্রথম বিভাগ ফুটবল (ইস্ট এন্ড, ইস্পাহানী, ওয়ান্ডারার্স, আজাদ স্পোর্টিং), ক্রিকেট (জগন্নাথ কলেজ দল) ও ভলিবল (ইস্ট এন্ড ক্লাব)-এর প্রাক্তন খেলোয়াড়।

* পূর্ব পাকিস্তান ফুটবল (১৯৫৭) ও ভলিবল (১৯৫৫-'৫৭) দলে প্রতিনিধিত্ব
* ১৯৫৫ সালে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের পক্ষে কলকাতার আইএফএ শীল্ডে অংশগ্রহণ
* সোনালী অতীত ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
* ক্রীড়াক্ষেত্রে অবদানের জন্য জাতীয় পুরস্কার লাভ (১৯৭৯)
* কাজী মাহবুল্লাহ ও বেগম জেবুন্নেসা স্বর্ণপদক লাভ (১৯৮৫)
* বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক প্রকাশিত বেতার বাংলার বেতার ব্যক্তিত্ব সম্মান লাভ (জানুয়ারি, ১৯৭৮)
* মাসিক মোহামেডান-এর ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের সম্মান লাভ (১৯৯৫)
* পাকিস্তান ভলিবল ফেডারেশনের প্রাক্তন যুগ্ম-সম্পাদক
* বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক
* এশিয়ান ভলিবল কনফেডারেশনের দুই দফায় নির্বাচিত ডিরেক্টর
* বাংলাদেশ অলিম্পিক সমিতির প্রাক্তন সদস্য
* বাংলাদেশ ফুটবল রেফারি সমিতির আজীবন সদস্য
* কোয়ালিফায়েড ফুটবল ও ভলিবল রেফারি
* বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও আজীবন সদস্য
* প্রথম বাংলায় ধারাভাষ্য প্রদান
* বাংলাদেশ জনসংযোগ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
* বিদেশের মাটিতে প্রথম বাংলায় ধারাভাষ্য প্রদান (ব্যাংকক, ১৯৭০-এশিয়ান গেমস হকি ফাইনাল, পাকিস্তান-ভারত)
* রেডিও পাকিস্তান ও বাংলাদেশ বেতারে খবর পাঠসহ বেতার ও টিভির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ
* দৈনিক আজাদের প্রাক্তন ক্রীড়া সম্পাদক ও দৈনিক ইনকিলাবের ক্রীড়া সম্পাদক
* ক্রীড়া জগত পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য
* স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে প্রথম ক্রীড়া ম্যাগাজিন 'মাসিক খেলাধুলা' প্রকাশ
* বাংলাদেশ ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগের প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর
* আল-বারাকা ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগের প্রধান
* খেলাধুলা সংক্রান্ত সেমিনার ও ক্রীড়া দলের কর্মকর্তা ও ক্রীড়াবিদ হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান সফর।

আমার সঙ্গে পরিচয়

আমার সঙ্গে আবদুল হামিদের পরিচয় এখন থেকে ৫৩ বছর আগে, অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে। আমি তখন সবেমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রির পরীক্ষা শেষ করে বেরিয়েছি। রেজাল্ট হয়নি তখনো; কিন্তু কাজে যোগ দিয়েছি। পাকিস্তান অবজারভার গ্রুপের আগে একটি পত্রিকা সাপ্তাহিক পূর্বদেশ-এর স্পোর্টস রিপোর্টার পদে। ঢাকা স্টেডিয়ামে পশ্চিম দিকের জার্নালিস্ট বক্সে হামিদের সাথে পরিচয়। হামিদ তখন দৈনিক আজাদের স্পোর্টস রিপোর্টার। মর্নিং নিউজ-এর ডেভিটসন, পাকিস্তান অবজারভারের হাসান, ইত্তেফাকের বদিউজ্জামান, দৈনিক পাকিস্তানের মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, আমি ও আবদুল হামিদ বক্সে বসে খেলা কাভার করতাম। ওর একটা হোন্ডা ছিল, সেটায় পেছনে বসে আমরা ঢাকা শহরে বিভিন্ন কাজে-অকাজে ঘোরাফেরা করতাম। ওর বাসা ছিল গেন্ডারিয়ায়। আমার শুক্রাবাদে। আমরা মিলতাম স্টেডিয়ামে। মেয়েকে ভালো বিয়ে দেওয়ার জন্য ধানমন্ডির একটি ভালো অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেয়। 'বুঝলি মাহফুজ, গেন্ডারিয়ার বাসাটা দারিদ্র্যের প্রতীক। ওটা দেখে মেয়ের ভালো সম্বন্ধ আসবে না, তাই ভালো একটি দামি বাসাভাড়া নিলাম। মেয়ের ভালো বিয়ে হয়। এরপর অবশ্য, গুলশানের নিকুঞ্জে বাসা নেয়। ওর বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করা আমি জানতাম। আমাকে জানাত। হুট করে আমার কাছে এসে, আমাকে নিয়ে শান্ত-নীরব কোনো পরিবেশে বসে মনখুলে কথা বলত। হাসত-কাঁদত, আনন্দ-বেদনা প্রকাশ করত– অনেককিছু ঢেকেও রাখত। অনেক অনেক স্মৃতি; অম্ল-মধুর স্মৃতি। কোনটা রেখে কোনটা বলব– আসলে কিছুই বলা হচ্ছে না। শুধু একটা কথাই বলতে পারছি– এই সৃজনশীল মানুষটির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এটা মনে হতেই গর্বে বুকটা ভরে যায়।

লেখক: সাংবাদিক, গবেষক

বেতারে ক্রীড়া ধারাবর্ণনা
অতীত ও বর্তমান

মো. সামসুল ইসলাম

> কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল গঠিত হয়েছিল এবং তারা ভারতে একাধিক ম্যাচ খেলে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করে এবং মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে থাকে

এক বলে এক রান। ১৯৯৭ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের কিলাত ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত আইসিসি ট্রফি ক্রিকেটের ফাইনালে মুখোমুখি বাংলাদেশ ও কেনিয়া। কে জিতবে চ্যাম্পিয়নশিপ? শ্বাসরুদ্ধকর মুহূর্ত! টান টান উত্তেজনা– পুরো দেশবাসী বাধ্য হয়েই বেতারে কান পেতেছেন। কারণ সেদিন টেলিভিশনে ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয়নি। ধারাভাষ্যকার ম্যাচের অন্তিমলগ্নের বর্ণনা দিয়ে চলেছেন। বলছেন, শান্ত স্ট্রাইকে, বোলার টনি সুজি আসছেন, বল করলেন, দুই ব্যাটসম্যান প্রান্ত বদল করলেন এবং বাংলাদেশ ষষ্ঠ আইসিসি ট্রফির শিরোপা জিতে নিল।' সেই থেকেই বাংলাদেশে ক্রিকেটের উত্থান। আবার সত্তর ও আশির দশকের জনপ্রিয় ফুটবল, আবাহনী-মোহামেডানের ডার্বি। দেশব্যাপী বেতারে সরাসরি ধারাবিবরণী সম্প্রচার করা হচ্ছে। যারা মাঠে

যেতে পারেননি কিংবা মাঠে গিয়েও স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতে পারেননি, তাদের ভরসা ছিল বেতারের ধারাবিবরণী। এভাবেই বেতার এবং বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

নাজিম উদ্দিন রোডে ধ্বনী বিস্তার কেন্দ্র নামে ঢাকায় বেতার তার প্রথম সম্প্রচার শুরু করে ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর। ২০১৪ সালে এদেশে বেতারের ৭৫ বছর পূর্তি (হীরকজয়ন্তি) উদযাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশে বাংলা ক্রীড়া ধারাবর্ণনার পথিকৃৎ হিসেবে ধরা হয় প্রয়াত আবদুল হামিদকে। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়, অনেক সংগ্রাম করে তৎকালীন পাকিস্তান আমলে বেতারে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় ক্রীড়া ধারাবর্ণনা শুরু হয়েছিল। বাংলায় ক্রীড়া ধারাবর্ণনা হতে পারে, বিষয়টি তৎকালীন পাকিস্তান আমলে বেতার কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে অনেক কাঠখড় পেড়াতে হয়েছিল। শুরুর দিকে বিরতীর সময় বাংলায় পাঁচ মিনিটের রিজিউমি করার সুযোগ পেতেন বাঙালিরা। অনেক দেনদরবার আর অব্যাহত অনুরোধের পর ১৯৬৩ সালের আগস্টের শেষ সপ্তাহে ঢাকা ফুটবল লীগের একটি ম্যাচে প্রথমবার বেতারে বাংলায় ক্রীড়া ধারাবর্ণনা শুরু হয়। ওই ম্যাচে ধারাবিবরণী করেছিলেন আবদুল হামিদ এবং মো. শাহজাহান। তখন থেকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সব খেলার চলতি ধারাবিবরণী দুটি পৃথক চ্যানেলে ইংরেজি ও বাংলায় প্রচার করা হতো। স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে তখন ধারাভাষ্যকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন তওফিক আজিজ খান, ফজলুল করিম, ফকরুল আলম, ফরিদ আহমেদ, বদরুল হুদা চৌধুরী, নূর আহমেদ, শফিকুর রহমান প্রমুখ।

১৯৬৫ সালের ১৭-১৯ ডিসেম্বর ঢাকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত মেজর ভাট্রি একাদশ বনাম স্কোয়াড্রন লিডার আলম একাদশের তিন দিনের প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচ দিয়ে ক্রিকেটের সরাসরি সম্প্রচার শুরু হয়। ১৯৬৭ সালে ঢাকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত মালয়েশিয়া ও পূর্ব পাকিস্তান হকি দলের প্রদর্শনী ম্যাচটি ছিল বেতারে হকির প্রথম সরাসরি সম্প্রচার। এরপর থেকে নিয়মিত ঢাকা তথা পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট, ফুটবল এবং হকির গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলোর বাংলা ধারাবিবরণী বেতারে সরাসরি সম্প্রচারিত হতে থাকল। ১৯৭০ সালের ১৯ ডিসেম্বর, থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমস হকির ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত এবং পাকিস্তান। বেতার কর্তৃপক্ষ উর্দুতে ধারাবিবরণী প্রচারের সব ব্যবস্থাই করেছিল। হঠাৎ কর্তৃপক্ষের মনে হলো– গুরুত্বপূর্ণ এ ম্যাচটি বাংলায়ও সরাসরি ধারাবিবরণী প্রচার করা প্রয়োজন। আবদুল হামিদ সেবার এশিয়ান গেমসে পাকিস্তান দলের কর্মকর্তা হিসেবে তখন ব্যাংককেই অবস্থান করছিলেন। তড়িঘড়ি করে সব আয়োজন করা হলো এবং বাংলায় সেই ম্যাচের সরাসরি ধারাবিবরণী সম্প্রচার করা হলো। সেটাই ছিল বিদেশের মাঠ থেকে বেতারের প্রথম বাংলা ধারাবিবরণী সম্প্রচারের উদাহরণ, যা পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট সব মহলে প্রশংসিত হয়েছিল।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অবদানের কথা আমরা সবাই জানি। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র অবশ্য খেলাধুলা নিয়ে তেমন কাজ করার সুযোগ পায়নি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল গঠিত হয়েছিল এবং তারা ভারতে একাধিক ম্যাচ খেলে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করে এবং মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে থাকে। তৎকালীন স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রে এসব খবর খুব গুরুত্ব সহকারে প্রচার করা হতো, যা স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলকে অনুপ্রাণিত করত।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বেতার পুনরায় তার পথচলা শুরু করলে অন্যান্য অনুষ্ঠানের পাশাপাশি খেলার চলতি ধারাবিবরণী যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে সম্প্রচারিত হতে থাকে। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা স্টেডিয়ামে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ও অবশিষ্ট একাদশের প্রদর্শনী ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে পুনরায় বাংলাদেশ বেতারে খেলার সম্প্রচার শুরু হয়েছিল। ১৯৭২ সালে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত এম সি সি এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের তিন দিনের ম্যাচটিই ছিল স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ বেতারের প্রথম ক্রিকেট খেলার সরাসরি সম্প্রচার। তখন বেতারই ছিল অন্যতম জনপ্রিয় গণমাধ্যম। তখনকার দিনে বেতারের ক্রীড়া ধারাবর্ণনা শুনে অনেক তরুণ ফুটবল খেলোয়াড় হওয়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সেসময় বেশকজন প্রতিভাবান ক্রীড়া ভাষ্যকার যুক্ত হন বেতারের সঙ্গে। তাদের অন্যতম হলেন– খোদা বক্স মৃধা, হান্নান খান, জাফর ইমাম, মনজুর হাসান মিন্টু, নিখিল রঞ্জন দাশ, আতাউল হক মল্লিক, শামিম আশরাফ চৌধুরী, মাহমুদুর রহমান, মোহাম্মদ মুসা, আলফাজ উদ্দিন আহমেদ, এ আর কুদ্দুস আলমগীর, মহিউদ্দিন আহমেদ, এস কে মাহবুব প্রমুখ। নব্বইয়ের দশকে এবং তৎপরবর্তী সময়ে বেতারের ক্রীড়া ধারাবর্ণনায় আরো কিছু নতুন মুখ পাওয়া যায়। তারা হলেন– চৌধুরী জাফরউল্লাহ শারাফাত, মারুফ আহমেদ সুকর্ণ এবং ড. সাঈদুর রহমান। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বেতারের ক্রীড়া ধারাবর্ণনায় যুক্ত হয় আরো কিছু নতুন নাম। তাঁরা হলেন– আনোয়ার হোসেন, মাসুদ করিম, সামসুল ইসলাম, কাজল সরকার, পলাশ খান, জাহিদুল ইসলাম বোরহান, কুমার কল্যাণ প্রমুখ। গত ১০ বছরে আরো কিছু নতুন মুখ বেতারের ক্রীড়া ধারাবর্ণনাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁরা হলেন– জামিলুর রহমান, মাহমুদুল আহসান মুরাদ, মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, রেজোয়ান ফেরদৌস, মিজানুর রহমান, এস এম আবদুস শাকুর, ফারুক হোসেন, আনোয়ার হোসেন কবির, শম্ভু মৈত্র, মির্জা ফরিদুল ইসলাম, ওয়ালিউল্লাহ প্রমুখ।

এরই মধ্যে গত কয়েক বছরে বেশকজন জনপ্রিয় ও গুণী ক্রীড়া ভাষ্যকার আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁরা হলেন– খোদা বক্স মৃধা, আবদুল হামিদ, জাফর ইমাম, মনজুর হাসান মিন্টু, আতাউল হক মল্লিক, বদরুল হুদা চৌধুরী, মোহাম্মদ মুসা, নূর আহমেদ, এস কে মাহবুব প্রমুখ।

নিশ্চিতভাবেই তাঁরা আর আমাদের মাঝে ফিরবেন না, কিন্তু তাঁদের সরব উপস্থিতি আমরা সবসময়ই টের পাই এবং পেতেই থাকব। ইথারে ভেসে আসা সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর– শ্রোতা ভাই-বোনেরা আসসালামুআলাইকুম, ঢাকার বঙ্গবন্ধু স্টেডেয়িাম থেকে আবদুল হামিদ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজও সেই সুমধুর শব্দগুচ্ছ আমাদের অনুরণতি করে। অধুনা তাঁর মতো করে অনেক তরুণ ক্রীড়া ভাষ্যকারও দর্শক-শ্রোতাদের বিভিন্ন মাঠ থেকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং জানাবে, এটা একটি চলমান প্রক্রিয়া প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এভাবেই চলে আসছে। বাংলাদেশে বাংলা ক্রীড়া ধারাবর্ণনা যেটা হামদি শুরু করে দিয়েছিলেন, সেটা আজো স্বরবে চলছে এবং তা চলবে অনন্তকাল।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলছে বেতার, ক্রীড়া ধারাবর্ণনা নিঃসন্দেহে বেতারের অন্যতম জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলোর একটি তা বলাই বাহুল্য। মনে পড়ে, ১৯৯৪ সালে কেনিয়ায় অনুষ্ঠিত আইসিসি ট্রফি, ১৯৯৭ সালে নেপালে অনুষ্ঠিত সাফ ফুটবল, ১৯৯৭ সালে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত আইসিসি ট্রফি, ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট বিশ্বকাপ, ২০০১ সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের শ্রীলংকা সফর, ২০০২ সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পাকিস্তান সফর, ২০০৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ক্রিকেট বিশ্বকাপ, ২০০৪ সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নিউজিল্যান্ড সফর, ২০১১ সালে উপমহাদেশে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট বিশ্বকাপের ভারত ও শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত ম্যাচগুলো, একাধিকবার বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জিম্বাবুয়ে সফর, ২০১২ সালে শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপ, ২০১৫ সালে অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট বিশ্বকাপ, ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পাকিস্তান সফর, ভারতে অনুষ্ঠিত ২০১৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ম্যাচগুলো বিদেশের মাঠ থেকে সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে বেতার তার অগণিত শ্রোতার ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। অধুনা বেসরকারি এফএম রেডিওগুলোর মতো স্টুডিওতে বসেই চলছে বাংলাদেশ বেতারের জনপ্রিয় ধারাভাষ্য অনুষ্ঠান। আজকাল তারাও আর সরাসরি মাঠে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করছেন না, এতে বঞ্চিত হচ্ছেন বেতারের কোটি শ্রোতা এবং তারা আর মাঠের সেই লাইভ ফিলটাই পাচ্ছেন না।

বিশ্বব্যাপী দেখা যায়, বেতারেই প্রথম সরাসরি খেলা সম্প্রচারের মাধ্যমে খেলাধুলার উন্নয়ন এবং এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। বেতার আজও সগর্বে টিকে আছে তার সহজলভ্যতা, সাশ্রয়ী, বহনযোগ্যতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের জন্য। অধুনা মোবাইল ফোনেই মানুষ এফ এম রেডিও শুনতে পারে। হালের এফ এম রেডিও খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করছে এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ বেতারের পাশাপাশি ২০১৩ সাল থেকে ক্রীড়া ধারাভাষ্য সম্প্রচারে যুক্ত হয় বেশকিছু বেসরকারি এফ এম রেডিও, তাদের অন্যতম হলো– রেডিও ভূমি (৯২.৮), জাগো এফএম (৯৪.৪) এবং রেডিও স্বাধীন (৯২.৪)। কাজের ফাঁকে, রাস্তায় চলাচলের সময় খুব সহজেই বাংলাদেশ বেতারে এবং অন্যান্য প্রাইভেট এফ এম রেডিওতে খেলার ধারাবিবরণী শুনে খেলা সম্পর্কে আপটুডেট তথ্য জেনে নিতে পারে মানুষ। তাই বেতার ছিল, আছে এবং থাকবেও অনন্তকাল।

অলিম্পিক গেমসের আদ্যোপান্ত

রুহী শামসাদ আরা

গ্রিসের অলিফিয়স আর ক্লাডেওস নদীর তীরে জলপাই বন, পামগাছের সারি আর আঙুরগাছে ঘেরা উর্বর সমতল জায়গাটির নাম অলিম্পিয়া। এ অলিম্পিয়ায় প্রাচীন গ্রিসের দেবতাদের দেবতা জিউসের সম্মানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বসত

বিষয়টি অত্যন্ত কল্পনাতীত হলেও বাস্তব যে, প্রাচীন গ্রিসে যিশু খ্রিস্টের জন্মের ৭৭৬ বছর আগে ১১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রতি চার বছর অন্তর বসতো অলিম্পিক গেমস। গ্রিসের অলিফিয়স আর ক্লাডেওস নদীর তীরে জলপাই বন, পামগাছের সারি আর আঙুরগাছে ঘেরা উর্বর সমতল জায়গাটির নাম অলিম্পিয়া। এ অলিম্পিয়ায় প্রাচীন গ্রিসের দেবতাদের দেবতা জিউসের সম্মানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বসত। মানুষের ঢল নামত। নদীপথে আগমন ঘটত তাদের। সেই সময় গ্রিসে ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা ও গৃহযুদ্ধ। তাই খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে এলিসের রাজা ইফিটস দৈববাণী শুনে গ্রিসের অঙ্গরাজ্য ও উপনিবেশগুলোর মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু করেন। চার বছর পর পর প্রাচীন গ্রিসের অলিম্পিয়ায় অলিম্পিক আসর বসত। খেলোয়াড়দের জন্য শর্ত ছিল ১০ মাস ট্রেনিং নিতে হবে, প্রত্যেকবার

খাবারের পর টাটকা পনির ও আধা ঘণ্টা পর পানি পান করতে হবে। খেলার জন্য কোনো স্টেডিয়ামের অস্তিত্ব ছিল না। বালি দিয়ে খেলা শুরুর জায়গা চিহ্নিত করে দেবতা জিউসের মূর্তির কাছে সমাপ্ত হতো। প্রাচীন গ্রিস অলিম্পিকে শুরুতে ছিল শুধুই স্বল্প পাল্লার দৌড়। ক্রমান্বয়ে দ্বিগুণ দৈর্ঘ্যের দৌড়, দূরপাল্লার দৌড়, ডিসকাস, জ্যাভেলিন, লং জাম্প, কুস্তি, বক্সিং, ঘোড়দৌড়, বর্ম পরে দৌড়, রথদৌড় প্রভৃতি প্রতিযোগিতা অন্তর্ভুক্ত হয়। কথিত আছে, জিউস পাপীদের শত্রু ছিল। তাই খেলোয়াড়দের খেলার আগে শপথ নিতে হতো তাঁরা কেউ পাপ করবে না। তাঁরা আইন লঙ্ঘন করলে জনসম্মুখে বেত্রাঘাত বা অর্থদণ্ড দেওয়া হতো।

অলিম্পিকে মেয়ে

সেকালে অলিম্পিকে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। কোনো মেয়েকে গেমসে দেখা গেলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। তবে ঘোড়ার মালিক হিসেবে পরোক্ষভাবে মহিলারা রথদৌড়ে অংশ নিতেন। খ্রিস্টাব্দের শুরুতে মেয়েদের একাধিক ইভেন্ট চালু হয়। তবে মেয়েদের খেলায় অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে প্লেটো বলেছেন, মেয়েরা যেন ১৩ বছরের পর মানানসই পোশাক পরে।

প্রাচীন অলিম্পিক গেমসের প্রস্তুতি

সেকালে অলিম্পিক গেমস ছিল পাঁচ দিনের। কিন্তু খেলোয়াড়দের প্রস্তুতি চলত এক বছর ধরে। ১০ জনের একটি সংগঠন বা আম্পায়ার দল থাকত, যারা ১০ মাস আগে নিয়োগ পেতেন। অলিম্পিয়া থেকে ৫৮ কিলোমিটার দূরে এলিসে উঠত সব খেলোয়াড়। সেখানেই চলত অনুশীলন। গেমসের দুদিন আগে তারা রওনা করতেন অলিম্পিয়ায়। প্রতিযোগিতায় নামার আগে খেলোয়াড়রা সারা গায়ে তেল মাখতেন। তখন নগ্ন দেহে খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন।

পুরস্কার

সেকালে জলপাই পাতার তৈরি মুকুটকে দামি পুরস্কার বিবেচনা করা হতো এবং প্রতিযোগিতার পরপরই বিজয়ীকে তা পরানো হতো। বিজয়ীদের নিয়ে গান, নৃত্য, মদ্যপান, ভোজন– সব আয়োজনই চলত। সারা রাত অনুষ্ঠান শেষে পরদিন সকালে বিজয়ীরা নিজ নিজ দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনায় বসতেন। বিজয়ীর জন্য নিজের শহরের নাগরিকরা চাঁদা তুলে মূর্তি বানাতেন এবং একটা অর্থ তাকে দিতেন। বিজয়ী খেলোয়াড়দের সম্মানে ধাতব মুদ্রায় তাদের নাম ও মুখচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা হতো।

প্রাচীন অলিম্পিক গেমসের ইতি

কবে শেষ অলিম্পিকটি হয়েছিল, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে ৩৯৩ খ্রিস্টাব্দের পর নাকি অলিম্পিক খেলা হয়নি। রোমান সম্রাট থিওডোসিয়াসস-১ ও থিওডোসিয়াসস-২ এর আমলে জিউসের মন্দিরটি পুড়িয়ে ফেলা হয়, ধ্বংস করা হয় মূর্তিগুলো। এ সময় অলিম্পিয়ার মূল্যবান সবকিছু লুট হয়। পাশাপাশি ভূমিক্ষয়, বন্যা, ধস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে চাপা পড়ে প্রাচীন গ্রিসের অলিম্পিক। চাপা পড়ে যায় প্রাচীন গ্রিসের অলিম্পিক গেমসের প্রচলন।

আধুনিক অলিম্পিক গেমস শুরু

ইংল্যান্ডের একদল প্রাচীন তথ্য বিশেষজ্ঞ ১৭৬৬ সালে অলিম্পিয়ায় খনন কাজ শুরু করেন। ১৮২৯ সালে যায় একদল ফরাসি ভূতাত্ত্বিক। ১৮৫৭ সালে জার্মান সরকারের অর্থায়নে একটি দল খনন শুরু করে। ক্রমশ উন্মোচিত হয় অলিম্পিক গেমসের ইতিহাস। এ ইতিহাসে উজ্জীবিত হন ফরাসি শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক পিয়েরে দা কুবার্তো। তিনি ১৮৯৬ সালে এথেন্সে আধুনিক অলিম্পিক গেমস শুরু করেন। বিশ্বের নানা দেশের ক্রীড়া সংস্থাগুলো বিভিন্ন খেলার আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়তে উদ্যোগী হলে কুবার্তো ১২টি দেশের ৭২ জন প্রতিনিধি নিয়ে ১৮৯৪ সালের জুনে International Olympic Committee (IOC) গঠন করেন। মূল কমিটিতে ১৩টি দেশের ১৫ জন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত হন। সিদ্ধান্ত হয় প্রাচীন অলিম্পিকের আদলে আধুনিক অলিম্পিক হবে, চার বছর পর পর অনুষ্ঠিত হবে এবং সব দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। ১৮৯৬ সালের ৬ এপ্রিল এক সুন্দর সকালে রাজধানী এথেন্সে ১৫০২ বছর বিরতির পর অলিম্পিক আধুনিক আদলে যাত্রা শুরু করে এবং ১৫ এপ্রিলে তা শেষ হয়। প্রথম আধুনিক অলিম্পিকে ৩৪টি দেশের সমর্থন থাকলেও অর্থাভাবে সব দেশ প্রতিনিধি পাঠাতে পারেনি। ১৩টি দেশের ৩১১ জন প্রতিযোগী অংশ নেন, যার দুই-তৃতীয়াংশ ছিলেন গ্রিসের খেলোয়াড়।

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ডের ২৭ বছরের ছাত্র ব্রেনডান কনোলি আধুনিক অলিম্পিকের প্রথম চ্যাম্পিয়ন। সেখানে ইভেন্ট ছিল ১২টি। যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়াবিদরা ৯টি ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হন। প্রতিযোগিতায় সাইক্লিংয়ে ফ্রান্স, টেনিসে গ্রেট ব্রিটেন, শুটিংয়ে গ্রিক, ভারোত্তোলনে গ্রেট ব্রিটেন, কুস্তিতে গ্রিস, জিমন্যাস্টিক্সে জার্মানি, সাঁতারে হাঙ্গেরি বিজয়ী হয়। সর্বশেষ ইভেন্ট ছিল ম্যারাথন দৌড়। এ দৌড়ে গ্রিসের লুইস জয়ী হন।

প্রথম আধুনিক আলিম্পিকে ছিল না কোনো মহিলা ক্রীড়াবিদের উপস্থিতি। আর্থিক দীনতার ভেতর দিয়ে সমাপ্তি ঘটে প্রথম আধুনিক অলিম্পিকের।

২য় অলিম্পিক আসর বসে ১৯০০ সালের ২০ মে প্যারিসে। ২০ মে থেকে ২৮ অক্টোবর এ আসর চলে। এবার ২৩টি দেশ অংশগ্রহণ করে। এশিয়ায় প্রথম অংশগ্রহণকারী দেশ ভারত। সাংগঠনিক দুর্বলতা ও নানা বিতর্কের মাঝে চলে ২য় আধুনিক অলিম্পিক।

১৯০৪ সালের ১ জুলাই থেকে ২৩ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট লুইসে বসে তৃতীয় অলিম্পিক। যাতায়াতের অত্যধিক ব্যয়ের জন্য অনেক দেশই অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। ১৩টি দেশের ৬১৭ জন খেলোয়াড়ের মাঝে ৫৩৩ জনই ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের। এ অলিম্পিকের আকর্ষণীয় ইভেন্ট ছিল ৪০ কিলোমিটার দৌড়।

১৯০৮ সালের ২৭ এপ্রিল থেকে ৩১ অক্টোবর লন্ডনে বসে চতুর্থ অলিম্পিক। এবার সর্বাধিক ৭১০ জন খেলোয়াড় অংশ নেন। ইভেন্টও ছিল অতীতের চেয়ে বেশি। মোট ২৪টি। এ খেলায় মেয়েরা টেনিস, তির নিক্ষেপ ও ফিগার স্কোটিংয়ে অংশ নেন।

সুইডেনের স্টক হোমে ১৯১২ সালের মে থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পঞ্চম অলিম্পিকটি ছিল এ যাবৎকালের সেরা। ২৮ দেশ থেকে ২ হাজার ৫৪৭ জন খেলোয়াড় এ অলিম্পিকে অংশ নেন। রাজা গুস্তাফ (পঞ্চম) এবং তার ছেলেদের চেষ্টায় চমৎকার একটি আসর বসে। যা কি না খেলার ইতিহাসে প্রথমবার নিউইয়র্কের পত্রিকাগুলোর প্রথম পৃষ্ঠায় বড়ো খবর হয়। এ অলিম্পিক উপলক্ষ্যে সুইডিশ অলিম্পিক কমিটি দ্বিতল স্টেডিয়াম বানায়। বৈদ্যুতিক ঘড়ির প্রবর্তন হয়। খেলা দেখতে প্রতিদিন গড়ে ৩০ হাজার দর্শক হাজির হতেন।

কালের পরিক্রমায় দেখা যায়, প্রাচীন গ্রিসে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে সৃষ্টি হয়েছিল অলিম্পিক গেমস। অথচ ১৯১৬ সালের বার্লিন অলিম্পিক স্থগিত হয়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কবলে পড়ে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দেশে দেশে হাজার হাজার নরনারীর মৃত্যু হলো, ধ্বংস হলো অসংখ্য ক্রীড়াঙ্গন। সভ্যতার সংকটে পিছিয়ে গেল উন্নয়ন। যুদ্ধস্নাত বেলজিয়ামকে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (IOC) সপ্তম অলিম্পিকের দায়িত্ব দিল।

২৯ দেশের ৬৪ জন মহিলা খেলোয়াড়সহ ২ হাজার ৬০৭ জনকে নিয়ে ১৯২০ সালের ২০ এপ্রিল থেকে ১২ সেপ্টেম্বর বেলজিয়ামের এন্টওয়ার্পে এ আসর বসে। তবে রাজনৈতিক কারণে রাশিয়া, জার্মানি ও তার দোসররা আমন্ত্রণ পায়নি। অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, তুরস্কও বাদ পড়াদের তালিকায় পড়ে।

সপ্তম অলিম্পিকেই প্রথমবার খেলোয়াড়দের শপথ গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়। সেবার শপথের কথাগুলো ছিল– On the name of all athletics I promise that we shall participate in this Olympic Games respecting and observing the rules of the Games in the true sporting spirit, in the name of the sport and in the honor of our terms.

এই অলিম্পিকে প্রথমবার অলিম্পিক পতাকাও তোলা হয়। উঁচু দণ্ডের মাথায় সিল্কের কাপড়ে নীল, হলুদ, কালো, সবুজ ও লাল রঙের পাঁচটি রিং একটি আরেকটির সঙ্গে লাগোয়া, যা পাঁচটি মহাদেশের প্রতীক ও ঐতিহ্যের প্রতীক। বেলজিয়াম সরকার অলিম্পিককে কেন্দ্র করে যুদ্ধের ক্ষত কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করলেও স্টেডিয়ামটির অবস্থা ছিল নাজুক।

অষ্টম অলিম্পিকের দাবিদার ছিল ছয়টি শহর। বার্সেলোনা (স্পেন), লসঅ্যাঞ্জেলস (যুক্তরাষ্ট্র), প্যারিস (ফ্রান্স), প্রাগ (চেকোস্লোভাকিয়া) এবং রোম (ইতালি)। আধুনিক অলিম্পিকের জনক কুবার্তোর অবদানের মর্যাদা দিতে আইওসি ১৯২৪ সালে অষ্টম অলিম্পিকের দায়িত্ব দেন প্যারিসকে এবং প্যারিসই প্রথম শহর যে দ্বিতীয়বার এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। এ আসরে তির নিক্ষপ, ফিল্ড স্কেট, আইস হকি প্রভৃতি শীতকালীন ইভেন্ট বাদ রাখা হয়।

ইউরোপ ও আমেরিকায় শীতকালীন খেলাগুলোর জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব দেখে আইওসি শীতকালীন অলিম্পিক গেমসের সিদ্ধান্ত নেয়। এরও প্রধান উদ্যোক্তা পিয়েরে দ্য কুবার্তো। ১৯২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ১৬ দেশের ২৯৩ জন প্রতিযোগী নিয়ে প্রথম শীতকালীন অলিম্পিক বসে প্যারিসে।

নবম অলিম্পিকের আসরটি বসে ১৯২৮ সালের ২৭ মে থেকে ১২ আগস্ট। নেদারল্যান্ডসের আমস্টারডামে ৪৬ দেশের ৩ হাজার ১৪ জন খেলোয়াড়, যার মধ্যে ২৯০ জন মহিলা এ আসরে প্রতিযোগিতা করেন। এবার একটি নতুন ধারার প্রবর্তন হলো। গ্রিসের অলিম্পিয়াস আতসকাচের সাহায্যে সূর্যরশ্মি থেকে মশাল জ্বালানো হলো। সেই আগুন রিলে প্রথায় গ্রিস যুগোস্লাভিয়া (পুরোনো), অস্ট্রিয়া, জার্মানি হয়ে এলো নেদারল্যান্ডসে। এ আগুন প্রজ্বালিত থাকল আসরের দিনগুলো জুড়ে।

দশম অলিম্পিকের আসর বসে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলসে। ৩০ জুলাই থেকে ১৪ আগস্ট চলে এ আসর।

১৯৩৬ সালে তুমুল রাজনৈতিক জটিলতার মাঝেও ১১তম অলিম্পিকের আসর বসে বার্লিনে। তবে ১২তম ও ১৩তম অলিম্পিক স্থগিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে। ১৯৪৮ সালে লন্ডনে বসল ১৪তম অলিম্পিক গেমসের আসর। যুদ্ধের ক্ষত মুছে দেশে দেশে জেগে উঠল ক্রীড়াপ্রেমিকরা।

এভাবেই পথপরিক্রমায় অলিম্পিক গেমস আজ অনেক পরিণত এক জাঁকজমক আয়োজন। বিশ্বকে জাগিয়ে তোলে অলিম্পিক আসর। আজ পর্যন্ত ২৩টি শহরে ২৪টি গ্রীষ্মকালীন ও ২০টি শহরে ২৩টি শীতকালীন অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সর্বশেষ অলিম্পিক গেমসটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ব্রাজিলে। ২০২০ সালে টোকিওতে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক শুরু হবে এবং ২০২২ সালে বেইজিংয়ে শীতকালীন অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৪ সালে প্যারিস এবং ২০২৮ সালে লস অ্যাঞ্জেলসে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের আসর বসবে। বেইজিং একমাত্র শহর যে গ্রীষ্ম ও শীতকালীন উভয়ই অনুষ্ঠিত করার গৌরব অর্জন করতে যাচ্ছে। ইতঃপূর্বে ২০০৮ সালে বেইজিংয়ে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ভারতীয় উপমহাদেশ ক্যারিবিয়ান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোয় আজ অবধি কোনো অলিম্পিক গেমস আয়োজন হয়নি। দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে প্রথম ২০১৬ সালে ব্রাজিলে রিও অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়।

অলিম্পিকের আয়োজক

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) নির্বাচন করে থাকে আয়োজক শহরকে। সম্ভাব্য বছরের সাত বছর আগে এ নির্বাচন করা হয়। বিশ্বের যে কোনো শহর অলিম্পিক আয়োজনের আগ্রহ প্রকাশ করে আবেদন জমা দিতে পারে। ১০ মাস পর আইওসির নির্বাহী বোর্ডে সিদ্ধান্ত হয় শহরটিকে তালিকাভুক্ত করা যাবে কি না। এরপর আবেদনকারী শহরগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করার জন্য একটি মূল্যায়ন কমিশন কাজ করে। কমিশন একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা চূড়ান্ত করে। সবশেষে আইওসি সদস্যদের সাধারণ সভায় ভোটের মাধ্যমে অলিম্পিক শহর নির্বাচিত হয়। অন্যান্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দেশের নাম বিবেচনা করা হলেও অলিম্পিকের ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রিসের নাগরভিত্তিক অলিম্পিক আসরের রীতিকে সম্মান করে শহরকেই বিবেচনা করা হয়।

মেডেল, ভালোবাসা, অর্থ ও ফ্রি বিয়ার

মানুষ তার যোগ্যতা দিয়ে অর্জন করে মান, সম্মান, যশ, খ্যাতি, ঐতিহাসিক নিদর্শন নির্মাণের কৃতিত্ব আরও কত কী?

অলিম্পিক গেমসেও অ্যাথলেটরা অংশ নিয়ে অর্জন করেন সুনাম, সম্মান, যশ, ক্ষমতা, স্বীকৃতি। তবে এর সঙ্গে আর্থিক প্রাপ্তির বিষয়টিও থাকে। অর্থের লোভে কোনো কোনো অ্যাথলেট নিজেদের উজাড় করে দেন মাঠে। ফলে তাদের পারফরম্যান্সও হয় নজরকাড়া।

কোনো কোনো দেশ অলিম্পিক শুরুর আগেই প্রচুর আর্থিক বোনাসের ঘোষণা দিয়ে থাকে। সোনার একটি মেডেল জিতলেই হলো। লাখ লাখ ডলার পকেটে ঢোকে অনায়াসে। বর্তমানে সর্বোচ্চ আর্থিক বোনাস দিচ্ছে সিঙ্গাপুর। সর্বনিম্ন বোনাস দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে গ্রেট ব্রিটেন এক্ষেত্রে শূন্যের কোঠায়। তারা মনে করে, আর্থিক বোনাস ভালো উদ্যোগ; কিন্তু তার চেয়ে ভালো সারা জীবনের প্রচেষ্টার স্বীকৃতি।

তবে সব আর্থিক পুরস্কার হার মানে মানুষের ভালোবাসার কাছে। এ ভালোবাসায় পুরস্কারস্বরূপ দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক বাহিনীতে বাধ্যতামূলক করা থেকে রেহাই দেওয়া হয় মেডেলপ্রাপ্তদের। জার্মানিতে তো আরো মজার পুরস্কার দেওয়া হয়। সারা জীবনের জন্য বিয়ার ফ্রি করে দেওয়া হয় অলিম্পিক মেডেলপ্রাপ্ত অ্যাথলেটদের।

বাংলাদেশ এ পর্যন্ত কোনো মেডেল অর্জন করতে পারেনি। গলফার সিদ্দিকুর রহমান প্রথম বাংলাদেশি অ্যাথলেট, যিনি রিও অলিম্পিকের জন্য চূড়ান্ত যোগ্যতার তালিকায় ৫৬তম স্থানে অবস্থান করেন। বাংলাদেশ আজ পর্যন্ত শীতকালীন কোনো অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করেনি।

অলিম্পিক গেমসের প্রকারভেদ

সাধারণভাবে অলিম্পিক গেমস বলতে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমসকে বোঝানো হলেও ১৯২৪ সাল থেকে শীতকালীন অলিম্পিক গেমসের প্রচলন হয়। শুরুতে গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন অলিম্পিক একই বছর আয়োজিত হলেও ১৯৯২ সাল থেকে ২ বছর পর পর আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে শীতকালীন অলিম্পিক ১৯৯২ সালের পর ১৯৯৪ সালে পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ অলিম্পিক গেমস বা প্যারা অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ১৯৬০ সাল থেকে। গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমসের আয়োজক শহর অলিম্পিক আসরের পরপরই প্যারা অলিম্পিক গেমসের আয়োজন করে থাকে। তরুণ বয়সি প্রতিযোগীদের জন্য ইয়ুথ অলিম্পিক গেমস শুরু হয় ২০১০ সালে সিঙ্গাপুর থেকে। বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে প্রথম অলিম্পিক গেমসে অংশ নেয়।

লেখক: ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক

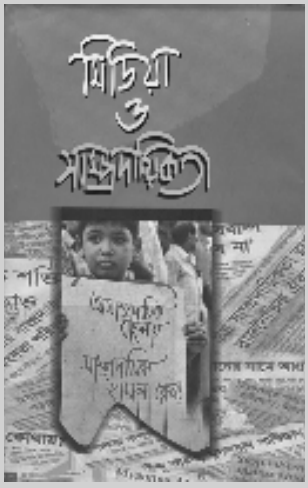

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

ফুটবল বিশ্বকাপ ২০১৮

সুমন মুস্তাফিজ

১৪ জুন রাশিয়ার মস্কোর লুজনিকি স্টেডিয়ামে সৌদি আরব বনাম স্বাগতিক রাশিয়ার মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে শুরু বিশ্বকাপ ফুটবলের ২১তম আসরের। প্রথমবার পূর্ব ইউরোপে 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' খ্যাত ফুটবলের জমজমাট এই আসর।

রাশিয়া বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে ৩২টি দল। স্বাগতিক দল হিসেবে রাশিয়া এবং বাকি ৩১টি দল বাছাইপর্বের প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়। ১১টি শহরের ১২টি স্টেডিয়ামে সর্বমোট ৬৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। বিশ্বকাপের ডামাডোল বলে কথা! খেলোয়াড়দের সময় বাঁচানোর জন্য পূর্ব ইউরোপের বাইরে ইউরোপীয় রাশিয়ার উড়াল পর্বতমালায় একটি স্টেডিয়াম নির্ধারণও করা হয়।

এই আসরের স্বাগতিক শহর নির্ধারণী প্রক্রিয়া শুরু হয় ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে। প্রাথমিকভাবে, ৯টি দেশ এই আসরের স্বাগতিক

> বাংলাদেশে ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনা দলের সমর্থক সংখ্যা বেশি। বিশ্বকাপের সময় এ দুদলের পাগলাটে সমর্থকদের পাগলামিও চোখে পড়ে

হওয়ার জন্য নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফিফা ইন্দোনেশিয়ার নাম বাতিল করে দেয়। কারণ তাদের সরকার এই নিলামকে সমর্থন প্রদানের চিঠি পাঠাতে ব্যর্থ হয়। এছাড়া নিলাম থেকে মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তাদের নাম প্রত্যাহার করে নেয়।

অবশেষে ২০১০ সালের ২ ডিসেম্বর ২২ সদস্যবিশিষ্ট ফিফা নির্বাহী পরিষদ নিলামে স্বাগতিক দল ঠিক করে। নিলামে ভোটের দ্বিতীয়পর্বে রাশিয়া জয়লাভ করে এবং এই বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে নির্বাচিত হয়। স্বাগতিক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পথে ভোটের প্রথম পর্বেই ইংল্যান্ডের স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়।

সবমিলিয়ে ইউরোপ থেকে বিশ্বকাপে জায়গা করে নেয় ১৩টি দল। এশিয়া থেকে ইরান, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সৌদি আরব ও অস্ট্রেলিয়াসহ পাঁচটি দল বিশ্বকাপে জায়গা করে নেয়। আফ্রিকা থেকে বিশ্বকাপের টিকিট পায় পাঁচটি দল। দক্ষিণ থেকেও পাঁচটি। এছাড়া উত্তর, মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চল থেকে তিনটি দল সরাসরি বিশ্বকাপে জায়গা করে নেয়।

মস্কোয় অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপ ফুটবলের ড্র অনুষ্ঠান। স্বাগতিক রাশিয়াসহ বাছাইপর্ব থেকে উঠে আসা সর্বমোট ৩২টি দল আটটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে প্রথম রাউন্ডে খোলার জন্য নির্বাচিত হয়। এ গ্রুপে রাশিয়া, সৌদি আরব, মিসর ও উরুগুয়ে। 'বি' গ্রুপে পর্তুগাল, স্পেন, মরক্কো ও ইরান। সি-গ্রুপে ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, পেরু ও ডেনমার্ক।

ডি-গ্রুপে আছে আর্জেন্টিনা, আইসল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া ও নাইজেরিয়া। গ্রুপ ই-তে ব্রাজিল, সুইজারল্যান্ড, কোস্টারিকা ও সার্বিয়া। 'ই' থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা ব্রাজিল আর সুইজারল্যান্ডের। কোস্টারিকা লড়বে সুইসদের সঙ্গে, এটি ধরে নিয়েই অনুমান করা যাক, সুইসরা যাবে পরের পর্বে। 'এফ' গ্রুপে জার্মানি, মেক্সিকো, সুইডেন ও দক্ষিণ কোরিয়া। 'জি' গ্রুপে ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম, পানামা ও তিউনিসিয়া। 'এইচ' গ্রুপে পোল্যান্ড, সেনেগাল, কলম্বিয়া ও জাপান।

এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের ২০টি আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মাত্র আটটি দেশ। বিশ্বকাপ জিততে দুর্দান্ত দল, অসাধারণ ট্যাকটিস, ভালো খেলোয়াড়– এসব কিছুর সঙ্গে আরেকটি বিষয় দরকার, সেটি হচ্ছে ফুটবল ঐতিহ্য। এসব কিছু থাকার পরও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি, এমন দল এখন পর্যন্ত একটিই আছে, সেটি হলো নেদারল্যান্ডস। তিনবার ফাইনাল খেলেও জিততে না পারার দুঃখ তাদের বেড়ে গেছে এবারের বাছাইপর্ব থেকে বাদ পড়ে। এ দলগুলোর বাইরে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছে আর মাত্র তিনটি দল হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া ও সুইডেন, সেটিও সর্বশেষ ১৯৬২ সালের কথা। পুসকাসদের আমলে হাঙ্গেরি ছিল জায়ান্ট, সুইডেন খেলেছিল নিজেদের মাটিতে। দু'বারের চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়েরও সোনালি অতীত শিগগিরই ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই।

কারা জিতবে এবারের ফুটবল বিশ্বকাপ?

পরপর দু'বার বিশ্বকাপ জিতেছে, এমন ইতিহাস বিশ্বকাপে মাত্র দুটি দলেরই রয়েছে। এর প্রথমটি ১৯৩৪ আর ১৯৩৮ সালের ইতালি, অন্যটি ১৯৫৮ আর ১৯৬২ সালে ব্রাজিল। এরপর ১৯৭৪ আর ১৯৭৮ সালে টানা দু'বার ফাইনাল খেলেছে নেদারল্যান্ডস। ১৯৮৬ আর ১৯৯০ সালে খেলেছে আর্জেন্টিনা। ১৯৮২, ১৯৮৬, ১৯৯০তে টানা তিনবার ফাইনাল খেলেছে জার্মানি। আর ব্রাজিলও ১৯৯৪, ১৯৯৮, ২০০২ সালে টানা তিনবার ফাইনাল খেলেছে। কিন্তু কোনো দলই টানা দু'বার চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি।

বিশ্বকাপ পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, দলীয় সমন্বয়ের ওপর নির্ভরশীল দলগুলোই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ২০০৬-এর ইতালি, ২০১০-এর স্পেন কিংবা ২০১৪-এর জার্মানি– সব ক'টি দলই একক কোনো খেলোয়াড়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। এর মানে এটা নয় যে, দলগুলো বিশেষ খেলোয়াড়ভিত্তিক দল গঠন করে। তবে কোনো দলই টানা দু'বার চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি।

বাংলাদেশে ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনা দলের সমর্থক সংখ্যা বেশি। বিশ্বকাপের সময় এ দুদলের পাগলাটে সমর্থকদের পাগলামিও চোখে পড়ে। বাসাবাড়ির ছাদে দুদলের সমর্থকদের পতাকা ওড়ানো, পুরো বাড়ি পছন্দের দলের পতাকার রঙে রং করানো, দেশে তখন স্বাভাবিক ঘটনা। রাস্তাঘাটে, চায়ের কাপে ফুটবল নিয়ে ঝড় তখন নিয়মত ব্যাপার!

ফিফা ফুটবল র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশ, ১৯৭তম স্থানে। ক্রিকেটের মতো বাংলাদেশ কবে ফুটবল বিশ্বকাপ খেলবে, সেটা এক প্রশ্ন বটে। তবে যেদিন বাংলাদেশ ফুটবল বিশ্বকাপ খেলবে, সেদিন হয়তো এ দেশের কেউ আর ভিনদেশি কোনো দলের জন্য পতাকা ওড়াবে না। শুধু ছাদে পতপত করে ওড়বে লাল-সবুজের পতাকা। এমন দিনের প্রত্যাশায়ই আমরা।

লেখক: সুমন মুস্তাফিজ, নিউজ ইনচার্জ, বাংলা টিভি

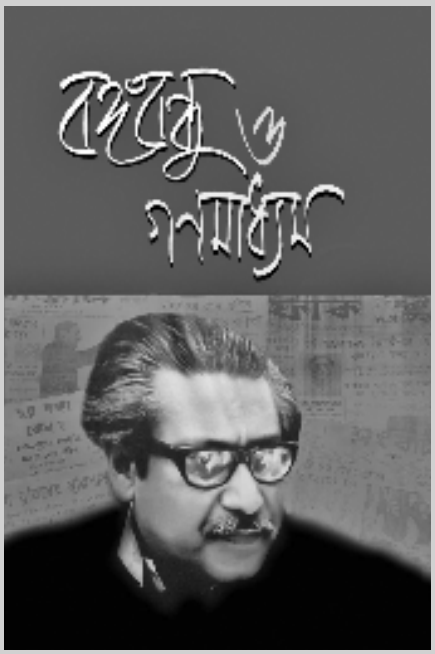

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

গণমাধ্যম সংবাদ

বজলুর রহমান স্মৃতি পদক প্রদান অনুষ্ঠান

বাংলাদেশে গণমাধ্যম 'পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ' করছে উল্লেখ করে সংবাদপত্র ও টেলিভিশনকে তথ্যভিত্তিক সমালোচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। ৩০ মে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতার জন্য 'বজলুর রহমান স্মৃতি পদক ২০১৭' প্রদান অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, 'গণমাধ্যম ও গণতন্ত্র একে অপরের পরিপূরক। সংবাদপত্র জনগণের মতামত ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরে এবং গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেয়। বর্তমানে সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন থেকে তাদের মতামত প্রকাশের পূর্ণ অধিকার ভোগ করছে। এ পরিবেশে সংবাদপত্র ও মিডিয়ার দায়িত্ব অপরিসীম।

দৈনিক সংবাদের সাবেক সম্পাদক বজলুর রহমানের স্মৃতির উদ্দেশে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর 'মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতার' জন্য এই পদক দেয়। আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

এবার মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সাংবাদিকতার জন্য প্রিন্ট মিডিয়া ক্যাটাগরিতে পদক পান দৈনিক যুগান্তরের 'সুরঞ্জনা' পাতার বিভাগীয় সম্পাদক রীতা ভৌমিক এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় চ্যানেল আইয়ের বিশেষ প্রতিনিধি সোমা ইসলাম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি সারোয়ার আলী, পদক প্রদান জুরি বোর্ডের সদস্য সারা যাকের প্রমুখ। *(সূত্র: ৩১ মে ২০১৮, দৈনিক ইত্তেফাক)*

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস পালিত

৩ মে ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে বা বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস পালিত হয়। ১৯৯১ সালে ইউনেস্কোর ২৬তম সাধারণ অধিবেশনের সুপারিশ মোতাবেক ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ৩ মে 'ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে' অথবা বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসের স্বীকৃতি দেয়া হয়। সেই থেকে প্রতিবছর বিশ্বে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

সাংবাদিকতার স্বাধীনতা ও মুক্ত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ, বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমের স্বাধীনতার মূল্যায়ন, স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ প্রতিহত করার শপথ গ্রহণ এবং পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে ক্ষতিগ্রস্ত ও জীবনদানকারী সাংবাদিকদের স্মরণ এবং তাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় এই দিবসটিতে।

জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানান সাংবাদিক নেতারা

বিএফইউজের সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রধানমন্ত্রী

গণতন্ত্রের সুষ্ঠু ধারা যেন বানচাল না হয়

দেশে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু ধারা যেন বানচাল না হয়, সেজন্য সাংবাদিকদের সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই সঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে সবকিছু নেতিবাচকভাবে উপস্থাপনের মানসিকতা থেকে বের হয়ে এসে দেশ ও মানুষের কল্যাণে সরকারের কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে তুলে ধরতে মিডিয়ার প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

১৭ মে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আওয়ামী লীগের সভাপতি হয়ে বাংলাদেশে আসার পর আজ ৩৭ বছর পূর্ণ হলো। তবে দুঃখের কথা, আমি কখনো প্রেসের কাছ থেকে খুব বেশি সহযোগিতা পাইনি। সব সময় একটা বৈরিতা নিয়েই আমাকে এগোতে হয়েছে। সমালোচনার মুখোমুখি হয়েই আমাকে এগোতে হয়েছে। কিন্তু এগুলো নিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাইনি। কারণ আমি জানি, আমি কী কাজ করছি এবং ন্যায় ও সত্যের পথে থাকলে, সৎপথে থাকলে ফল পাওয়া যায়। এটা আমি বিশ্বাস করি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে সরকারের বিরুদ্ধে না লিখলে কোনো মিডিয়া টিকে থাকতে পারে না। আমাদের এ মানসিক ব্যাধি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কোনো রকম ভীতি ও পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই সত্য তুলে ধরতে হবে।' তিনি বলেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা চলে আসছে। খুব কম গণমাধ্যমই আছে যারা সরকারের পজিটিভ বিষয়গুলো নিয়ে সংবাদ করে। নেগেটিভই বেশি। আমরা কারো কাছে দয়া-দাক্ষিণ্য চাই না। এটুকু দাবি করতেই পারি, আমরা যদি ভালো কাজ করি, সেটা যেন ভালো করে প্রচার করা হয়। আমার স্বার্থে না, দলের স্বার্থে না, দেশের স্বার্থে এটা করবেন।'

সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির জন্য নবম ওয়েজ বোর্ড গঠনে বিলম্বের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সেখানে যে প্রতিবন্ধকতাটুকু, সেটা আমাদের করা না, সেটা আপনাদের সাংবাদিক মহলেরই করা। কাজেই কে করছে, আপনারাই দেখবেন। কিন্তু আমরা চাই, এটা তাড়াতাড়ি কার্যকর হোক।' সাংবাদিকদের মহার্ঘভাতার বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমি মন্ত্রীকে বলে দিয়েছি, মহার্ঘভাতার ঘোষণাটা দিয়ে দিতে পারে।'

অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের কল্যাণে তার সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথাও তুলে ধরেন শেখ হাসিনা। প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই বলে সাংবাদিকদের আশ্বস্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।

বিএফইউজের সভাপতি মনজুরুল আহসান বুলবুলের সভপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আবু জাফর সূর্য, ময়মনসিংহ সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আতাউল করিম খোকন, কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আমজাদ হোসেন মিন্টু, রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কাজী শাহেদ, নারায়ণগঞ্জ সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আবদুস সালাম, যশোর সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি সাজেদ রহমান, কক্সবাজার সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আবু তাহের, খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি জাহিদ হোসেন এবং চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নাজিদউদ্দিন শ্যামল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিএফইউজের মহাসচিব ওমর ফারুক। *(সূত্র: ১৮ মে ২০১৮, কালের কণ্ঠ)*

'কিপিং পাওয়ার ইন চেক : মিডিয়া, জাস্টিজ অ্যান্ড রোল অব ল' –এ স্লোগান সামনে রেখে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবার এই দিবসটি পালন করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের সাংবাদিকরাও তাদের পেশাগত অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এই দিবসটি পালন করতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। গণমাধ্যমসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করবে।

দেশের তরুণ ও যুব সাংবাদিকদের সংগঠন ইয়ুথ জার্নালিস্টস্ ফোরাম বাংলাদেশ (ওয়াইজেএফবি) বিগত বছরগুলোর মতো 'ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে' পালন করে।

দিবসটি উপলক্ষ্যে রাজধানীর তোপখানা রোডে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল মিলনায়তনে সকাল ১০টায় এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। *(সূত্র: ৩রা মে ২০১৮, ইত্তেফাক)*

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভা

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেছেন, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব হয়, এমন কোনো আইন করবে না শেখ হাসিনার সরকার। সরকার ও সাংবাদিক প্রতিপক্ষ নয় বরং পরিপূরক সম্পর্ক বজায় রেখে মুক্ত গণমাধ্যমের বিকাশে ভূমিকা রাখছে। তিনি ৩ মে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসের আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন, একসময় সংবাদপত্র বের করত পেশাদার সাংবাদিকরা। আর এখন পত্রিকা বের করে সম্পাদক হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। তাই মালিকপক্ষের ভূমিকা কোন মাধ্যমের জন্য কতটুকু সহায়ক, তা বিশ্লেষণ করার সময় এসেছে।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্তের সঞ্চালনায় প্রবন্ধ পাঠ করেন প্রথম আলোর যুগ্ম সম্পাদক সোহরাব হাসান। স্বাগত বক্তব্য দেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন। মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সিনিয়র সাংবাদিক হারুন হাবিব, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি সাইফুল আলম, সহসভাপতি আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া ও জনকণ্ঠের নির্বাহী সম্পাদক স্বদেশ রায় প্রমুখ। *(সূত্র: ৪ মে ২০১৮, ইত্তেফাক)*

নানা আয়োজনে ফিল্ম আর্কাইভ দিবস উদযাপন

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার চার দশক পূর্তি ছিল ১৭ মে। এ উপলক্ষ্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শন, পোস্টার ও স্থিরচিত্র প্রদর্শনী এবং সেমিনারের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হলো ফিল্ম আর্কাইভ দিবস। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠানটির নবনির্মিত ভবন চত্বরে পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে প্রতিষ্ঠানটির ৪০ বছর পূর্তি আয়োজন উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য সচিব আবদুল মালেক এবং চলচ্চিত্রকার আমজাদ হোসেন। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের মহাপরিচালক শচীন্দ্রনাথ হালদার। এছাড়া এ সময় উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী রোজিনা, চলচ্চিত্রকার মোরশেদুল ইসলাম, গবেষক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, চিত্রনায়িকা অঞ্জনা, দিলারা প্রমুখ।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন, 'সরকারে যেমন আর কখনো রাজাকার-সন্ত্রাসীদের স্থান দেয়া যাবে না, সরকারি দপ্তরগুলোয়ও তেমনি জঙ্গি-রাজাকার-অনুচরদের স্থান হবে না।'

আমজাদ হোসেন বলেন, আমাদের স্বপ্নের পূর্ণ বাস্তবায়ন হতে চলেছে। চলচ্চিত্র আর্কাইভের জন্য নির্মিত এই অত্যাধুনিক ভবনটি সেই কথাই বলে। এর দ্বারা ভবিষ্যতে যারা চলচ্চিত্র নিয়ে কাজ করবেন, তারা উপকৃত হবেন।

এরপর অনুষ্ঠিত হয় 'বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ : ৪০ বছরের অগ্রযাত্রা' শীর্ষক সেমিনার। যাতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চলচ্চিত্রবিষয়ক লেখক ও গবেষক অনুপম হায়াৎ। আলোচনায় অন্যদের মধ্যে অংশ নেন প্রধান তথ্য অফিসার কামরুন নাহার, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আবুয়াল হোসেন, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মো. রফিকুজ্জামান, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন প্রমুখ। *সূত্র: ১৮ মে, ২০১৮ ইত্তেফাক।*

তিন পত্রিকার সংবাদকর্মীদের মিলনমেলা

একসময় এক ছাদের নিচে কাজ করেছেন, আর এখন নানা জায়গায় আলো ছড়াচ্ছেন– এমন শতাধিক গণমাধ্যমকর্মীর মেলা বসেছিল ঢাকা ক্লাবে। মূলত আজকের কাগজ, ভোরের কাগজ ও প্রথম আলোর সাবেক ও বর্তমান সহকর্মীদের নিয়েই এ মিলনমেলা।

১১ জুন এ আয়োজনটির উপলক্ষ্য ছিল ইফতার। কিন্তু সন্ধ্যাটি ইফতারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বর্তমান ও সাবেকদের আবেগ যেন উপচে পড়ছিল। ইফতারের আগে ও পরে আলাপ, আড্ডায় মেতে উঠেন তারা।

একটা সময়ে এ সাবেকরাই নতুন ধরনের সাংবাদিকতা শুরু করেছিলেন। সাংবাদিকতায় নতুন পথ দেখিয়েছিলেন। তখন শুরুটা ছিল আজকের কাগজ পত্রিকায়। এরপর ভোরের কাগজ হয়ে প্রথম আলো। শুধু তিন কাগজই নয়, আরও নানা পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলে তাদের সরব উপস্থিতি জানান দিচ্ছে, প্রায় তিন দশক আগের একটি দলগত উদ্ভাবনী চিন্তা কীভাবে সফলতা পেয়েছে। সেই সংবাদকর্মীরাই এখন দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগ দিয়ে সাংবাদিক তৈরি করছেন। স্মৃতিচারণায় উঠে আসে এ ধরনের নানা কথা।

স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য দেন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মোজাম্মেল হোসেন, আমাদের সময়ডটকমের সম্পাদক নাঈমুল ইসলাম খান, চ্যানেল আইয়ের তৃতীয় মাত্রার উপস্থাপক জিল্লুর রহমান, ডিবিসি চ্যানেলের প্রধান সম্পাদক মঞ্জুরুল ইসলাম, ডিবিসি চ্যানেলের সম্পাদক প্রণব সাহা, এটিএন নিউজের প্রধান নির্বাহী সম্পাদক মুন্নী সাহা, কালের কণ্ঠ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক মোস্তফা কামাল, সমকাল পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক মুস্তাফিজ শফিসহ আরও অনেকে।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক, পিআইবির মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর, বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক নঈম নিজাম, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন, ভোরের কাগজ পত্রিকার সম্পাদক শ্যামল দত্ত, বণিক বার্তার সম্পাদক হানিফ মাহমুদ, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের প্রধান বার্তা সম্পাদক আশিস সৈকত প্রমুখ। *(সূত্র: ১৩ জুন ২০১৮, প্রথম আলো)*

২০২১ সালের বিশ্ব ফিল্ম আর্কাইভ কংগ্রেস ঢাকায়

২০২১ সালে ফিল্ম আর্কাইভের ৭৭তম বিশ্ব কংগ্রেস আয়োজকের মর্যাদা লাভ করেছে বাংলাদেশ। চেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রাগে চলতি ৭৪তম কংগ্রেসের পঞ্চম দিন ২৬ এপ্রিল আয়োজক নির্বাচন ভোটে ৭৭তম আয়োজনের অন্য প্রতিযোগী নেদারল্যান্ডসকে ৪৬-৩৭ ভোটে হারিয়ে আয়োজকের স্থান লাভ করে বাংলাদেশ।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এ অর্জনকে একটি বিশ্বমর্যাদার স্বীকৃতি হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, ২০১৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য মন্ত্রণালয়ের যে ফিল্ম আর্কাইভের নির্মাণকাজ উদ্বোধন করেন, তা আজ বিশ্বমানের একটি আর্কাইভ। দেশ ও বিশ্বের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সভ্যতার বিকাশ প্রবাহ চলচ্চিত্র মাধ্যমে সংরক্ষণের কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদা বহুলাংশে উন্নত হওয়ার একটি নজির এই আয়োজক স্বীকৃতি। *(সূত্র: ২৮ এপ্রিল ২০১৮, কালের কণ্ঠ)*

ডিইউজে (একাংশ) নির্বাচন অনুষ্ঠিত

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) একাংশের নির্বাচন ২৭ এপ্রিল জাতীয় প্রেস ক্লাব অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। কাদের গনি চৌধুরী-শহিদুল ইসলাম পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে বিজয়ী হয়েছে। সভাপতি পদে দৈনিক আমার দেশের কাদের গনি চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম (দৈনিক সংগ্রাম) নির্বাচিত হয়েছেন। সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আনোয়ারুল কবীর বুলু (দিনকাল), শাহীন হাসনাত (দিগন্ত টিভি) ও বাছির জামাল (মানবকণ্ঠ)। যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন এরফানুল হক নাহিদ (আজকালের খবর)। কোষাধ্যক্ষ পদে নিউনেশনের মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়), সাংগঠনিক

সম্পাদক পদে বাসসের দিদারুল আলম, প্রচার সম্পাদক পদে এশিয়া বাণীর দেওয়ান মাসুদা সুলতানা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে নয়া দিগন্তের আবুল কালাম, জনকল্যাণ সম্পাদক পদে আমাদের অর্থনীতির খন্দকার আলমগীর হোসাইন (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়) ও দপ্তর সম্পাদক পদে খবরপত্রের শাহজাহান সাজু (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়) নির্বাচিত হয়েছেন। সদস্য পদে নির্বাচিতরা হলেন– খন্দকার হাসনাত করিম পিন্টু, সৈয়দ আলী আফসার, শহীদুল ইসলাম, রফিক মুহাম্মদ, কাজী তাজিম উদ্দিন, ডিএম আমিরুল ইসলাম অমর, এইচএম আল আমীন ও রফিক লিটন। (সূত্র: ২৮ এপ্রিল ২০১৮, ইত্তেফাক)

নৌকাডুবিতে মারা যাওয়া ৪০ দিনের শিশুকে চুমু খাচ্ছেন রোহিঙ্গা মা। টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ থেকে পনির হোসেনের তোলা মর্মস্পর্শী এই ছবি পুরস্কারজয়ী ছবিগুলোর অন্যতম

পুলিৎজারজয়ী আলোকচিত্রী দলে প্রথম বাংলাদেশি পনির

রোহিঙ্গাদের ছবি তুলে 'ফিচার ফটোগ্রাফি' বিভাগে রয়টার্সের পুরো আলোকচিত্র বিভাগ এবার পুলিৎজার জিতেছে। বার্তা সংস্থাটির বাংলাদেশে নিযুক্ত আলোকচিত্রী মোহাম্মদ পনির হোসেনও আছেন এ তালিকায়। তার তিনটি ছবি 'ফিচার ফটোগ্রাফি'তে স্থান পেয়েছে। এর মধ্য দিয়ে সাংবাদিকতায় সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার পুলিৎজারে এই প্রথম কোনো বাংলাদেশি স্থান পেলেন। আন্তর্জাতিক ফটোগ্রাফি বিভাগের এ পুরস্কারটির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন বিভাগেও পুরস্কার জিতেছে রয়টার্স। তারা এই প্রথম একসঙ্গে দুটি পুলিৎজার পুরস্কার জিতল।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে যৌন হয়রানির খবর ফাঁস করে নিউইয়র্ক টাইমস ও ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাশিয়ার সম্পৃক্ততা নিয়ে প্রতিবেদন করে ওয়াশিংটন পোস্ট যৌথভাবে পুরস্কার পেয়েছে।

রয়টার্সের এডিটর ইন চিফ স্টিফেন জে অ্যাডলার বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ বহু বিষয়ে এ বছর অনেক পুলিৎজার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এমন সময়ে অনেক আশঙ্কা ও গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক বিষয়ে নজর কাড়তে পারায় রয়টার্সের কর্মী হিসেবে আমরা গর্বিত।

পনিরসহ রয়টার্সের সাত আলোকচিত্রীর ১৬টি ছবি এবার পুরস্কারের তালিকায় রয়েছে। অন্য আলোকচিত্রীরা হলেন– ড্যানিশ সিদ্দিকী, সো জেয়া তুন, দামির সাগোলিজ, আদনান আবিদি, হান্নাহ ম্যাককে ও ক্যাথাল ম্যাকনটন।

পুরস্কার পাওয়ার পর পনির হোসেন ১৭ এপ্রিল সাংবাদিকদের বলেন, ১৬ এপ্রিল রাত ১টার দিকে বিষয়টি জানতে পারি। এর কিছুক্ষণ পরই লন্ডন অফিস থেকে নিশ্চিত করা হয়। তিনি জানান, মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের তোলা ছবিগুলোই এবার এ বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে।

এমন সুখবরে উচ্ছ্বসিত বাংলাদেশি এই আলোকচিত্রী আরো বলেন, সাংবাদিকতায় এ পুরস্কার অন্যরকম একটি ব্যাপার। তার মতে, পুরস্কারের চিন্তা করে তো কেউ ছবি তোলেন না। তবে মানুষ যখন কোনো দুর্দশায় পড়ে বা কোনো সংকট তৈরি হয়, তখনই ফটো সাংবাদিকদের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ আসে।

৪০ দিন বয়সি মৃত সন্তানের অসাড় দেহটি বুকে জড়িয়ে ধরে আছেন এক নারী। বারবার তার মুখে চুমু খাচ্ছেন আর বিলাপ করে কাঁদছেন। মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নির্যাতনের মুখে প্রাণভয়ে নৌকায় পালিয়ে বাংলাদেশে আসার পথে নৌকাডুবিতে ওই শিশুর মৃত্যু হয়। হৃদয়বিদারক এ মুহূর্তের ছবি তুলেছিলেন পনির হোসেন। এ ছবিটিও পুরস্কারের তালিকায় আছে।

তিনি তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে বলেন, ওইদিন সঙ্গে আরেক ফটোগ্রাফারকে নিয়ে শাহপরীর দ্বীপে ছবি তুলতে গিয়েছিলাম। সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক খবর দিলেন একটা নৌকাডুবি হয়েছে। এরপর কয়েক কিলোমিটার হেঁটে সেখানে পৌঁছাই।

পনির হোসেন বলেন, ছবিগুলো যখন তুলি, তখন আবেগ নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলাম। কিন্তু হোটেলে ফিরে সম্পাদনা করতে গিয়ে ল্যাপটপে যখন ছবিগুলো দেখলাম, তখন আর আবেগ ধরে রাখতে পারিনি। চোখে পানি চলে আসে। ওই সময়টায় কাজ শেষে ছবি সম্পাদনা করতে গিয়ে প্রতিদিন একটি গানই শুনতাম– 'মানুষ মানুষের জন্য'। তিনি আরও বলেন, মানুষের কষ্ট কত রকম, এটা রোহিঙ্গা ইস্যু যদি কাভার না করতাম, তাহলে হয়তো আমি বিষয়টা বুঝতাম না।

পুলিৎজারজয়ী পনির হোসেনের বাড়ি মুন্সীগঞ্জে। ২০১৫ সালের জুলাই থেকে তিনি রয়টার্সে কাজ করছেন। এর আগে নূর ফটো এজেন্সি ও জুমা প্রেসে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করেন। *(সূত্র: ১৮ এপ্রিল ২০১৮, সমকাল)*

সাংবাদিক আবুল মোমেন পেলেন রবীন্দ্র পদক

সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় উজ্জ্বল নাম আবুল মোমেন। তার বহুমাত্রিক রচনার মধ্যে অন্যতম অনুষঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অন্যজন শিল্পী ফাহিম হোসেন চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথের গানের অমিয় ধারায় নিজেকে সিক্ত করার পাশাপাশি নতুনদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন তার সংগীতলব্ধ জ্ঞান। দেশের স্বনামধন্য লেখক ও সাংবাদিক আবুল মোমেন এবার পেলেন বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত রবীন্দ্র পদক। বাংলা একাডেমি রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে ৭ মে তাদের হাতে এ পদক তুলে দেয়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সাহিত্যে গবেষণায় সামগ্রিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আবুল মোমেন এবং রবীন্দ্রসংগীত চর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ শিল্পী ফাহিম হোসেন চৌধুরীকে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক ও শিল্পীর হাতে পুষ্পস্তবক, সনদ, সম্মাননা স্মারক ও পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫০ হাজার টাকা তুলে দেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ও মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান। *(সূত্র: ৮ মে ২০১৮, কালের কণ্ঠ)*

অনন্যা শীর্ষ দশ সম্মাননা প্রদান

দেশ ও মানুষের জন্য নিবেদিত এবং সমাজের প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে এগিয়ে চলা অদম্য দশ নারীকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কর্মের স্বীকৃতি হিসেবে ৭ এপ্রিল দেওয়া হয়েছে অনন্যা শীর্ষ দশ সম্মাননা-২০১৭।

এ বছরের অনন্যা শীর্ষ দশ সম্মাননাপ্রাপ্তরা হলেন– অধ্যাপক সাদেকা হালিম (শিক্ষা), নবনীতা চৌধুরী (সাংবাদিকতা), স্বপ্না রানী (গ্রামীণ নারীর স্বনির্ভরতা), নাদিরা খানম (তৃতীয় লিঙ্গ-অধিকারকর্মী), মারিয়া মাণ্ডা (খেলাধুলা), মাহফুজা আক্তার কিরণ (ক্রীড়া সংগঠক), নাজিয়া জাবীন (সমাজসেবা), ফারজানা চৌধুরী (নারী উদ্যোক্তা), ড. নাজমানারা খানুম (প্রশাসনিক কর্মকর্তা) এবং শারমিন সুলতানা সুমি (সংগীত)।

বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে এ দশ নারীর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এ আয়োজনের প্রধান অতিথি ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডা. দীপু মনি। পাক্ষিক অনন্যা সম্পাদক ও প্রকাশক তাসমিমা হোসেন আয়োজনে সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনা করেন। *(সূত্র: ৮ এপ্রিল ২০১৮, সমকাল)*

টালিউডের অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও শিল্পপতি সঞ্জয় বুধিয়া পুরস্কার তুলে দেন আলমগীরের হাতে

‘নায়করাজ রাজ্জাক সম্মাননা’ পেলেন আলমগীর

প্রয়াত কিংবদন্তি অভিনেতা রাজ্জাকের নামে প্রবর্তিত সম্মাননা পেলেন আরেক গুণী চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব আলমগীর। দেশে নয়, এই সম্মাননা আলমগীর গ্রহণ করেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা থেকে। কলকাতার ‘বেঙ্গল ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন চেম্বার অব কমার্স’ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১ মে আলমগীরের হাতে তুলে দেওয়া হয় ‘নায়করাজ রাজ্জাক সম্মাননা’।

পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও শিল্পপতি সঞ্জয় বুধিয়া এ পুরস্কার তুলে দেন আলমগীরের হাতে। রাজ্জাকের নামে প্রবর্তিত এ সম্মাননা পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন আলমগীর। বলেন, ‘নায়করাজ রাজ্জাকের নামাঙ্কিত এ সম্মাননা পেয়ে আমি গর্বিত। অনুপ্রেরণা পেয়েছি। আর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্বের সামনে এ পুরস্কার গ্রহণ করতে পেরে আমি ধন্য হয়েছি। আমি এ পুরস্কার এই মহান শিল্পীর আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করে বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছি। এটা আমার বড়ো পাওয়া। ৪৬ বছর ধরে আমি চলচ্চিত্রাঙ্গনে কিছু দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। এ সম্মাননা আমাকে চলচ্চিত্র প্রাঙ্গণে আরো অবদান রাখার অনুপ্রেরণা জোগাবে। *(সূত্র: ৩ মে ২০১৮, প্রথম আলো)*

৭১তম কান চলচ্চিত্র উৎসব

বিশ্ব চলচ্চিত্রের বড়ো আসর ‘কান চলচ্চিত্র উৎসব’ অনুষ্ঠিত হয় ৮ মে। ৭১তম আয়োজন ফ্রান্সের নয়নাভিরাম কান শহরে এই উৎসবের বিভিন্ন বিভাগে এবার মোট ৮৫টি চলচ্চিত্র দেখানো হয়। তবে এ উৎসবে মূল আকর্ষণ ‘প্রতিযোগিতা বিভাগে’ চলতি বছর রয়েছে ২১টি চলচ্চিত্র। এ বিভাগ থেকেই একজন গ্রহণ করেন উৎসবের সর্বোচ্চ পুরস্কার ‘পাম ডিওর’।

সাগরপারের শহর কানের পালে দো ফেস্টিভ্যাল ভবনে এবারও লালগালিচায় হাঁটেন হলিউড-বলিউডের সব সুন্দরী। হলিউডের চলতি সময়ের প্রায় সব শীর্ষ তারকা কান শহরে ভিড় করেন।

৮ মে ইরানি পরিচালক আসগর ফারহাদির ‘এভরিবডি নোজ’ ছবি প্রদর্শনীর মাধ্যমে শুরু হয় উৎসব। আমেরিকান-ব্রিটিশ পরিচালক টেরি গিলিয়ামের ‘ডন কুইক্সোট’ ছবির প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে উৎসবের পর্দা নামে।

হার্ভে ওয়েনস্টেইন কেলেঙ্কারি-পরবর্তী এ উৎসবে গুরুত্ব পাচ্ছে জেন্ডার সমতা। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই এবার জুরি বোর্ডে নারীদের প্রাধান্য রাখা হয়েছে। এ বছরের উৎসবে জুরি বোর্ডের প্রধান হিসেবে ছিলেন অভিনেত্রী কেট ব্লানচেট। *(সূত্র: ১০ মে ২০১৮, সমকাল)*

মস্কোয় পুরস্কৃত চলচ্চিত্র ‘গোপন’

জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র পরিচালক আশরাফ শিশির নির্মিত থ্রিলারধর্মী পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘গোপন : দ্য ইনার সাউন্ড’। রাশিয়ার মস্কোয় ‘২০তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ডিটেকটিভফেস্ট’-এ ফিচার ফিল্ম বিভাগে ‘স্পেশাল মেনশন’ পুরস্কার লাভ করেছে ছবিটি। এ তথ্য জানিয়েছেন নির্মাতা আশরাফ শিশির।

২৭ এপ্রিল স্থানীয় ‘ইউনিয়ন অব সিনেমাটোগ্রাফারস-ডোম কিনো’ কেন্দ্রে উৎসবের পর্দা নামে। উৎসবে ৭১টি দেশের ৬০০টির মধ্যে ১৮টি চলচ্চিত্র ফিচার ফিল্ম বিভাগে মনোনয়ন লাভ করে। আয়োজকদের পাশাপাশি এ উৎসবের যৌথ আয়োজনে ছিল স্থানীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন।

পরিচালক আশরাফ শিশির বলেন, ‘বাংলাদেশের একটি চলচ্চিত্র অন্যদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এ রকম একটা উৎসবে জায়গা করে নিতে পেরেছে বলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। উৎসবে বাংলাদেশের নাম বারবার উচ্চারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো লাগার বড়ো বিষয়। এটি আমাকে সামনে আরো ভালো কাজ করার অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে মনে করি।’

থ্রিলারধর্মী এ চলচ্চিত্রে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুমনা সোমা, ইমরান ইমু, লাবণ্য ক্যাটরিনা, আনন জামান, সিরাজুল ইসলাম, সৌরভ তোফাজ্জল, আবুল কালাম আজাদ, মান্নাফ কাইজার, দেবীপ্রসাদ, মিলা, দীপ, উজ্জ্বল, ফেরদৌস প্রমুখ। সংগীত পরিচালনা করেছেন রাফায়েত নেওয়াজ এবং চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা করেছেন সাব্বির মাহমুদ। *(সূত্র: ৩০ এপ্রিল ২০১৮, সমকাল)*

তুরস্কে ১৪ সাংবাদিকের কারাদণ্ড

তুরস্কের আদালত সে দেশের ১৪ সাংবাদিককে কারাদণ্ড দিয়েছে। সরকারবিরোধী একটি পত্রিকার সাংবাদিক তারা। পত্রিকাটি এরদোগান সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিল। ২০১৬ সালের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর ওই সাংবাদিকদের গ্রেফতার করা হয়েছিল।

সন্ত্রাসবাদে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে ২৫ এপ্রিল ১৪ সাংবাদিককে কারাদণ্ড দেন দেশটির একটি আদালত। এসব সাজার মেয়াদ আড়াই বছর থেকে সাড়ে সাত বছর পর্যন্ত।

মামলায় অভিযুক্ত অপর তিন সাংবাদিককে নির্দোষ ঘোষণা করে খালাস দেওয়া হয়েছে। সাজাপ্রাপ্তদের সবাই সরকারবিরোধী ‘জুমহুরিয়েত’ সংবাদপত্রের কর্মী। আপিল আবেদনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সাজাপ্রাপ্তরা মুক্ত অবস্থায় থাকবেন। তবে তারা বিদেশে যেতে পারবেন না। তাদের নিয়মিত বিচারিক কর্তৃপক্ষের কাছে হাজিরাও দিতে হবে। তুরস্কের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমকে উদ্ধৃত করে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এ খবর জানিয়েছে।

রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারে (আরএসএফ) প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে তুরস্কের অবস্থান ১৮০ দেশের মধ্যে ১৫৭ নম্বরে। ২০১৬ সালের জুলাইয়ে তুরস্কে ‘ব্যর্থ অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা’র পর থেকেই বিশ্লেষকদের আশঙ্কা ছিল, ওই ঘটনাকে ব্যবহার করে ক্ষমতাকে আরও সংহত ও নিরঙ্কুশ করার চেষ্টা করবেন তুরস্কের সরকারি দল জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির (একেপি) শীর্ষ নেতা প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান। *(সূত্র: ২৭ এপ্রিল ২০১৮, ইত্তেফাক)*

যুক্তরাষ্ট্রে পত্রিকা অফিসে ঢুকে ৫ জনকে গুলি করে হত্যা

হামলাকারীর বিরুদ্ধে হত্যা মামলা

যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক হামলা হয়েছে সংবাদপত্র অফিসে। দেশটির মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের একটি পত্রিকা অফিসে ঢুকে পাঁচজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। হামলাকারীকে গ্রেফতার করে তার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। তবে এর সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের কোনো যোগসূত্র পায়নি পুলিশ।

মেরিল্যান্ডের স্থানীয় সময় বিকাল ৩টায় ‘দ্য ক্যাপিটাল গেজেট’ নামে একটি সংবাদপত্রের অফিসে হামলায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। হামলাকারী অফিসের ভেতরে ঢুকে কাচের দরজার বাইরে থেকে শটগান দিয়ে গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলে চারজন নিহত হন। একজন মারা যান

হাসপাতালে। নিহতরা হলেন– রব হিয়াসেন (৫৯), ওয়েন্ডি উইন্টারস (৬৫), রেবেকা স্মিথ (৩৪), গেরাল্ড ফিসম্যান (৬১) এবং জন ম্যাকনামারা। তাদের মধ্যে স্মিথ বিক্রয় সহযোগী। বাকি চারজন সাংবাদিক। পত্রিকাটির অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদক ফিল ডেভিস জানান, হামলার সময় যেন অফিস কক্ষকে যুদ্ধক্ষেত্র মনে হয়েছিল। কিছুক্ষণ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হঠাৎ কেন সে বন্ধ করে দিল, তা আমরাও বুঝতে পারি-নি। হামলার সময় সবাই বাঁচার চেষ্টা করে। অনেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় জীবন বাঁচানোর আকুতি জানান। তবে প্রথম ধাক্কায় চারজন ঘটনাস্থলে মারা যান। গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পর একজন মারা যান। হামলা হলেও ২৯ জুন পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। নিহত ৫ জনের ছবি দিয়ে শীর্ষ সংবাদ করা হয়েছে। তবে সম্পাদকীয় লেখার স্থান ফাঁকা রাখা হয়েছে। পত্রিকাটির সম্পাদক জানিয়েছেন, এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, 'আমরা বাকশক্তিহীন'।
(সূত্র: ৩০ জুন ২০১৮, ইত্তেফাক)

কাবুলে হামলায় ১০ সাংবাদিক নিহত

আফগানিস্তানে ৩০ এপ্রিল পৃথক চারটি হামলায় অন্তত ১০ সাংবাদিকসহ ৩৮ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে দুটি হামলাই ছিল সাংবাদিকদের লক্ষ করে। সকালে রাজধানী কাবুলে গোয়েন্দা সদর দপ্তরের কাছে আত্মঘাতী বোমা হামলার পর সেখানে সাংবাদিকরা খবর সংগ্রহ করতে গেলে তাদের লক্ষ করে সেখানে ফের হামলা চালানো হয়। এ জোড়া হামলায় কমপক্ষে ২৫ জন নিহত হন, যাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা এএফপির আফগানিস্তান ব্যুরোর প্রধান ফটোগ্রাফারসহ ৯ সাংবাদিক রয়েছেন। এর কয়েক ঘণ্টা পর কান্দাহারে বিদেশি সেনাবহর লক্ষ করে এক হামলায় ১১ শিশু এবং খোস্ত প্রদেশে এক হামলায় বিবিসির এক রিপোর্টার নিহত হন।

এর মধ্য দিয়ে একটি রক্তাক্ত দিন প্রত্যক্ষ করলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির মানুষ ও সাংবাদিকরা। ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আফগানিস্তান আক্রমণের পর দেশটিতে কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য এটাই ভয়ংকরতম দিন। আফগানিস্তানে জোড়া বোমা হামলার দায় স্বীকার করেছে জঙ্গি গ্রুপ ইসলামিক স্টেট (আইএস)। অন্য দুটি হামলার দায় স্বীকার করেনি কোনো পক্ষ। হামলায় নিজেদের সাংবাদিক হারানোয় সহকর্মীদের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

কাবুল পুলিশের মুখপাত্র হাসমত স্তানিকজাই বলেন, কাবুলে প্রথম হামলার কয়েক মিনিট পরই সাংবাদিকদের লক্ষ করে দ্বিতীয় হামলাটি চালানো হয়। তিনি বলেন, হামলাকারী সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে সেখানে ঢুকে পড়ে এবং ভিড়ের মধ্যে বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজেকে উড়িয়ে দেয়। আইএসও তাদের বিবৃতিতে সাংবাদিকদের লক্ষ করে দ্বিতীয় হামলার কথা স্বীকার করেছে।

গণমাধ্যমবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা রিপোর্টার্স ইউদাউট বর্ডারস ও এএফপি নিশ্চিত করেছে, কাবুলের হামলায় ৯ জন নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে এএফপির আফগানিস্তান ব্যুরোর প্রধান ফটোগ্রাফার শাহ মারাই ছাড়াও রেডিও ফ্রি ইউরোপ এবং আফগানিস্তানের টিভি চ্যানেল তলো নিউজ, ওয়ানটিভি ও জাহান টিভির সাংবাদিকরা রয়েছেন।

এএফপির সদর দপ্তর থেকে টুইটারে এক বিবৃতিতে আফগানিস্তানে নিহত সাংবাদিকদের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। তাতে বলা হয়, শাহ মারাই ১৯৯৬ সালে আফগানিস্তানে এএফপি অফিসে একজন গাড়িচালক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। ওই বছরই দেশটির নিয়ন্ত্রণ নেয় তালেবান। এরপর থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনসহ অসংখ্য ঘটনার ছবি তোলেন তিনি। ২০০২ সালে তিনি এএফপির ফুলটাইম ফটো স্ট্রিংগার হিসেবে নিয়োগ পান। এরপর থেকে পর্যায়ক্রমে তিনি ব্যুরোর প্রধান ফটোগ্রাফারে পরিণত হন। ২০১৫ সালে তিনি এএফপির কম্পানি প্রফাইলে নিজের সম্পর্কে লেখেন, 'আমি নিজেকে নিজে ফটোগ্রাফি শিখিয়েছি। সুতরাং আমি সব সময়ই উন্নতির সন্ধানে থাকি। এখন আমার ছবি বিশ্বব্যাপী প্রকাশ পায়। সেটাই আমার সবচেয়ে ভালো স্মৃতি, যখন আমি প্রেসিডেন্ট ও অন্য কারো ছবি তোলার প্রতিযোগিতায় অন্যদের হারিয়ে দিই। অথবা বোমা হামলার কোনো স্থান, যেখানে আমি সবসময়ই প্রথমে পৌঁছতে চাই।' *(সূত্র: ১ মে ২০১৮, কালের কণ্ঠ)*

যুক্তরাষ্ট্রে ঝড়ে ২ সাংবাদিকের প্রাণহানি

যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনায় ঝড়ের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন দুই সাংবাদিক। ২৮ মে ঝড়ের সরাসরি প্রতিবেদন করতে গিয়ে ভেঙে পড়া গাছচাপা পড়ে এ প্রাণহানি ঘটে। নিহতরা হচ্ছেন ডব্লিউওয়াইএফএফ চ্যানেলের প্রতিবেদক মাইক ম্যাককরমিক ও ফটো সাংবাদিক অ্যারন স্মেলৎজার।

২০০৭ সাল থেকে ডব্লিউওয়াইএফএফ চ্যানেলে কাজ করছিলেন ম্যাককরমিক। প্রথমে প্রতিবেদক হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন, এরপর উপস্থাপক। পেশাগত কারণেই বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় কাজ করতে হয়েছে। এবারও ঝড়ের ঝুঁকি উপেক্ষা করে এগিয়ে গিয়েছিলেন কাজে। তবে আর ফেরা হলো না।

স্থানীয় কর্মকর্তারা বলছেন, ভারি বর্ষণে মাটি নরম হয়ে গেছে। গাছের শেকড় অনেক দুর্বল হয়ে যায়। সেজন্য বড় একটি গাছ পড়ে যায় গাড়ির ওপর।

টায়নের ফায়ার সার্ভিসের প্রধান জফরি টেন্যান্ট বলেন, ঘটনার কিছুক্ষণ আগেই তিনি ম্যাককরমিককে সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন। তখনও ভাবতে পারেননি এমন কিছু হতে পারে। তিনি বলেন, আমি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। গিয়ে দেখতে পাই, এমন দুজন মানুষ লুটিয়ে আছেন, যাদের সঙ্গে ১০ মিনিট আগেও দেখা হয়েছে আমার।

টেন্যান্ট বলেন, এ ঝড়ে কীভাবে নিরাপদ থাকতে পারবেন, সে বিষয়ে বলছিলাম আমি। তিনিও পরামর্শ দিচ্ছিলেন। কিন্তু তার ১০ মিনিট পরই ঘটল দুর্ঘটনা। ঝড়ে গেল তাজা দুটি প্রাণ। তিনি বলেন, এটা প্রকৃতির খেলা। *(সূত্র: ৩০ মে ২০১৮, সমকাল)*

ভারতীয় সাংবাদিক সুজাত বুখারিকে গুলি করে হত্যা

শ্রীনগরে 'রাইজিং কাশ্মীর' পত্রিকার সম্পাদক এবং স্বনামধন্য ভারতীয় সাংবাদিক সুজাত বুখারিকে পাকিস্তানি জঙ্গিরা খুন করেছে। ১৪ জুন শ্রীনগরে অফিস থেকে বেরোনোর সময় বুখারিকে গুলি করে হত্যা করে আততায়ীরা।

তার হত্যাকারীদের পরিচয়ও জানা গেছে। পাকিস্তানের জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈয়বার চার সন্দেহভাজনকে পুলিশ শনাক্ত করেছে। লস্করের সদস্যরাই বুখারিকে খুন করেছে বলে জানিয়েছে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। তবে লস্কর-ই-তৈয়বা খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছে। অন্য কোনো গোষ্ঠীও এ হত্যার দায় স্বীকার করেনি। *(সূত্র: ৩০ জুন ২০১৮, ইত্তেফাক)*

লেখক-সাংবাদিক শাহজাহান বাচ্চুকে গুলি করে হত্যা

১১ জুন সন্ধ্যায় মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানের কাকালচি এলাকায় লেখক সাংবাদিক শাহজাহান বাচ্চুকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। মোটরসাইকেলে আসা দুর্বৃত্তরা তাকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে। হত্যাকাণ্ডের পরপরই ঘাতকরা মোটরসাইকেলে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়।

নিহত সাংবাদিক শাহজাহান বাচ্চু সিরাজদিখানের কাকালদি গ্রামের মরহুম মমতাজউদ্দিনের ছেলে। ঢাকার বাংলাবাজার এলাকার 'বিশাকা' প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ছিলেন তিনি। প্রকাশকের পাশাপাশি শাহজাহান বাচ্চু একজন লেখক, কবি, সাংবাদিক, ব্লগার ও সংগঠক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মুন্সীগঞ্জ থেকে প্রকাশিত 'আমাদের বিক্রমপুর' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকও ছিলেন শাহজাহান বাচ্চু। *(সূত্র: ১২ জুন ২০১৮, সমকাল)*

শোক সংবাদ

শুভ রহমান

বিশিষ্ট লেখক, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও মুক্তিযোদ্ধা শুভ রহমান (৭৭) আর নেই। ১৩ মে রাজধানী ঢাকার মালিবাগ চৌধুরীপাড়ায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন তিনি। তিনি কিছুদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন।

শুভ রহমান ১৯৬৩ সালের ১ মে দৈনিক সংবাদের মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর দৈনিক বাংলা, ইত্তেফাক, জনকণ্ঠ এবং সর্বশেষ ২০০৯ সালে কালের কণ্ঠে কাজ শুরু করেন। কালের কণ্ঠের উপসম্পাদকীয় বিভাগের জ্যেষ্ঠ সহকারী সম্পাদক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ২০১৪ সালে অবসরে যান তিনি।

১৯৪০ সালের ১ জুন পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার চুঁচুড়ায় তার জন্ম। '৪৭ সালে দেশভাগের পর সপরিবারে চলে আসেন বাংলাদেশে। বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লেখার পাশাপাশি সাহিত্যও রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে কবিতার বই 'জীবন জীবনব্যাপী', প্রবন্ধের বই 'নির্বাচিত চালচ্চিত্র' ও 'গণসংগ্রামের রক্তফসল' এবং সম্পাদনা গ্রন্থ 'জীবনযুদ্ধের শাহবাগ'। তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য ও আজীবন সাংবাদিক ইউনিয়নের একনিষ্ঠ নেতৃত্বস্থানীয় কর্মী ছিলেন। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন।

প্রণব সাহা

জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য ও চ্যানেল আইয়ের যুগ্ম সম্পাদক সাংবাদিক প্রণব সাহা (৬৬) পরলোক গমন করেছেন। ৭ জুন ভোরে রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি স্ত্রী ও এক ছেলে রেখে গেছেন। শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য প্রণব সাহার মরদেহ জাতীয় প্রেস ক্লাবে নেওয়া হয়। পরে বিকালে মানিকগঞ্জের গড়পাড়ায় তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। দৈনিক বাংলার বাণীর মধ্য দিয়ে সাংবাদিকতা শুরু করেন প্রণব সাহা। পরবর্তী সময়ে তিনি বিভিন্ন গণমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বেসরকারি টিভি চ্যানেল আইয়ের যুগ্ম সম্পাদক পদে কর্মরত ছিলেন।

মঈনুল আলম

চট্টগ্রামের প্রখ্যাত সাংবাদিক মঈনুল আলম (৮১) আর নেই। ১৯ জুন মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে ৩টায় কানাডার টরন্টোর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন তিনি (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ১৯ জুন রাত সাড়ে ১১টায় জানাজা শেষে টরন্টোতেই দাফন করা হয়েছে।

দুই যুগেরও বেশি সময় মঈনুল আলম দৈনিক ইত্তেফাকের চট্টগ্রাম ব্যুরোপ্রধানের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৫৬ সালে সাংবাদিকতা শুরু করেন তিনি। দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকলেও বিভিন্ন দৈনিকে নিয়মিত লিখে গেছেন তিনি।

মো. কামাল উদ্দিন

কালের কণ্ঠের সিনিয়র সম্পাদনা সহকারী মো. কামাল উদ্দিন (ম. কামাল) (৬২) আর নেই। তিনি ২৩ মে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ফুসফুসের ক্যান্সারে ভুগছিলেন তিনি।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য ম. কামাল দৈনিক কালবেলার মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু করেন। দৈনিক জনকণ্ঠ, বাংলাদেশ অবজারভার, সোনালী বার্তা, গণজাগরণ ও আমার দেশসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

বাদ জোহর জাতীয় প্রেস ক্লাব চত্বরে ম. কামালের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে জাতীয় প্রেস ক্লাব, বিএফইউজে, ডিইউজে ও ঢাকাস্থ মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর সাংবাদিক ফোরামসহ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন নেতারা মরহুমের কফিনে ফুল দিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানান। জানাজা ও শ্রদ্ধা নিবেদনকালে জাসদের সভাপতি তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, জেএসডির সভাপতি আ স ম আবদুর রব, জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাইফুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিনসহ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও তার সহকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিকালে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের কার্যালয়ের সামনে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ আসর রাজধানীর মিরপুর হজরত শাহ আলী (রহ.) মাজার শরিফ মসজিদে তৃতীয় জানাজা শেষে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে বাবা-মায়ের কবরে দাফন করা হয় তাকে।

তৌফিক উদ্দিন

দৈনিক মানবজমিনের সাংবাদিক তৌফিক উদ্দিন (৫২) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৮ মে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তৌফিক উদ্দিনের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়। এতে তিনি পক্ষঘাতগ্রস্ত হন। এরপর দেশে নানা চিকিৎসায়ও তার অবস্থার উন্নতি হয়নি। ৮ মে রাজধানীর লালবাগের বাসায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। লালবাগের চাঁদ মসজিদে জানাজা শেষে আজিমপুর কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়।

তাজিন আহমেদ

জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাজিন আহমেদ আর নেই। অভিনয়, নাটক নির্মাণ, উপস্থাপনা– সব কাজ ফেলে রেখে বড়ো অসময়ে চলে গেলেন না-ফেরার দেশে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ২২ মে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। টিভিপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রীর বয়স হয়েছিল ৪৩ বছর। রেখে গেছেন মা দিলারা জলিসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী। তাজিন আহমেদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গতকাল মঙ্গলবার বিকালে উত্তরার রিজেন্ট হাসপাতালে মারা যান। ২২ মে উত্তরায় নিজ বাসায় হার্ট অ্যাটাক করেন। প্রথমে তাকে চীন-জাপান মৈত্রী হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অচেতন অবস্থায় তাজিনকে উত্তরার রিজেন্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থা গুরুতর বলে শুরুতেই নেওয়া হয় লাইফ সাপোর্টে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। সবশেষে কর্তব্যরত চিকিৎসক নূর হোসেন তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শুধু অভিনয় নয়, সাংবাদিকতা, উপস্থাপনা, নাটক লেখা এবং পরিচালনা করেও প্রশংসিত হয়েছেন। মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত অভিনয়ে নিয়মিত ছিলেন। প্রথম অভিনীত নাটক বিটিভিতে প্রচারিত হয় ১৯৯৬ সালে। নাটকের নাম 'শেষ দেখা শেষ নয়'। তারও আগে ১৯৯১ সালে বিটিভির 'চেতনা' নামের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপস্থাপনা শুরু করেন। কিন্তু টিভি নাটকেই তাকে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা ও প্রশংসা এনে দেয়।

তাজিন আহমেদের জন্ম নোয়াখালীতে ১৯৭৫ সালে। তবে বেড়ে ওঠা ঢাকার লালবাগে তার নানাবাড়িতে। বাবা কামাল আহমেদ এবং মা দিলারা জলি। ভোরের কাগজ, প্রথম আলোসহ বিভিন্ন পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। এছাড়া মার্কেন্টাইল ব্যাংকে পাবলিক রিলেশন অফিসার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

পিআইবিতে প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, তথ্য সচিব আবদুল মালেক, পিআইবি'র পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান গোলাম সারওয়ার, ডিএফপির মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইশতিয়াক হোসেনসহ অতিথিবৃন্দ

পিআইবি'তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে মতবিনিময়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উন্নয়নের প্রতীক ও দূত হিসেবে চিহ্নিত করে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন, শেখ হাসিনা গণতন্ত্র ফিরিয়ে দিয়ে দেশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে পরিচালিত করেছেন। এ কারণে দারিদ্র্য কমেছে। অনেকে বাংলাদেশকে উন্নয়নের মডেল হিসেবে অভিহিত করেছেন। বাংলাদেশে জাদুকরী উন্নয়ন হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের (পিআইবি) সেমিনার কক্ষে ২৭ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে গণমাধ্যমকর্মী ও সচেতন নাগরিকদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

পিআইবি আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুল মালেক। পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সমকাল সম্পাদক গোলাম সারওয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিআইবির মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর। আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইশতিয়াক হোসেন, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) মহাসচিব ওমর ফারুক, নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সভাপতি নাসিমুন আরা হক মিনু, সাংবাদিক রহমান মুস্তাফিজ, সংবাদের বার্তা সম্পাদক কাজী রফিক, ডেইলি অবজারভারের প্রধান প্রতিবেদক অমিয় ঘটক পুলক, প্রথম আলোর প্রতিবেদক ইফতেখার মাহমুদ প্রমুখ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে পিআইবি গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য ১০টি হ্যান্ডবুক প্রকাশ করেছে। মতবিনিময়ে এর ওপরে আলোকপাত করে বক্তব্য দেন পিআইবির মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ ১০টি উদ্যোগ হলো: ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি, একটি বাড়ি একটি খামার ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, আশ্রয়ণ প্রকল্প, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, বিনিয়োগ বিকাশ এবং পরিবেশ সুরক্ষা।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, এ ১০টি উদ্যোগ দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করে সাধারণ মানুষকে শান্তি দিয়েছে। ১০টি কাজ সমৃদ্ধির পথে উন্নয়নের উদ্যোগ। ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ, গ্রাম ও শহরের বৈষম্য কমাতে এ ১০টি উদ্যোগ কাজ করছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্য সচিব আবদুল মালেক বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এসব যুগান্তকারী উদ্যোগ সারা দেশে আরো বেশি করে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাহলেই মানুষ এর সুফল গ্রহণ করতে পারবে। সর্বশেষ তথ্যসহ এই সহায়ক ১০টি গ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করা হবে। বইগুলোর লাখ লাখ কপি ছেপে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হবে। যাতে রাজনীতিবিদ, গণমাধ্যমকর্মী, সরকারি কর্মচারী, সমাজকর্মী সবার কাজে লাগে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষমতাধর দেশগুলোর কাতারে ৫৮ থেকে ৪২তম অবস্থানে আসতে পেরেছে।

সভাপ্রধানের বক্তব্যে পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান গোলাম সারওয়ার বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বদলে যাচ্ছে। এ উন্নয়নের চিত্র গণমাধ্যমে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরতে হবে।

কক্সবাজারে ফটো সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট(পিআইবি) আয়োজিত কক্সবাজারের ফটো সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (২৫-২৭ এপ্রিল ২০১৮) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। কক্সবাজার হিল ডাউন সার্কিট হাউস সম্মেলন কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পিআইবির মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো. শাহ আলমগীর বলেন, 'সাংবাদিকতা একটি মহান পেশা। তাই এ পেশার মর্যাদা সমুন্নত রাখতে আমাদের সততা

পিআইবিতে অনুষ্ঠিত 'প্রবীণ সাংবাদিকদের সামগ্রিক অবস্থা: বাংলাদেশ পরিস্থিতি' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন সমাজকল্যাণমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন

ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে।' তিনি আরো বলেন, 'সাংবাদিকতার বিশেষায়িত শাখা হিসেবে ফটো সাংবাদিকতার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং একই সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে এ সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলো। তাই এ চ্যালেঞ্জগুলো দক্ষ হাতে মোকাবিলা করার জন্য ফটো সাংবাদিকদের আরও সমৃদ্ধ হতে হবে।' উল্লেখ্য, সমাপণ অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন কক্সবাজার সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আবু তাহের চৌধুরী। প্রশিক্ষণে প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ৩৫ জন ফটো সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

সীতাকুণ্ডে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট(পিআইবি) আয়োজিত চট্টগ্রামের মিরসরাই ও সীতাকুণ্ড উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (১৮-২০ এপ্রিল ২০১৮) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সীতাকুণ্ডে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ইপসার মিলনায়তনে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পিআইবির পরিচালক (অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ) আনোয়ারা বেগম। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ৩৫ জন সাংবাদিক অংশহগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট(পিআইবি) আয়োজিত ঢাকার সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (৫-৭ এপ্রিল ২০১৮) নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ কে এম নূরুল হুদা। পিআইবির মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবুয়াল হোসেন। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার নির্বাচন বিটের ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

প্রবীণ সাংবাদিকদের পেনশনের উদ্যোগ নেওয়া হবে: সমাজকল্যাণমন্ত্রী

সমাজকল্যাণমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন বলেছেন, প্রবীণ গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য পেনশন ব্যবস্থা ও গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সসহ বিভিন্ন সুবিধাপ্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৮ মে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) আয়োজিত 'প্রবীণ সাংবাদিকদের সামগ্রিক অবস্থা: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

পিআইবির পরিচালক মো. ইলিয়াস ভুইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে গণমাধ্যমকর্মীদের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রবীণ বন্ধুর নির্বাহী পরিচালক ডা. মহসীন কবির লিমন।

রাশেদ খান মেনন আরো বলেন, গণমাধ্যমকর্মীদের চিকিৎসা সুবিধা এবং পেনশন ব্যবস্থা চালু করার জন্য সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট উদ্যোগ নিতে পারে। তিনি আগামী বাজেটে প্রবীণদের ভাতা প্রদানের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কথা উল্লেখ করে বলেন, সাংবাদিকরা ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে। তারা অন্যের কথা বলে কিন্তু নিজেদের অধিকারের কথা বলতে না পারায় শেষ জীবনে অনেক কষ্ট করে থাকেন। তাই সাংবাদিকদের জন্য সরকার কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে খুলনায় মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট(পিআইবি)-এর আয়োজনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে গণমাধ্যমকর্মী এবং সচেতন নাগরিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা ১৩ জুন খুলনা সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মুহাম্মদ আলমগীর। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মুহাম্মদ আলমগীর বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগের চলমান কর্মসূচি বাস্তবায়ন স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ শক্ত হাতে পরিচালনা করছেন।'

পিআইবির মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ– একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ণ প্রকল্প, ডিজিটাল বাংলাদেশ, শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি, নারীর ক্ষমতায়ন ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, বিনিয়োগ বিকাশ এবং পরিবেশ সুরক্ষা দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের চাবিকাঠি।' তিনি আরও বলেন, 'দেশের প্রতিটি মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিকাশ নিশ্চিত করতে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ উদ্যোগগুলোর কোনো বিকল্প নেই।'

পিআইবির মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় আলোচক ছিলেন খুলনার জেলা প্রশাসক আমিন-উল-আহসান, দুর্নীতি দমন কমিশনের বিভাগীয় পরিচালক ড. মো. আবুল হাসান, তথ্য অধিদফতরের উপপরিচালক মো. জাভেদ ইকবাল, সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এসএম জাহিদ হোসেন এবং খুলনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফারুক আহমেদ।

প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে খুলনা সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মুহাম্মদ আলমগীর

শিশু ও নারীবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন নারায়ণগঞ্জ সিটি মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভী

নারায়ণগঞ্জে শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) আয়োজিত নারায়ণগঞ্জ জেলার সাংবাদিকদের জন্য দুই দিনব্যাপী শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ ৫ এপ্রিল সমাপ্ত হয়েছে। প্রশিক্ষণ সমাপণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ৩০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

কমিউনিটি রেডিও'র সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) আয়োজিত কমিউনিটি রেডিও-এর সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (৮-১০ জুন) চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১০ জুন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ইপসার মিলনায়তনে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পিআইবি'র অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক আনোয়ারা বেগম। প্রশিক্ষণে কমিউনিটি রেডিও সাগরগিরি ও রেডিও নাফের ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে ময়মনসিংহে মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি)-এর আয়োজনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে গণমাধ্যমকর্মী এবং সচেতন নাগরিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা ৩০ জুন ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউসুফ খান পাঠান। পিআইবির মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের সভাপতিত্বে এ মতবিনিময় সভায় আলোচক ছিলেন ময়মনসিংহ সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আতাউল করিম খোকন, সাধারণ সম্পাদক মীর গোলাম মোস্তফা, ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শেখ মহিউদ্দিন আহাম্মদ, ময়মনসিংহ টিভি জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অমিত রায় এবং পিআইবি'র সহকারী সম্পাদক ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগের পিআইবি ফোকাল পয়েন্ট মো. মিজানুর রহমান। উল্লেখ্য, এ মতবিনিময় সভায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন শাখার ময়মনসিংহের জেলা কর্মকর্তা এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সিনিয়র সাংবাদিক, শিক্ষক, ইমাম, নারী উদ্যোক্তাসহ ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহে অনুসন্ধানী রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট(পিআইবি) আয়োজিত ময়মনসিংহের সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (২৭-২৯ জুন ২০১৮) অনুসন্ধানী রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ ২৯ জুন শেষ হয়েছে। ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাব সম্মেলন কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ সমাপনে প্রধান অতিথি ছিলেন পিআইবির মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো. শাহ আলমগীর বলেন, 'সাংবাদিকতার বিশেষায়িত শাখা হিসেবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং একই সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে এ সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলো। তাই এ চ্যালেঞ্জগুলো দক্ষ হাতে মোকাবিলা করার জন্য সাংবাদিকদের আরো তথ্যজ্ঞানে সমৃদ্ধ ও কৌশলী হতে হবে। সমাপণ অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক ড. সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। প্রশিক্ষণে প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

ঢাবি সাংবাদিকদের জন্য অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (২৬-২৮ জুন, ২০১৮) অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৮ জুন পিআইবি অডিটোরিয়ামে পিআইবি মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণের সমাপণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান তথ্য অফিসার কামরুন্নাহার। প্রশিক্ষণে ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে তথ্য অধিকারবিষয়ক রিপোর্টিং কর্মশালা

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) আয়োজিত সাংবাদিকদের জন্য দিনব্যাপী তথ্য অধিকারবিষয়ক রিপোর্টিং কর্মশালা ২৬ জুন পিআইবি সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠনে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কালাম আজাদ। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর।

ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবে প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন পিআইবি মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর